প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ

ডেল কার্নেগি

সূচিপত্র

ভূমিকা....4
প্রথম পরিচ্ছেদ....15
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-....33
তৃতীয় পরিচ্ছেদ....50
চতুর্থ পরিচ্ছেদ....80
পঞ্চম পরিচ্ছেদ....97
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ....107
সপ্তম পরিচ্ছেদ....118
অষ্টম পরিচ্ছেদ....131
নবম পরিচ্ছেদ....136
দশম পরিচ্ছেদ....156
একাদশ পরিচ্ছেদ....165
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ....181
এয়োদশ পরিচ্ছেদ....189

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 203
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 210
ষোড়শ পরিচ্ছেদ 218
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 227
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 232
উনবিংশ পরিচ্ছেদ 240
বিংশ পরিচ্ছেদ 247
একবিংশ পরিচ্ছেদ 249
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 255
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 262
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ 264
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 269
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ 271
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ 275
অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ 281
ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ 285

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 289

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ 295

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ 302

এয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ..311

চতুত্রিংশ পরিচ্ছেদ 315

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ 319

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ..322

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ 324

ভূমিকা

গত পঁয়ত্রিশ বছরে আমেরিকার প্রকাশনা জগৎ দু লাখের উপর নানা ধরনের বই প্রকাশ করেছেন। এর বেশির ভাগই অপাঠ্য আর অর্থকরী ভাবেও ব্যর্থ। অনেক বললাম বটে, আসলে একজন নামজাদা প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের প্রধান আমায় বলেছেন যে তাঁর প্রতিষ্ঠান ৭৫ বছরের অভিজ্ঞতায় প্রতি আটখানি বই প্রকাশের পর সাতটিতেই লোকসান দিয়ে চলে।

তাহলে, আমি আবার একখানা বই লেখার মত হঠকারিতা করছি কেন? আর এ বই লেখার পর আপনিই বা তা পড়তে যাবেন কেন?

দুটো প্রশ্নই যথার্থ, তাই আমিও এর উত্তর দেবার চেষ্টা করবো।

প্রায় ১৯২২ সাল থেকেই আমি নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী আর পেশাদার স্ত্রী পুরুষের জন্য নানা ধরণের শিক্ষাদানের কাজ করে আসছি। প্রথম প্রথম আমি শুধু জনগণের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষা দিতাম–এই শিক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বয়স্কদের নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আরও সুন্দরভাবে নিজেকে প্রকাশের জন্যই, আর সেটা ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে বা জনসমাবেশের সামনে যাই হোক।

তবে আস্তে আস্তে সময় কেটে চললে উপলব্ধি করলাম এই প্রাপ্তবয়স্কদের আসলে যা দরকার তা হলো কথা বলার যোগ্যতা প্রাত্যহিক কাজে কর্মে আর সামাজিক যোগাযোগের ব্যাপারে জনসংযোগের জন্য তাদের আরও বেশি শিক্ষা দরকার।

আস্তে আস্তে আমি এটাও বুঝলাম আসলে এরকম কিছু শিক্ষা আমার নিজেরই একান্ত দরকার। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে আমি হতবাক হয়ে দেখি বারবার কৌশল আর উপলব্ধির কি অভাবই আমার রয়ে গেছে এই ব্যাপারে। আহা! এমন একখানা বই যদি বিশ বছর আগে আমার হাতে পড়তো। তাহলে কি আশাতীত আশীর্বাদের ব্যাপারই না হতো।

জনসংযোগের কাজই বোধ হয় সবচেয়ে বড় সমস্যা, বিশেষ করে আপনি যদি ব্যবসাদার হন। আর এটা আপনি যদি গৃহকর্ত্রী, স্থপতি বা প্রযুক্তিবিদও হন তাহলেও সত্য। কয়েক বছর আগে শিক্ষকদের উন্নতির জন্য কার্নেগী ফাউণ্ডেশনের আনুকুল্যে এক অনুসন্ধানের ফলে খুব গুরুত্বপূর্ণ আর অর্থপূর্ণ ব্যাপার প্রকাশ পায়-যে ব্যাপারটা পরে কার্নেগী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে আরও গবেষণায় সমর্থিত হয়। এই গবেষণায় আরও প্রকাশ পায় যে ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের মত কারিগরী বিষয়েও যে কোন মানুষের অর্থকরী সাফল্যের শতকরা ১৫ ভাগ নির্ভরশীল তার কারিগরী জ্ঞানে উপর আর প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ মানবিক জ্ঞানের উপর–এটা হলো তার ব্যক্তিত্ব আর মানুষকে পরিচালিত করার দক্ষতার উপর।

বেশ কয়েক বছর ধরে প্রতি শিক্ষাবর্ষে আমি ফিলাডেলফিয়ার ইঞ্জিনীয়ার্স ক্লাব আর নিউইয়র্কের আমেরিকান ইনস্টিটিউটের ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারদের শিক্ষাদান করেছিলাম। প্রায় ১৫০০ ইঞ্জিনীয়ার আমার ওই শিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তারা আমার কাছে আসেন যেহেতু তারা বেশ কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন যে ইঞ্জিনীয়ারিং দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি আয়ের মানুষেরা প্রায় যারা ইঞ্জিনীয়ারিং-এ অভিজ্ঞ তারা হন না।

উদাহরণ হিসেবে, যে কেউ ইঞ্জিনীয়ানিং, হিসাবশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা বা অন্য যে কোন পেশাতেই সপ্তাহে পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর ডলার ব্যয় করে কিছু প্রযুক্তি দক্ষতা অর্জন করতে পারে। বাজারে এদের শ'য়ে শ'য়ে মেলে। কিন্তু যে লোকের প্রযুক্তিজ্ঞানের সঙ্গে মনোভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা, নেতৃত্ব দেবার শক্তি আর মানুষের মধ্যে উৎসাহ জাগানোর ক্ষমতা আছে–সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে বেশি উপার্জনের ক্ষমতা রাখেন।

জন ডি. রকফেলার তার কর্মকাণ্ডের সেরা সময়ে ম্যাথু সি. ব্রাশ'কে বলেছিলেন যে, জনসংযোগের কাজে দক্ষতা চা বা কফি কেনার মতই কেনা যায়। আর আমি এই ক্ষমতার জন্য অন্য যে কোন বস্তুর চেয়ে বেশি ব্যয় করতে রাজি। আপনাদের কি মনে হয় না দেশের প্রতিটি কলেজেই এই ধরণের শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে দামী এই ক্ষমতা বিকাশের ব্যবস্থা থাকা দরকার? কিন্তু দেশের অন্ততঃ একটা কলেজেও এই ধরণের কোন ব্যবহারিক, সহজবোধ্য প্রাপ্তবয়স্কের উপযোগী শিক্ষণ-ব্যবস্থা আছে কি না তা আমার এই বই লেখার সময় পর্যন্ত নজর এড়িয়ে গেছে।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় আর সমস্ত ওয়াই. এম সি. এ. বিদ্যালয়গুলো প্রাপ্তবয়স্করা সত্যিই কি শিখতে আগ্রহী স্থির করার জন্য যুগ্মভাবে এক সমীক্ষা চালিয়েছিল। এই সমীক্ষা চালাতে খরচ হয় ২৫০০০ হাজার ডলার আর সময় লাগে দু বছর। সমীক্ষার শেষ অংশ চালানো হয় কানেকটিকাটের মেরিডেনে। শহরটিকে বেছে নেওয়া হয় যেহেতু এটি বৈচিত্র্যময় কোন আমেরিকান শহর বলেই। মেরিডেনের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তাদের ১৫৬টি প্রশ্নের জবাব দিতে অনুরোধ করা হয়–প্রশ্নগুলো ছিল এই ধরণের : আপনার পেশা কি? শিক্ষা কতদূর? আপনি অবসর সময় কিভাবে কাটান? আপনার আয় কত? আপনার শখ কি? আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি? সমস্যা কি রকম? কি

ধরনের বিষয় আপনি পড়তে আগ্রহী?’ ইত্যাদি। ওই সমীক্ষায় প্রকাশ পায় প্রাপ্তবয়স্কদের প্রধান আগ্রহ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে–আর তাদের দ্বিতীয় আগ্রহ হলো মানুষ, অর্থাৎ কিভাবে মানুষকে বোঝা যায় আর তাদের নিয়ে চলা যায়, কিভাবে তাদের নিজের মত গড়ে তোলা যায় আর কিভাবে অপরকে জয় করে স্বমতে আনা যায়।

যে সমিতি ওই সমীক্ষা চালিয়েছিলেন তারা ঠিক করলেন এই ধরণের কোন পাঠক্রম মেরিডেনের বয়স্কদের জন্য চালু করবেন। এর পর তারা বেশ পরিশ্রম করেই এই বিষয়ের কোন ব্যবহারিক পাঠ্য বইয়ের খোঁজ করেত চাইলেন–কিন্তু সে রকম কোন বই পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত তারা পৃথিবীর প্রথিতযশা কোন বয়স্ক শিক্ষণ বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন ঐ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী কোন বইয়ের কথা তার জানা আছে কি না। তিনি জবাবে জানালেন, ‘না। আমি জানি বয়স্করা কি চান। তবে যে বই তাদের দরকার তা আজও লেখা হয় নি।’

আমার অভিজ্ঞতায় আমি জানি কথাটা সত্যি, কারণ আমি নিজেই বেশ কয়েক বছর ধরে মানবিক সম্পর্কে উপর লেখা ব্যবহারিক একখানা বই খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি।

যেহেতু এরকম কোন বইয়ের অস্তিত্ব ছিল না, আমার নিজের তৈরি পাঠক্রমের জন্য আমি যে বই লেখার চেষ্টা করেছি–এই সেই বই। আশা করি আপনাদের এটা ভালো লাগবে।

এ বই লিখতে গিয়ে, ওই বিষয়ের উপর লেখা যা আমার নজরে এসেছে তাই পড়েছি–এবং তা ডরোথী ডিক্সের লেখা, বিবাহ-বিচ্ছেদের বর্ণনা, ‘পেরেন্টস’ ম্যাগাজিন থেকে

প্রফেসর ওভারস্ট্রীট, অ্যালফ্রেড অ্যাকলার আর উইলিয়াম জেমসের রচনা পর্যন্ত। এ ছাড়াও আমি একজন অভিজ্ঞ গবেষকের সাহায্য নিই–নানা গাঠাগারে আমি পড়তে পারিনি এমন সব বই তিনি প্রায় দেড় বছর ধরে ঘেঁটেছেন। সে সব বইয়ের মধ্যে ছিল মোটা মোটা মনোবিজ্ঞানের বই, শয়ে শয়ে সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ ইত্যাদি। অসংখ্য জীবনী ঘেঁটেও তিনি জানার চেষ্টা করেছেন যুগে যুগে মনীষীরা মানুষের সঙ্গে কিভাবে মেলামেশা করেছেন। আমরা সব যুগের মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করি। জুলিয়াস সীজার থেকে শুরু করে টমাস এডিসন পর্যন্ত সমস্ত বিখ্যাত নেতাদের জীবনীই আমরা পড়ে ফেলি। আমার মনে পড়ছে আমরা শুধু থিয়োডোর রুজভেল্টেরই প্রায় শ'খানের জীবনী পড়ে ছিলাম। আমরা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি যুগ যুগ ধরে মানুষ মানুষকে জয় করতে আর প্রভাব বিস্তার করতে যে কার্যকর ধারণা পোষণ করেছে তার প্রতিটি আবিষ্কার করার কাজে আমরা সময় আর অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করবো না।

.

আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজে বেশ কিছু মানুষের সাক্ষাৎকার নিই, তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিখ্যাত। তাদের মধ্যে ছিলেন মার্কনী, ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট, ওয়েন ডি, ইয়ং ক্লার্ক, গেবল, মেরী পিকফোর্ড, মার্টিন জনসন। এই সব খ্যাতনামাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে আমি জানার চেষ্টা করি মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা কি কৌশল কাজে লাগিয়ে ছিলেন।

এই সব মালমশলা দিয়ে আমি ছোট্ট একটা কথিকা তৈরি করলাম। আমি এর নাম দিলাম"প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ"। এটাকে ছোট্ট বলার কারণ আছে। গোড়ায় এটা ছোট্টই ছিল। তবে বর্তমান এটা বেড়ে উঠে প্রায় দেড় ঘন্টার এক বক্তৃতাতেই পৌঁচেছে। বেশ

কয়েক বছর ধরে প্রতিটি শিক্ষাবর্ষে নিউইয়র্কের কার্নেগী ইনস্টিটিউটে প্রাপ্তবয়স্কদের সামনে সে বক্তৃতা আমি দিয়ে গেছি।

.

এই বক্তৃতা দিয়ে আমি তাদের অনুরোধ করেছি সেটা তাদের ব্যবসা আর সামাজিক যোগাযোগে প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগিয়ে পরীক্ষা করতে, তারপর আবার ফিরে এসে আমাদের জানাতে তাদের অভিজ্ঞতা আর ফললাভ কেমন হলো। সত্যিই চমৎকার একটা দায়িত্ব! এই সব স্ত্রী-পুরুষ যারা স্বভাবতই আত্মোন্নতির জন্য লালায়িত, তারা নতুন ধরনের কোন গবেষণাগারে কাজ করার প্রেরণায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। বয়স্কদের জন্য মানবিক সম্পর্কের এমন গবেষণাগার বলতে এটাই একমেবাদ্বিতীয়। এমন আর ছিল না।

এ বইটি ঠিক বই লেখা বলতে যা বোঝায় তেমনভাবে লেখা হয় নি। শিশু যেমন করে বেড়ে ওঠে সেভাবেই এটা বেড়ে ওঠে। এ বই সেই গবেষণাগারে লালিত হয়ে বেড়ে ওঠে-সে বেড়ে ওঠা হাজার হাজার বয়স্কদের অভিজ্ঞতা পুষ্ট হয়ে।

বেশ ক'বছর আগে প্রায় পোস্ট কার্ডের আকারের একখানা কাগজে আমরা কিছু নিয়ম ছাপিয়ে নিয়ে কাজ শুরু করি। পরের বছর আরও বড় একখানা কার্ড ছাপালাম, তারপর একখানা পত্রিকা, তারপর এলো পরপর কতকগুলো ছোট বই। এদের প্রত্যেকটাই আকারে আর উদ্দেশ্যে প্রসারিত। আর এখন পনেরো বছরের অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার ফলশ্রুতিতে এসেছে এই বইটি। এ বইতে যে সব নিয়ম আমরা লিপিবদ্ধ করেছি তা

শুধু তত্ত্ব বা অনুমান নয়। যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক আমি দেখেছি এই নীতি কাজে লাগিয়ে বহু মানুষের জীবনে সত্যিই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি : গত বছর এই পাঠ গ্রহণ করতে আসেন এমন একজন যার প্রতিষ্ঠানে কর্মীর সংখ্যা ৩১৪ জন। বেশ কবছর যাবৎ তিনি তাঁর কর্মীদের যথেচ্ছভাবে গালিগালাজ আর সমালোচনাই করে এসেছেন। সহৃদয় ভঙ্গি, কাজে প্রশংসা বা উৎসাহ দান তার মুখে কখনও কেউ শোনেনি। এ বইতে যে নীতির কথা আছে সেগুলো পড়ার পর ওই নিয়োগকর্তাটির জীবন দর্শন অদ্ভুতভাবে পাল্টে গেল। তাঁর প্রতিষ্ঠানে আজ জন্ম নিয়েছে এক নতুন উদ্দীপনা, নতুন প্রেরণা, নতুন নিষ্ঠা আর সহযোগিতার আদর্শ। তিনশ চৌদ্দজন শত্রু তিনশ চৌদ্দজন বন্ধুতেই আজ বদলে গেছে। তিনি স্বয়ং একবার ক্লাসের সামনে বেশ গর্বভরে বলেছিলেন : আমার প্রতিষ্ঠানে যখন হেঁটে ঢুকতাম কেউ অভ্যর্থনা জানাতো না বরং আমাকে আসতে দেখে আমার কর্মচারীরা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতো। কিন্তু আজ তারা সবাই আমার বন্ধু, এমন কি আমার দারোয়ানও আমায় নাম ধরে ডাকে।'

এই নিয়োগ কর্তাটির ব্যবসাতে আজ প্রচুর লাভ, তার অবসরও প্রচুর, আর সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো তিনি তাঁর ব্যবসাতে আর পারিবারিক জীবনে অঢেল সুখ লাভ করেছেন।

অসংখ্য সেলসম্যান এই নিয়ম কাজে লাগিয়ে তাদের বিক্রির মাত্রা দারুণ বাড়াতে পেরেছেন। অনেকেই আবার খুঁজে পেয়েছেন জীবিকার নতুন দিগন্ত, নতুন পথ, যে পথ তারা আগে বৃথাই হাতড়ে ঘুরেছেন। কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারেরাও তাদের ক্ষমতা

বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। বাড়াতে পেরেছেন তাদের আয়। একজন কর্ণধার গতবছর জানিয়েছিলেন তার মাহিনা বছরে পাঁচ হাজারের মত বেড়ে গেছে বিশেষ করে এই বইয়ে লিখিত সত্যগুলো তিনি কাজে লাগান বলেই। আর একজন, ফিলাডেলফিয়া গ্যাস ওয়ার্কস কোম্পানীর এক কর্ণধার, তার কিছুটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্মীদের সঠিকভাবে পরিচালনার অযোগ্যতার জন্য প্রায় পদাবনতির মুখোমুখি হন। এই শিক্ষা গ্রহণের ফলে তাঁকে যে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে পদাবনতি থেকেই রক্ষা করেছিল তাই নয়, বরং পদোন্নতির সঙ্গে বাড়তি মাইনের সুযোগও এনে দিয়েছিল।

বেশ কয়েকবার পাঠক্রম শেষে কোন কোন সম্বর্ধনায় শিক্ষাগ্রহণকারী স্বামীদের স্ত্রীরা উপস্থিত হয়ে বলেছেন যে তাঁদের স্বামীরা এই শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে তাদের সংসারে সুখ শান্তি বেড়েছে।

বহুলোক এই শিক্ষা নিয়ে যে নতুন ফল লাভ করেন তাতে তারা প্রায়ই খুব আশ্চর্য হয়ে যান। সবটাই যেন যাদুবিদ্যার মত। মাঝে মাঝে উৎসাহের আতিশয্যে তাঁরা আবার রবিবারেও আমাকে বাড়িতে টেলিফোন করেছেন, কারণ আটচল্লিশ ঘন্টা অপেক্ষা করে আবার বক্তৃতা শুরুর সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে তাদের সাফল্যের কথা জানানোর ধৈর্য রাখতে পারেন নি।

একজন আবার গত বছর এই নিয়মের উপর কোন আলোচনা শুনে এতই বিচলিত হয়ে পড়েন যে ক্লাসে বসেই অন্যান্য সকলের সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা করে চলেন। রাত প্রায় তিনটের সময় বাকিরা সবাই বাড়ি ফিরে গেলেন, কিন্তু তিনি তার নিজের কৃত ভুল বুঝতে পেরে আর সামনে এক নতুন ঝলমলে ভবিষ্যতের রঙীন হাতছানি দেখে

তিনি এতোই উৎসাহিত হয়ে পড়েন যে তিনি ঘুমোতে পারলেন না। ওই রাতে তিনি ঘুমোতে তো পারলেনই না পরের দিন বা রাতেও পারলেন না। তার উপলব্ধি ছিল এমনই।

.

ভদ্রলোক কে হতে পারেন? কোন সাদাসিধে অশিক্ষিত মানুষ হঠাৎ নতুন কিছু তত্ত্ব পেলেই যিনি আঁকড়ে ধরতে পারেন এমন কেউ? না, তা নন–এ রকম কিছু মোটেই নয়? তিনি বেশ মার্জিত রুচির রাশভারি প্রকৃতির এক শিল্পের ব্যবসায়ী, শহরের নামজাদা মানুষ তিনি, দুটো বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক আর তিনটে ভাষায় অনর্গল কথা বলতেও পারেন।

এই পরিচ্ছেদ লেখার সময় এক প্রাচীনপন্থী অভিজাত জার্মান ভদ্রলোকের কাছ থেকে একখানা চিঠি পাই। ভদ্রলোকের পূর্বপুরুষরা প্রায় সকলেই বংশানুক্রমে হোহেনজোলার্নদের হয়ে সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছেন। এক আন্ত-আটলান্টিক যাত্রীবাহী স্টীমার থেকে লেখা তাঁর চিঠিতে তিনি এই নিয়ম সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তাতে যেন ধর্মীয় শ্রদ্ধার স্পর্শ লেগে ছিল।

আর একজন, নিউইয়র্কের এক বিশ্বদ্যিালয়ের স্নাতক। সামাজিক স্তরে যার নাম বেশ উঁচুতেই। ভদ্রলোক বেশ ধনী আর মস্ত এক কার্পেট তৈরির কারখানার মালিক। তিনি জানিয়েছিলেন এই ধরণের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে চৌদ্দ সপ্তাহে জনগণের উপর প্রভাব বিস্তারের কৌশল তাঁর চার বছরের কলেজ জীবনের শিক্ষার চেয়ে এটা অনেক বেশি

শিখতে পেরেছেন। এটা কি অসম্ভব? হাস্যকর? না অকল্পনীয়? আপনি অবশ্যই যে কোন রকম বিশেষণ যোগ করেই এ বক্তব্য উড়িয়ে দিতে পারেন। আমি শুধু কোন রকম মন্তব্য ছাড়াই একজন রক্ষণশীল আর অত্যন্ত সফল হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের বক্তব্যই উল্লেখ করছি মাত্র। ভদ্রলোক তাঁর এই বক্তব্য রেখেছিলেন ১৯৩৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী কোন সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের ইয়েল ক্লাবে প্রায় ছ'শ শ্রোতার সামনে।

আমাদের যা হওয়া উচিত তার সঙ্গে তুলনা করলে হাভার্ডের বিখ্যাত অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস একবার বলেন, আমরা আসলে অর্ধ জাগরিত। আমরা শুধু আমাদের শারীরিক আর মানসিক ক্ষমতার একটা ক্ষুদ্র অংশই কাজে লাগাচ্ছি। আরও ব্যাখ্যা করে বললে বলতে হয় যে কোন একজন মানুষ তার ক্ষমতার তুলনায় ঢের অক্ষমতা নিয়েই জীবন কাটায়। সে তার মধ্যে জমে থাকা বহু বিচিত্র নানা ধরণের শক্তি স্বভাবতই কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়।

যে শক্তি আপনি স্বভাবতই কাজে লাগাতে ব্যর্থ সেই ঘুমন্ত আর অব্যবহৃত মূলধন আবিষ্কার করে তাকে উন্নত করে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যেই এই বইয়ের প্রস্তাবনা।

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডঃ জন জি, হিবেন একবার বলেছিলেন, শিক্ষা হলো জীবনের নানা অবস্থার মোকাবিলা করার যোগ্যতা অর্জন।

এই বইয়ের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ পাঠ করার পরেও যদি আপনি জীবনের নানা অবস্থার মোকাবিলা করার কাজে কিছুটা অভিজ্ঞতা না সঞ্চয় করে থাকেন তাহলে

অন্ততঃ আপনার ক্ষেত্রে ধরে নেবো এ বই লেখা ব্যর্থ। যেহেতু হাবার্ট স্পেন্সার বলেছিলেন, 'শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য হলো তাকে কাজে লাগানো, শুধু জ্ঞান আহরণ নয়।'

আর এ বই হল কাজে লাগানোরই বই।

এই ভূমিকা অন্যান্য সবরকম ভূমিকার মতোই একটু বেশি দীর্ঘ হয়ে গেল। অতএব এখানেই থামা যাক। এখন আসুন, সরাসরি কাজের কথায় আসি। আর দেরি না করে প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই পড়তে আরম্ভ করুন।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ

জনসংযোগের প্রাথমিক কৌশল

প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্যের সমালোচনা করবেন না

১৯৩১ সালের ৭ মে তারিখে নিউইয়র্ক শহরে দেখা গিয়েছিল সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ এক মানুষ শিকারের দৃশ্য। প্রাচীন এ শহরটায় এমন দৃশ্য কেউ আগে দেখেনি। কয়েক সপ্তাহ খোঁজ করার পর 'দু বন্দুকবাজ' ক্রোলিকে কজা করেছিল পুলিশ। খুনী ক্রোলির ধূমপানে বা সূরায় আসক্তি ছিল না। সে ধরা পড়লো ওয়েস্ট এণ্ড অ্যাভিনিউতে তার প্রেমিকার আবাসে।

প্রায়শ' দেড়েক পুলিশ আর গোয়েন্দা তার উঁচু তলার গোপন আবাস ঘিরে ফেলেছিল। ছাদের মধ্যে ফুটো করে তারা 'পুলিশ খুনকারী' ক্রোলিকে কাঁদানে গ্যাস ছড়িয়ে বের করার চেষ্টা করা হয়। এরপর পুলিশ আশেপাশের বাড়িতে মেশিনগানও বসালো–ঠিক তার পরেই প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে নিউইয়র্কের বিলাসবহুল আবাসন এলাকা জুড়ে শোনা যেতে লাগলো পিস্তলের শব্দ আর মেশিনগানের আওয়াজ। ক্রোলি মালপত্র বোঝাই একখানা চেয়ারের পিছনে লুকিয়ে এক নাগাড়ে পুলিশের দিকে গুলি চালাচ্ছিল। দশ হাজার উদগ্রীব মানুষ লড়াই দেখে চললো। নিউইয়র্কের রাস্তায় এমন দৃশ্য আগে কখনও চোখে পড়েনি।

ক্রোলি ধরা পড়ার পর পুলিশ কমিশনার মালরুনি জানান দু-বন্দুকবাজ লোকটা নিউ ইয়র্কের ইতিহাসে ধরা পড়া সবচেয়ে সাংঘাতিক অপরাধী। কমিশনার আরও জানান, সে একটা পালক নড়লেও খুন করতে অভ্যস্ত। কিন্তু 'দু-বন্দুকবাজ' ক্রোলির নিজের সম্পর্কে ধারণা কি রকম? আমরা তা জানতে পেরেছি কারণ পুলিশ যখন তার গোপন আস্তানায় গুলি চালাচ্ছিল সে তখন জনগণকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখছিল। লেখার ফাঁকে তার দেহের নানা আঘাত থেকে ঝরা রক্তের ধারা কাগজের বুকে লালচে আভা ফুটিয়ে তুলেছিল। চিঠিতে ক্রোলি লিখেছিল : আমার কোটের নিচে ঢাকা আছে এক ক্লান্ত অথচ দয়ার্দ্র হৃদয়-সে হৃদয় কারও ক্ষতি করে না।

এর অল্প কিছুক্ষণ আগে ক্রোলি লং আইল্যাণ্ডে এক গ্রাম্য রাস্তায় হৈ হুল্লোড়ে মত্ত ছিল। আচমকা একজন পুলিশ রাস্তায় রাখা ওর গাড়ির কাছে এসে বলে, 'আপনার লাইসেন্সটা একবার দেখি।'

কোন কথা না বলে ক্রোলি বন্দুক বের করে পুলিশটিকে সীসের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। অফিসারটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তেই ক্রোলি গাড়ি থেকে নেমে তার রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে আরও একঝাঁক গুলি করলো। আর এই খুনীই কি না বলেছিল : 'আমার কোটের নিচে ঢাকা আছে এক ক্লান্ত অথচ দয়ার্দ্র হৃদয়–সে কারও ক্ষতি করে না।'

ক্রোলিকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। সে যখন সিং সিং কারাগারের মরণ কুঠিতে হাজির হলো তখন হয়তো তার বলা উচিত ছিল : মানুষ খুন করার পুরস্কার

হিসেবে এটাই পাচ্ছি। কিন্তু না, সে যা বললো তা হলো : 'আত্মরক্ষার বদলে এটাই আমি পেলাম।'

এই কাহিনীর বক্তব্য হলো এই : 'দু-বন্ধুকবাজ' ক্রোলি নিজেকে মোটেই দোষ দিতে চায়নি।

অপরাধীদের মধ্যে এটা কি কোন অবাস্তব আচরণ মনে করেন আপনারা? তা যদি ভাবেন তাহলে এটা একবার শুনুন।

'আমার জীবনের সেরা মুহূর্তগুলো মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যই ব্যয় করেছি, তাদের নানাভাবে সাহায্য করেছি, বদলে যা পেয়েছি তা হলো নিন্দা, আর তাড়া খাওয়া পলাতক কোন মানুষের জীবন।

এ হলো অল ক্যাপোনের কথা। জেনে রাখতে পারেন, সে ছিলো এখনও পর্যন্ত আমেরিকার জনগণের এক নম্বর শত্রু-শিকাগোতে সেই ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ডাকাত দলের নেতা। ক্যাপোনও নিজের দোষ দেখতে পায়নি। সে আসলে নিজেকে জনগণের উপকারী বন্ধু বলেই ভাবতো-একজন অপ্রশংসিত জনসেবক আর জনসাধারণই তাকে ভুল বুঝে সম্মান দেয়নি।

ঠিক এই রকমই করেছিল ডাচ সুলজ, নেওয়ার্কে দুবৃত্তদলের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ার আগে। নিউইয়র্কের অন্যতম একজন জঘন্য ছুঁচো ডাচ সুলতূ খবরের কাগজে এক সাক্ষাৎকারে বলে সে একজন জনদরদী। সে নিজেও তাই বিশ্বাস করতো। সিং সিং কারাগারের ওয়ার্ডেন লয়েজের সঙ্গে আমার এই বিষয়ে বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক পত্রালাপ

হয়। তিনি স্বীকার করেন, 'সিং সিংয়ের খুব কম অপরাধীই নিজেকে দোষী বলে ভাবে। তারা আমার আপনার মতই মানুষ আর সেই কারণেই তারা যুক্তি খাড়া করে বোঝাতে চায়। ওরা বুঝিয়েও দিতে প্রস্তুত তারা কোন সিন্দুক কেন ভাঙে বা গুলিই বা চালায় কেন। ওদের বেশির ভাগই নানা রকম যুক্তি খাড়া করে তাদের সমাজবিরোধী কাজকর্মের সাফাই দিতে চায়, সে যুক্তি ভুল বা যুক্তিগ্রাহ্য যাই হোক। তাদের বেশ জোরালো শেষ কথা হলো তাদের কখনই আটক করা উচিত হয়নি।

যদি অল ক্যাপোন, 'দু-বন্দুক বাজ' ক্রোলি, ডাচ সুলজ বা জেলখানার ওই সাংঘাতিক লোকগুলো নিজেদের কোনভাবেই দোষী বলে না ভাবে–তাহলে আমরা যেসব মানুষের সংস্পর্শে আসি তাদের ব্যাপারটা কি রকম?

পরলোকগত জন ওয়ানামেকার একবার স্বীকার করেন : 'ত্রিশ বছর আগে উপলব্ধি করেছিলাম কাউকে তিরস্কার করা বোকামি। আমার নিজের দুর্বলতাগুলো দূর করতে আমায় কম ঝামেলা সহ্য করতে হয়নি কারণ এটা না বুঝে উপায় ছিল না যে ইশ্বর সকলকে সমান বুদ্ধি দেননি।'

ওয়ানামেকার এ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বেশ আগে ভাগেই, কিন্তু আমার বেলায় তা হয়নি। প্রায় শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশ হাতড়ে বেড়াবার আগে আমার উপলব্ধি হয়নি যে শতকরা নব্বই জন মানুষই নিজের দোষ দেখেও কখনও আত্ম-সমালোচনা করতে চায় না।

সমলোচনা করা বৃথা, কারণ এতে মানুষ সাবধানী হয়ে পড়ে আর স্বভাবতই সে নিজের কাজ সমর্থন করার পথ খোঁজে। সমালোচনা মারাত্মক জিনিস যেহেতু এটা মানুষের অহমিকাকে আঘাত করে, তার আত্মগর্বে চিড় ধরে আর তার ফলে সে সেটা ঘৃণার চোখে দেখা শুরু করে।

জার্মান সেনাবাহিনীতে কোন সৈনিককে কোন ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গেই কোন রকম অভিযোগ পেশ করতে বা সমালোচনা করতে দেওয়া হয় না। প্রথমে তার ক্রোধ প্রশমিত করে মাথা ঠাণ্ডা করতে বলা হয়। সে যদি সঙ্গে সঙ্গে কোন অভিযোগ আনে তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। ঈশ্বর জানেন, সাধারণ মানুষের জীবনেও এরকম কিছু লাইন থাকলে ভালো হতো–যেমন হাতশাগ্রস্ত বাবা মা, ঘ্যানর ঘ্যানর করা বউ বা পরের ছিদ্র খুঁজে ফেরা জঘন্য সব মানুষের জন্য।

ইতিহাসের হাজার হাজার পাতায় এরকম সমালোচনার অসারতার উদাহরণ খুঁজে পাবেন আপনারা। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায় থিয়োডোর রুজভেল্ট আর প্রেসিডেন্ট ট্যাফটের বিখ্যাত সেই ঝগড়া-যে ঝগড়ার ফলে রিপাবলিকান দল প্রায় ভেঙে যায় আর উড্রো উইলসন হোয়াইট হাউসে ঢোকার সুযোগ পেয়ে যান। এর ফলে বিশ্বযুদ্ধে তিনি আলোকোজ্জ্বল লেখার সৃষ্টি করে ইতিহাসের ধারাটাই বদলে দেন।

সব ব্যাপার একটু খতিয়ে দেখা যাক। ১৯০৮ সালে থিয়োডোর রুজভেল্ট যখন হোয়াইট হাউস ত্যাগ করেন তিনি ট্যাফটকে প্রেসিডেন্ট বানালেন। এরপর তিনি আফ্রিকায় সিংহ শিকার করতে চলে যান। ফিরে এসেই তিনি ফেটে পড়লেন। তিনি ট্যাফটকে তার রক্ষনশীলতার জন্য ভর্ৎসনা করে নিজেই তৃতীয় বারের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে নতুন দল

গঠন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যবস্থা করে ফেললেন। ঝগড়াটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠলো। এর পরেই নির্বাচন এলো, তাতে উইলিয়াম হাওয়ার্ড ট্যাফট আর তার রিপাবলিকান দলের দারুণ পরাজয় ঘটল-তারা মাত্র দুটো রাজ্য দখল করতে পারলেন– ভারমন্ট আর উটা। প্রাচীন দলটার এমন হার কখনও হয়নি।

.

থিয়োডোর রুজভেল্ট ট্যাফটকেই দোষ দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্যাফট কি নিজেকে দোষী মনে করেন? অবশ্যই না। অশ্রুসজল চোখে ট্যাফট বলেন : 'আমি বুঝতে পারছি না অন্য আর কিছু আমি করতে পারতাম কি না।'

এখন দোষটা কার রুজভেল্টের না ট্যাফটের? সত্যি কথা বলতে গেলে আমি সেটা জানি না,গ্রাহ্যও করি না। যে কথাটা বোঝাতে চাই তা হলো থিয়োডোর রুজভেল্টের ওই সমালোচনাতেও ট্যাফট নিজেকে দোষী বলে ভাবেন নি। বরং এটা সজল চোখে ট্যাফটকে আত্মসমর্পণ করতে আর ভাবতে বাধ্য করেছিল যে তিনি আর কিছু করতে পারতেন কি না।

এছাড়া ধরুন, টিপট ডোম তেল কেলেঙ্কারীর কথাটাই। ব্যাপারটা মনে আছে? ব্যাপারটা বছরের পর বছর খবরের কাগজে আলোড়ন তুলেছিল। সারা দেশেই এতে প্রায় কাঁপন ধরেছিল। আজকের দিনে যারা জীবিত আছেন তাঁরা জানেন আমেরিকার জনজীবনে এর চেয়ে সাংঘাতিক কাণ্ড আর কখনও ঘটেনি সেই কেলেঙ্কারীর ব্যাপারটা ছিলো এইরকম : হার্ডিংয়ের মন্ত্রীসভার ইন্টিরিয়র সেক্রেটারি অ্যালবার্ট ফলের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়

এক হিল আর টিপট ডোমের সংরক্ষিত সরকারি তেল ভাণ্ডার লিজ দিতে–এই তেল ভাণ্ডার নৌ বাহিনীর ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্যই রাখা ছিল। সেক্রেটারি কি প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দর ডেকেছিলেন মনে হয়? না, তিনি ওই দারুণ লাভজনক চুক্তির ব্যাপারটা তার বন্ধু এডওয়ার্ড এল ডোহেনিকে দিয়ে দেন। ডোহেনি কি করলেন? তিনি তার বন্ধু সেক্রেটারি ফলকে 'ধার' হিসেবে দিয়েছিলেন প্রায় লাখ খানেক ডলার। তারপর সেক্রেটারির ফল প্রায় স্বৈরতান্ত্রিক পথে যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌবহরকে ওই এলাকায় গিয়ে প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের 'এক হিল' রিজার্ভে তাদের তৈল রূপ স্তূপ ব্যবহার করা নিবৃত্ত করে হটিয়ে দেবার আদেশ দেন। প্রতিযোগিরা বন্দুক আর বেয়োনেটের মুখে হটে গিয়ে বাধ্য হয়েই আদালতের দ্বারস্থ হলেন–আর তার ফলেই টিপট ডোমের দশ কোটি ডলারের কেলেঙ্কারী ফাস হয়ে গেল। এর ফলে যে দুর্গন্ধ বেরিয়ে এলো সেটা এতই পচন ধরা যে হার্ডিং শাসন ব্যবস্থাটাই ধ্বংস হয়ে গেলো। তাছাড়াও এরই সঙ্গে সারা দেশটা ঘৃণায় শিউরে উঠলো, রিপাবলিকান দলও এসে দাঁড়ালো ভাঙনের মুখে আর অ্যালবার্ট বি. ফলের জায়গা হলো কারাগারে। . ফলকে সকলেই প্রচণ্ডভাবে দোষারোপ করলোজনজীবনে এধরনের অভিযুক্ত কেউ হয়নি। কিন্তু তাতে তিনি কি অনুশোচনা করেছিলেন? কখনও না! বেশ কয়েক বছর পরে হার্বার্ট হুভার এক জনসমাবেশে বক্তৃতায় জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট হার্ডিংয়ের মৃত্যুর কারণ ছিল মানসিক বিপর্যয় আর দুর্ভাবনা। কারণ এক বন্ধু তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। মিসেস ফল যখন কথাটা শুনেছিলেন তিনি চেয়ার চেড়ে লাফিয়ে উঠে সজল চোখে নিজের ভাগ্যকেই ধিক্কার জানিয়ে চিৎকার করে ওঠেন : কি! হার্ডিংকে ফল বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? কখনও না। আমার স্বামী কোনদিন কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। এই বাড়িটা সম্পূর্ণ সোনায় মুড়ে দিলেও আমার স্বামী লোভে পড়বেন না। তারই সঙ্গে আসলে

বিশ্বাসঘাতকাত করা হয়েছে আর যুপকাষ্ঠে তাকেই যীশুখ্রীষ্টের মত ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে।

এই হলো ব্যাপার, মানব চরিত্রের কাজই এই, দোষীরা সবসময়ই নিজেকে ছাড়া সকলকেই দোষারোপ করে চলে। আমরা সকলেই এই রকম। অতএব আপনি বা আমি যখন আজ বা কাল অন্য কাউকে সমালোচনা করার জন্য উৎসাহিত হবো তখন আমাদের মনে রাখা দরকার অল ক্যাপোন, 'দু বন্দুকবাজ' ক্রোলি আর অ্যালবার্ট ফলকে। আমাদের অনুভব করতে হবে সমালোচনা অনেকটা পোষা পায়রার মতই। এটা সবসময়েই নিজেদের ঘরে ফিরে আসে। আমাদের আরও উপলব্ধি করতে হবে যে লোককে আমরা ঠিক পথে আনতে চাইছি বা দোষ দিতে চাইছি সে সম্ভবত আত্মপক্ষ সমর্থণ করতে আর উল্টে আমাদেরই দোষারোপ করবে। তাছাড়াও হয়তো বা সেই শান্ত ট্যাফটের মতই বলবে, আমি বুঝতে পারিছ না অন্য আর কিছু আমি করতে পারতাম কি না।

.

১৮৬৫ সালের ১৫ই এপ্রিলের এক শনিবারের সকালে আব্রাহাম লিঙ্কন সস্তাদরের এক সরাইখানার হলঘরের শয়নগৃহে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। সে ঘর ছিল ফোর্ডের নাট্যশালার ঠিক সামনের রাস্তায়, যে নাট্যশালায় রুথ তাকে গুলি করে। লিঙ্কনের দীর্ঘ দেহ অতি ছোট একখানা শয্যায় আড়াআড়ি অবস্থায় শায়িত ছিল। বিছানার ঠিক মাথার দিকে টাঙানো ছিল অত্যন্ত সস্তা রোসা বনহিউর বিখ্যাত ছবি 'দি হর্স ফেয়ারের' প্রতিলিপি আর ঘরের মধ্যে হলদে আলো ছড়িয়ে চলে ছিল একটা বিষণ্ণ গ্যাসের আলো।

মৃত্যু পথযাত্রী লিঙ্কনের পাশে দাঁড়িয়ে সেক্রেটারি অব ওয়ার স্ট্যানটন বলেছিলেন, ‘ওই যে শায়িত রয়েছেন পৃথিবীর সবার চেয়ে যোগ্য একজন শাসক।‘

.

জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে লিঙ্কনের সাফল্যের রহস্য কি? আমি দশ বছর ধরে আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনী পাঠ করেছি আর তারই সঙ্গে তিন বছর ব্যয় করেছি অজানা লিঙ্কন’ নামে একখানা বই সংশোধন করে লিখতে। আমার বিশ্বাস কোনো মানুষের পক্ষে যা সম্ভব সেই ভাবেই আমি লিঙ্কনের ব্যক্তিত্ব এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আর সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভের চেষ্টা করেছি; বিশেষ করে আমি জানার চেষ্টা করেছি লিঙ্কনের জনসংযোগের পদ্ধতিকে। তিনি কি সমালোচনায় বিশ্বাসী ছিলেন? হ্যাঁ, তাই। ইণ্ডিয়ানার পিজিয়ন ক্রীক উপত্যকায় তরুণ বয়সে তিনি যে শুধু সমালোচনাই করতেন তা নয় বরং মানুষকে ব্যঙ্গ করার মধ্য দিয়ে তিনি চিঠি আর কবিতা লিখতেন। চিঠিপত্রগুলো তিনি আবার গ্রাম্য পথের বুকে ছড়িয়ে দিতেন যাতে সেগুলো অবধারিত ভাবেই পথিকের নজরে পড়ে। এই সব চিঠির মধ্যে একটার জন্য প্রচণ্ড আপত্তি ওঠে আর সেটা সারা জীবনই উত্তপ্ত জ্বালার সৃষ্টি করেছিল।

এছাড়াও লিঙ্কন ইলিনয়ের স্প্রিংফিল্ডে একজন ব্যবহারজীবী হিসেবে কাজ শুরু করার পরেও তিনি তার বিরোধীদের খোলাখুলি ভাবেই আক্রমণ করে খবরের কাগজে চিঠি প্রকাশ করতেন। একাজে একবার তিনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করে ফেলেন।

১৮৪২ সালের শরৎকালে তিনি জেমস শিল্ডস নামে এক গর্বিত অথচ কলহপ্রিয় আইরিশ রাজনীতিককে ব্যঙ্গ করেন। লিঙ্কন স্প্রিংফিল্ড জার্নালে এক বেনামা চিঠিতে ওই লোকটিকে ঠাট্টা করে কিছু লেখেন। সারা শহরই তাতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। স্পর্শকাতর আর গর্বিত শীল্ডস এতে প্রায় ক্রোধে ফেটে পড়েন। তিনি খুঁজে বের করেন চিঠির লেখককে, তারপর তাঁর ঘোড়ায় চড়ে লিঙ্কনের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। লিঙ্কনকে পেয়েই তিনি তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। লিঙ্কন অবশ্য লড়াই করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিরোধী ছিলেন–কিন্তু এ ব্যাপার থেকে তার বেরিয়ে আসার কোন সম্ভাবনাই ছিল না কারণ তাঁকে সম্মান বাঁচাতে হতো। তাঁকে অস্ত্র বেছে নিতে সুযোগ দেওয়া হলো। যেহেতু তার বেশ বড় বড় লম্বা হাত ছিল তিনি অশ্বারোহীর উপযুক্ত চওড়া তরোয়ালই বেছে নিলেন। তারপর ওয়েস্ট পয়েন্টের একজন স্নাতকের কাছে তরোয়ার খেলা শিখতে আরম্ভ করলেন। লড়াইয়ের দিনে লিঙ্কন আর শীল্ডস মিসিসিপি নদীর তীরে বালুকাবেলায় আমৃত্যু লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্রায় দুজনেরই বন্ধুরা এসে লড়াই বন্ধ করার ব্যবস্থা করলো।

লিঙ্কনের জীবনে এটাই বলতে গেলে সবচেয়ে জঘন্য এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এটাই তার কাছে মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক অমূল্য শিক্ষা। তিনি আর কখনই অপমানজনক চিঠি লেখেন নি বা আর কখনও কাউকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করেন নি। তারপর থেকেই প্রায় কোনদিন কাউকে তিনি সমালোচনাও করেন নি কোন কারণে।

গৃহযুদ্ধ চলার দিনগুলোর লিঙ্কন অটোম্যাকের যুদ্ধে একের পর এক সেনাবাহিনীতে নতুন নতুন সেনাপতি নিয়োগ করেন। সেই সব সেনাপতিদের মধ্যে একের পর এক আসেন ম্যাকক্লেলান, পোপ, বার্ণসাইড, হুঁকার। মীড–আর তাদের প্রত্যেকেই লজ্জাজকভাবে ব্যর্থ

হওয়ায় লিঙ্কন হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়েন। দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ ঐ সব অপদার্থ সেনাধ্যক্ষদের ক্রমাগত দোষারোপ করে চললেও লিঙ্কনের কিন্তু কারও প্রতি কোন বিমোগার ছিল না, বরং ছিল প্রত্যেকের প্রতি সহৃদয়তা। তিনি শান্তভাবেই সব মেনে নিয়েছিলেন। তার অতি প্রিয় উক্তি ছিল কারও সমালোচনা করো না, তাহলে নিজেও সমালোচিত হবে না।

মিসেস লিঙ্কন আর অন্যান্যরা যখন দক্ষিণাঞ্চলের মানুষদের কড়া সমালোচনা করতে চাইতেন, লিঙ্কন জবাব দেন : 'ওদের সমালোচনা কোরো না, ওই অবস্থায় পড়লে আমরাও ওই রকমই করতাম।'

.

তা সত্ত্বেও, কোন কারণে যদি কাউকে সমালোচনা করতে হতো তিনি ছিলেন নিশ্চয় লিঙ্কনই। একটা উদাহরণ দেখা যেতে পারে :

গেটিসবার্গের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৮৬৩ সালের জুলাই মাসের প্রথম তিন দিনে। ৪ঠা জুলাই রাতে শত্রু সেনাপতি লী দক্ষিণে পশ্চাদপসরণ করতে আরম্ভ করলে সারা দেশ মেঘে ঢাকা পড়ে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত শুরু হয়, ফলে। লী যখন পটোম্যাক নদীর কাছে তার পরাজিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাজির হন তিনি সভয়ে দেখতে পান তার সামনে ফুলে ফেঁপে ওঠা ভয়ঙ্কর এক নদী, যেটা পার হওয়া অসম্ভব, আর তার পিছনে তাড়া করে আসছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় বিজয় বাহিনী। ফাঁদে পড়েছিলেন লী, তার পালানোর আর পথ ছিল না। ব্যাপারটা লিঙ্কন বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর হাতে এসেছিল ঈশ্বর-প্রেরিত এক সুবর্ণ

সুযোগ-লী'র সেনাবাহিনীকে অবরুদ্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার সুযোগ। অতএব দারুণ আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লিঙ্কন কোন সামরিক পরামর্শ সভা না ডেকে সঙ্গে সঙ্গে লীকে আক্রমণ করতে সেনাপতি মীডকে আদেশ করলেন। লিঙ্কন টেলিগ্রাফ করে লীকে আদেশ জানানোর পর বিশেষ এক দূত পাঠিয়েও মীডকে সঙ্গে সঙ্গে কাজ করতে বললেন।

কিন্তু জেনারেল মীড কি করলেন? তাকে যা করার আদেশ দেওয়া হয় তিনি ঠিক তার উল্টোটাই করলেন। লিঙ্কনের হুকুম তিনি সরাসরি অগ্রাহ্য করে সামরিক পরামর্শ সভা ডাকলেন। তিনি ইতস্ততঃ আর দীর্ঘ সূত্রতা অবলম্বন করে লিঙ্কনকে টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে নানরকম ওজর আপত্তি তুললেন। তিনি সরাসরি লীকে আক্রমণ করতে অস্বীকৃত বলে জানালেন। শেষ পর্যন্ত নদীর জল কমে গেলে লী তার সেনাবাহিনীসহ পটোম্যাক নদী পার হয়ে পালাতে সক্ষম হলেন।

ক্ষেপে আগুন হয়ে গেলেন লিঙ্কন। এসবের উদ্দেশ্য কি? লিঙ্কন চিৎকার করে তাঁর ছেলে রবার্টকে বলে উঠলেন। হা ঈশ্বর! এসবের মানে কি? শত্রুকে আমরা আমাদের হাতের মুঠোতে পেয়েছিলাম, শুধু হাত বাড়ালেই ওরা আমাদের হতো। তা সত্ত্বেও আমার কথায় বা আদেশে আমার সেনাবাহিনী একটুও নড়লো না। এমন অবস্থায় যে কোন সেনাপতিই লীকে পরাজিত করতে পারতো। ওখানে আমি থাকলে আমি লী-কে নিজেই চাবকাতে পারতাম।

তিক্ত হতাশায় লিঙ্কন ভেঙে পড়ে তৎক্ষণাৎ নিচের চিঠিটি লিখেছিলেন : একটা কথা মনে রাখবেন তাঁর জীবনের এসময়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল আর তাঁর

বাগবিন্যাসেও যথেষ্ট সতর্কতা ছিল। অতএব ১৮৬৩ সালে লিঙ্কনের কাছ থেকে আসা চিঠিটার মধ্যে আসলে ছিল তীব্র তিরস্কার।

প্রিয় জেনারেল,

আমার বিশ্বাস হয় না আপনি লী-র পলায়নের মধ্যে যে বিরাট ব্যাপার এবং দুর্ভাগ্য জড়িয়ে আছে আদৌ সেটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। সে সহজেই আমাদের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছিল, তাই তাঁর বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে, আমাদের ইদানীং কালের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের সমাপ্তিই ঘটতে পারতো। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এ যুদ্ধ অনির্দিষ্টকাল ধরেই চলবে। আপনি যদি গত সোমবার নিরাপদে লীকে আক্রমণ না করে থাকতে পারেন তাহলে কিভাবে আপনি তাঁকে নদীর দক্ষিণ দিকে মোকাবিলা করবেন–বিশেষ করে সঙ্গে যখন বেশি সৈন্য নিতে পারবেন না? সেই সেনার সংখ্যা তখনকার তুলনায় দুই তৃতীয়াংশও যখন হতে পারে না! আপনার কাছে এ সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য কিছু আশা করাই অন্যায় হবে আর আমি আশাও করি না আপনি বিশেষ কিছু করতে পারবেন। আপনার সুবর্ণ সুযোগ আপনি হারিয়েছেন আর এজন্য আমি আশাতীত রকম দুঃখ লাভ করেছি।

মীড যখন এ চিঠি পেলেন তখন সেটা পড়ে তিনি কি করেছিলেন বলে আপনাদের মনে হয়?

মীড চিঠিটা আদৌ দেখেন নি। কারণ লিঙ্কন আদৌ তা তাকে দেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর লিঙ্কনের কাগজপত্রের মধ্যে চিঠিটা পাওয়া যায়।

আমার ধারণা হলো–যদিও নিছক একটা ধারণা–যে চিঠিটা লেখার পর লিঙ্কন জানালার বাইরে দৃষ্টি মেলে ধরে স্বগতোক্তি করেছিলেন, এক মিনিট অপেক্ষা করা যাক। মনে হয় আমার এতোটা তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। আমার পক্ষে হোয়াইট হাউসের শান্ত পরিবেশে বসে মীডকে আক্রমণ করতে হুকুম। দেওয়া খুবই সহজ। কিন্তু আমি যদি গেটিসবার্গে থাকতাম আর মীড গত সপ্তাহে যে রক্তপাত দেখেছে তা দেখতাম, আহত আর মৃতকল্পদের কাতর আর্তনাদ যদি আমার কানে প্রবেশ করতো তাহলে হয়তো আক্রমণ করতে আমিও তেমন উৎসাহবোধ করতাম না। আমার যদি মীডের মত ভীরুতা মাখা মনোবৃত্তি হতো তাহলে সে যা করেছে হয়তো আমিও তাই করতাম। যাইহোক অনুশোচনা করে লাভ নেই। আমি যদি এ চিঠি ওকে পাঠাই তাতে আমি মানসিক শান্তি পাবো বটে কিন্তু পরিবর্তে মীড যেভাবে হোক আত্মসমর্পণ করে নিজেকে সঠিক বলে প্রমাণ করতে চাইবে। এটা হলে সে আমাকে দোষারোপ করতে চাইবে। এর ফলে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে তার সেনাপতি হিসেবে তার সব যোগ্যতা আর প্রয়োজনও নষ্ট হয়ে যাবে আর খুব সম্ভব এটার জন্য তাকে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগে বাধ্য হতে হবে।

অতএব আমি যা আগেই বলেছি, লিঙ্কন চিঠিটা সরিয়ে রেখে দেন কারণ তিনি বুঝছিলেন তীব্র সমালোচনা আর নিন্দা নিঃসন্দেহে ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হয়। থিয়োডোর রুজভেল্ট বলেছিলেন যে তিনি যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন কোন গভীর সমস্যার সম্মুখীন হলে তিনি আরাম কেদারায় শরীর ছড়িয়ে হোয়াইট হাউসে তার ডেস্কের পিছনে টাঙানো লিঙ্কনের বিশাল ছবিটির দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতেন 'আমার মত অবস্থায় পড়লে লিঙ্কন কি করতেন?' তিনি নিজের সমস্যার সমাধান কি ভাবেই বা করতেন?

কখনও কাউকে কোন তিরস্কার করার আগে আমাদের উচিত পকেট থেকে একটা পাঁচ ডলারের নোট বের করে লিঙ্কনের ছবিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করা এমন সমস্যার সম্মুখীন হলে লিঙ্কন কি করতেন?

আপনার কি এমন কাউকে জানা আছে যাকে পরিবর্তিত করে তার উন্নতি ঘটিয়ে পরিচালিত করতে চান? চমৎকার! খুব ভালো কথা। আমিও মনে প্রাণে সেটা সমর্থন করি। তবে একাজ আপনার নিজেকে দিয়েই শুরু করছেন না কেন? এটাকে বেশ স্বার্থপরতার দৃষ্টিতেই দেখতে পারেন, এটা বরং অন্য কাউকে বদলে যাওয়ার চেষ্টার চাইতে অনেক বেশি লাভজনক–কথাটা নিছক সত্যি, আর ঢের কম বিপজ্জনকও বটে।

ব্রাউনিং একবার বলেছিলেন, কোন মানুষ যখন নিজের মধ্যেই সংগ্রাম শুরু করতে চায় তখন বুঝতে হবে তার কিছুটা মূল্য আছে। কাজটা ঠিক এখনই শুরু করলে আগামী বড়দিনের মধ্যেই হয়তো নিজেকে শুধরে নিতে পারবেন। হয়তো এর পরেই দীর্ঘ অবসরের পর নববর্ষের দিনগুলোয় অন্যান্য সব মানুষকে আপনি সমালোচনা করতে পারবেন।

তবে আগেই নিজেকে ত্রুটিমুক্ত করে ঠিক করে নিন।

কনফুশিয়াস বলেছিলেন, ‘আপনার পড়শীর ছাদের অবস্থা দেখে অনুযোগ জানাবেন না যখন আপনার নিজের সদরই অপরিচ্ছন্ন।’

আমার বয়স যখন খুবই অল্প তখন মানুষকে প্রভাবিত করার বেশ চেষ্টা করতে চাইতাম। সেই সময় আমেরিকার সাহিত্যকাশে স্বমহিমায় বিরচণ করতেন যিনি, সেই

রিচার্ড হার্ডিং ডেভিসকে আমি একটা মূখের মত চিঠি লিখেছিলাম। আমি লেখকদের সম্বন্ধে এক সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ রচনা করছিলাম আর এই জন্যই ডেভিসকে অনুরোধ জানাই তাঁর কাজের পদ্ধতি আমায় জানাতে। এর কয়েক সপ্তাহ আগে আমি একজনের কাছ থেকে একটা চিঠি পাই, তার তলায় লেখা ছিল 'এটা তিলিখিত, কিন্তু পঠিত হয়নি। আমার দারুণ ভালো লেগেছিল সেটা। আমার মনে হয়েছিল লেখক নিশ্চয়ই মস্ত একজন কেউ,হয়তো খুবই ব্যস্ত আর নামী। কিন্তু ব্যস্ততা আমার কণামাত্রও ছিল না, তা সত্বেও রিচার্ড ডেভিসের মধ্যে আমার সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মানোর জন্যই আমার চিঠির শেষে লিখে দিই তিলিখিত, কিন্তু পঠিত নয়।'

তিনি সে চিঠির কোন উত্তর দেননি। তিনি শুধু আমার চিঠিটার তলায় এ কথা কটি লিখে ফেরৎ দেন : 'ভদ্রতার কণামাত্রও আপনার জানা নেই।' কথাটা সত্যি, আমি খুব বোকামি করেছিলাম। তাঁর ওই গালাগাল আমার পাওনা ছিল। তবে আমি রক্ত মাংসের মানুষ বলেই সেটা সহ্য করতে পারিনি। আমার বিতৃষ্ণাটা এমন স্তরেই পৌঁছেছিলো যে দশ বছর পরে যখন রিচার্ড হার্ডিং ডেভিসের মৃত্যুসংবাদ পাঠ করি তখনও কথাটা আমার মনে ছিলো–অবশ্য স্বীকার করতে আমার লজ্জাই হচ্ছে–কথাটা হলো, তিনি আমাকে আঘাত দিয়েছিলেন।

ধরুন আগামীকাল আমার আপনার মধ্যে একটা মনোমালিন্য সৃষ্টি হলো–সেটা কিন্তু কয়েক দশক ধরেই জিইয়ে থেকে মৃত্যু পর্যন্তও থাকতে পারে। সামান্য সমালোচনা করে দেখা যাক, আর সেটা যতখানি যুক্তিসঙ্গতই আমরা ভাবি না কেন।

মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করার সময় আমাদের মনে রাখা দরকার যে আমরা যুক্তিসহ কোন প্রাণীর সঙ্গে ব্যবহার করছি না। আমরা এমন কোন প্রাণীর সঙ্গে কারবার করছি যাদের রয়েছে ভাবাবেগ–এই প্রাণীরা টগবগ করছে সংস্কার নিয়ে আর তারা চালিত হয় অহঙ্কার এবং গর্ব নিয়ে। তাছাড়া সমালোচনা ভয়ঙ্কর একটা স্ফুলিঙ্গ-যে স্ফুলিঙ্গ অহমিকার কেন্দ্রবিন্দুতে বারুদের মধ্য বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে–যে বিস্ফোরণে কখনও কখনও মৃত্যুও ত্বরান্বিত করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জেনারেল লেনার্ড উডকে সমালোচনা করে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ফ্রান্সে যেতে দেওয়া হয়নি। ফলে তার অহমিকায় যে আঘাত লাগে তাতেই বোধ হয় তার জীবন স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল।

অত্যন্ত তিক্ত সমালোচনায় ইংরাজী সাহিত্যকে যারা সমৃদ্ধ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ রত্ন টমাস হার্ডিকে চিরকালের জন্যই উপন্যাস লেখা ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। এই সমালোচনাই আবার ইংরাজ কবি টমাস চ্যাটারটনকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে।

.

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যৌবনে খুবই ভোলামনের ছিলেন, অথচ তিনিই আবার পরবর্তী কালে এমন কুশলী আর জনগণের সঙ্গে ব্যবহারে এমনই দক্ষ হয়ে ওঠেন যে তাঁকে ফ্রান্সে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। তাঁর সাফল্যের রহস্যটা কি? ফ্রাঙ্কলিন নিজেই বলেছিলেন :..আমি কাউকেই নিন্দা করবো না ... সকলের মধ্যে যেটুকু ভালো সেটাই শুধু বলবো।

যে কোন মূখের পক্ষেই সমালোচনা, নিন্দা বা অভিযোগ জানানো সহজ কাজ–বেশিরভাগ মূর্খই তাই করে।

কিন্তু অপরকে বুঝতে পারা আর ক্ষমাশীলতা পেতে গেলে দরকার চারিত্রিক দৃঢ়তা আর আত্ম সংযম।

কার্লাইল বলেছিলেন, 'কোন মহান মানুষের মহত্বের প্রকাশ ঘটে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন তার মধ্য দিয়ে। তাই মানুষকে নিন্দা না করে বরং তাদের বুঝতে চেষ্টা করি আসুন। চেষ্টা করে দেখা যাক তারা যা করে সেটা তারা কেন করে। এটাই সমালোচনার চেয়ে ঢের বেশি লাভজনক এবং কিছুটা বিহ্বলতাময়ও আর এর মধ্য দিয়ে আসে সহানুভূতি, ধৈর্য এবং দয়া ভাব। সবাইকে জানার অর্থই হলো সবাইকে ক্ষমা করা।'

ড. জনসন যেমন বলেছিলেন : 'স্বয়ং ইশ্বরও মানুষের মৃত্যুর শেষ দিনটি পর্যন্ত তাকে বিচার করেন না।'

তাহলে আপনি বা আমি জীবিত লোকদের বিচার করব কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-

জনগণের সঙ্গে ব্যবহারের রহস্য

এই পৃথিবীতে অন্যকে দিয়ে কাজ করানোর একটাই মাত্র উপায় আছে। কোনদিন কথাটা সম্পর্কে কখনও ভাবতে চেয়েছেন? হ্যাঁ, পথ বলতে একটাই আছে তা হলো অন্য সেই লোকটিকে কাজে আগ্রহী করে ভোলা।

মনে রাখবেন এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই।

অবশ্য কোন মানুষের পাঁজরায় রিভলবার চেপে ধরে তার ঘড়িটা আপনাকে দিতে বাধ্য করতে পারেন। কোন কর্মচারিকে কাজ করতেও বাধ্য করতে পারেন-অবশ্য আপনি পিছন না ফেরা : পর্যন্ত–আর সে বাধ্যতা আনতে পারবেন তাকে কর্মচ্যুত করার ভয় দেখিয়ে। কোন বাচ্চাকে কাজ করাতে পারেন তাকে চাবুক মারার ভয় দেখিয়ে বা অন্য কোন ভয় দেখিয়ে। কিন্তু এই ধরণের নিষ্ঠুর পদ্ধতির ফলশ্রুতিতে মেলে অবাঞ্ছিত কিছু।

আপনাকে দিয়ে ইচ্ছেমত কাজ করিয়ে নিতে পারি শুধু আপনি যা চান তাই আপনাকে দিয়ে। কিন্তু আপনি কি চান?

ভিয়েনার বিখ্যাত ড. সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, যিনি বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে খ্যাতনামা একজন মনোবিজ্ঞানী। তিনি একবার বলেন যে আপনি বা আমি যা কিছু করি সেটার উৎপত্তি দুটো উদ্দেশ্য থেকে : যৌন আবেগ আর বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক প্রফেসর জন ডিউক এটাকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ডঃ ডিউক বলেন, মানব মনে গভীরভাবে যে আকাঙক্ষা প্রোথিত থাকে তা হলো, বিখ্যাত হওয়ার বাসনা। কথাটা ভালো করে মনে রাখবেন। বিখ্যাত হওয়ার বাসনা এটা খুবই তাৎপর্যময়। এ বিষয়ে এ বইটিতে আরও অনেকবার এটার মুখোমুখি হতে হবে আপনাকে।

আপনি কি চান? হয়তো তেমন বেশি কিছু নয়, তবে যে সব অল্প কিছু জিনিস আপনি চান সেগুলো যাতে আপনাকে দিতে অস্বীকার করা না হয় তার জন্য নিশ্চয়ই দাবী জানাবেন আপনি। প্রায় প্রত্যেক স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষই এইগুলি আশা করে

১। স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষা। ২। খাদ্য। ৩। ঘুম। ৪। টাকা পয়সা এবং টাকায় কেনা যায় সেরকম জিনিসপত্র। ৫। পরের জীবন। ৬। যৌন আনন্দ ও তৃপ্তি। ৭। সন্তানের সুখ সুবিধা। ৮। নিজের প্রাধান্যবোধ।

এসবের প্রায় সবগুলোই পাওয়া সম্ভব–শুধু একটি ছাড়া। কিন্তু খাদ্য বা ঘুমের মত গভীর আকাঙক্ষা বা জরুরী জিনিসেরই মত আরও একটি জিনিস আছে। এটাকেই ফ্রয়েড বলেছিলেন বড় হওয়ার আকাঙক্ষা, একেই আবার ডিউক ও বলেছেন বিখ্যাত হওয়ার বাসনা।

লিঙ্কন একবার একটা চিঠি শুরু করেন এই ভাবে : প্রত্যেকেই প্রশংসা পছন্দ করে। উইলিয়াম জেমস বলেছিলেন : 'মানব চরিত্রের গভীর এক আকাঙক্ষা হলো প্রশংসা

পাওয়ার আকৃতি। লক্ষ্য করবেন তিনি ইচ্ছা' বা 'আশা' বা 'বাসনা' কথাটা ব্যবহার করেন নি। তিনি ব্যবহার করেছেন 'আকুতি' কথাটা।

এখানেই দেখা যাচ্ছে মানুষের অদ্ভুত, নির্ভুল এক ক্ষুধা। এখানেই বিরল প্রকৃতির সেই মানুষ, যিনি হৃদয়ের এই ক্ষুধা মিটিয়ে দিতে পারেন তার পক্ষেই সমস্ত মানুষকে তার হাতের মুঠোয় রাখা সম্ভব। আর এটাও ধ্রুব সত্য, যে লোকটি কবর দিয়ে তার জীবিকা নির্বাহ করে সেও এমন মানুষের মৃত্যুতে দুঃখবোধ করে।

মানুষ আর জানোয়ারের মধ্যে অন্যতম প্রধান তফাৎ হলো তার বিখ্যাত হওয়ার মনোবাসনা। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক : আমি যখন মিসৌরীতে খামারে কাজ করতাম আমার বাবা ডুরক-জার্সি জাতের চমৎকার শুয়োর আর সাদা-মুখ গরু পালন করতেন। গ্রামের মেলায় আমরা ওই সব শুয়োর আর সাদামুখ গরু প্রদর্শন করতাম। আমরা এতে বহুবার প্রথম পুরস্কারও পাই। আমার বাবা সাদা সিল্কের কাপড়ে পুরস্কারগুলো ওই সব নীল ফিতেগুলো ভালো করে এঁটে রাখতেন আর যখন বন্ধুরা বা কোন দর্শক আসতেন বাবা কাপড়ের এক প্রান্ত আর আমি অন্যপ্রান্ত ধরে সকলকে দেখাতাম।

শুয়োগুলো অবশ্য যে নীল ফিতে তারা জিততো তাই নিয়ে মাথা ঘামাতো না। তবে বাবা ঘামাতেন। পুরস্কারগুলো বাবার মনে একটা শ্রেষ্ঠত্ববোধ জাগাতে চাইতো।

আমাদের পূর্বপুরুষদের যদি এ ধরনের জ্বলন্ত শ্রেষ্ঠত্ববোধের আকাঙক্ষা না থাকতো তাহলে সভ্যতা গড়ে ওঠাই অসম্ভব হতো। এটা না থাকলে আমরাও হতাম ওই সব জন্তু জানোয়ারের মত।

এই রকম শ্রেষ্ঠত্ব বোধের তাগিদেই এক অশিক্ষিত, দারিদ্র-পীড়িত মুদীর দোকানের কোরানী কোন বাড়ির বাড়তি কিছু পিপের মধ্যে পাওয়া কিছু আইনের বই পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। বইগুলো তিনি কিনেছিলেন মাত্র পঞ্চাশ সেন্ট খরচ করে। আপনারা হয়তো এই কেরানীর কথা শুনে থাকবেন তিনি আর কেউ নন,স্বয়ং আব্রাহাম লিঙ্কন।

এই রকম শ্রেষ্ঠত্ব বোধের অনুভূতিই ডিকেন্সকে তার অমর উপন্যাসগুলো লিখতে প্রেরণা দিয়েছিলো। এই আকাঙক্ষাই স্যার ক্রিস্টোফার রেনুকে পাথরের মধ্যে দিয়ে সুর সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়। এই আকাঙক্ষাই আবার রকফেলারকে লক্ষ লক্ষ টাকা করার সাহায্য করে কিন্তু তিনি তা খরচ করেন নি! আর এই আকাঙক্ষাই আপনার শহরের সবচেয়ে ধনী মানুষটিকে বিশাল এক প্রসাদ বানাতে ও উদ্বুদ্ধ করেছে, যে বাড়ি তার প্রয়োজনের তুলনায় ঢের বড়।

এই আকাঙক্ষাই আপনাকে সর্বাধিক পোশাক পরতে আগ্রহী করে তোলে, আগ্রহী করে একেবারে আধুনিক গাড়ি চালাতে আর আপনার চমৎকার ছেলে মেয়েদের সম্বন্ধে গল্প বলতে আগ্রহী করে।

আবার এই আকাঙক্ষাই বহু ছেলেকে ডাকাত আর বন্দুকবাজ হওয়ার জন্য টেনে নিতে চায়। নিউইয়র্কের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ই.পি. মালরুনি বলেন : 'আজকের দিনে

বেশির ভাগ তরুণ অপরাধীই বিশেষ অহমিকাবোধে আচ্ছন্ন, তাদের গ্রেপ্তার করার পর প্রধান অনুরোধ হয় সমস্ত সংবাদপত্রে তাদের বীরের আসনে বসিয়ে সব প্রকাশ করা। কিন্তু তাদের যে বৈদ্যুতিক চেয়ারে ভয়ঙ্কর মৃত্যু বরণ করতে হবে সে কথা আর তাদের মনে থাকে না। তারা শুধু কল্পনা করে নেয় তাদের ছবি ছাপা হবে বেবরুথ, লাগার্ডিয়া, আইনস্টাইন, লিণ্ডেনবার্গ, উসকানিনি বা রুজভেল্টের সঙ্গে। আপনি যদি বলেন কেমন করে শ্রেষ্ঠত্ববোধ অনুভব করেন তাহলে আমি বলে দিতে পারি আপনি কি ধরনের মানুষ। এটাই আপনার চরিত্র কেমন সেটাই জানিয়ে দেবে। আপনার সম্পর্কে এটাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন ধরুন জন ডি. রকফেলার তার শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি পেয়েছিলেন চীনের পিকিংয়ে একটা আধুনিক হাসপাতাল তৈরি করার জন্য টাকা দিয়ে। এ হাসপাতাল ছিল লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষের জন্য। যাঁদের তিনি জীবনে দেখেন নি বা দেখার সম্ভাবনাও ছিল না। অন্যদিকে ডিলিঞ্জার তার শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি পায় একজন ব্যাঙ্ক ডাকাত আর খুনী হয়ে। পুলিশ যখন তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে মিনেসোটার একটা খামার বাড়িতে ঢুকে বলে, আমি ডিলিঞ্জার।' সে যে জনগণের এক নম্বর শত্রু সেটা ভেবে সে গর্ব অনুভব করতো। সে আরও বলে, আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করবো না, তবে আমি ডিলিঞ্জার।'

একটা বিশেষ ব্যাপার হলো, ডিলিঞ্জার আর রকফেলারের মধ্যে প্রভেদ তারা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি ভিন্ন ভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে পেয়েছিলেন।

ইতিহাসের পাতায় বিখ্যাত সব মানুষদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য নানা প্রচেষ্টার মজাদার সব উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। এমন কি জর্জ ওয়াশিংটনও চেয়েছিলেন তাঁকে 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মহান প্রেসিডেন্ট বলে ডাকা হোক। কলম্বাস চেয়েছিলেন তাকে বলা হোক

'মহাসমুদ্রের অধীশ্বর আর ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি। ক্যাথারিন দি গ্রেট 'হার ইম্পিরিয়ার ম্যাজেষ্টি' লেখা না থাকলে কোন চিঠি খুলতেন না। আবার, মিসেস লিঙ্কন হোয়াইট হাউসে মিসেস গ্রান্টকে তার সামনে বসার জন্য বাঘিনীর মতই চিৎকার করে বলেছিলেন, আপনার এতো দুঃসাহস আমি বসতে না বললেও আমার সামনে বসেছেন!

আমাদের দেশের কোটিপতিরা কুমেরু মহাদেশে অভিযান চালানোর জন্য টাকা দিয়েছিলেন এই শর্তে যে তুষার ঢাকা পর্বতমালার নামকরণ তাঁদের নামেই রাখা হবে। ভিক্টর হুগোও চেয়েছিলেন আরও বেশি–তার ইচ্ছা ছিল প্যারী শহরের নাম বদলে তার নামেই রাখা হোক। এমন কি শেক্সপীয়ার, সেই মহা শক্তিশালী লেখকও তাঁর পরিবারের জন্য পদক আর পুরস্কার প্রত্যাশা করতেন।

মানুষ আবার অনেক সময় সহানুভূতি আর নজর কেড়ে নেওয়ার জন্য শয্যাশায়ী হতে চায়, আর এটা করে তারা গুরুত্ব পেতে চায়। উদাহরণ হিসাবে মিসেস ম্যাকিনলের কথাটাই ধরুন। তিনি প্রাধান্য পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তার স্বামী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রের জরুরী কাজ অবহেলা করে তাঁর দিকে নজর দিতে বাধ্য করেন। প্রেসিডেন্ট স্ত্রীর শয্যায় ঘন্টার পর ঘন্টা থেকে তাকে দুবাহু বেষ্টনে রেখে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করতেন। স্ত্রী তার দাঁত বাঁধানোর সময় আবদার করতেন স্বামী সারাক্ষণ তার পাশে থাকুন। একবার দাঁতের ডাক্তারের কাছে তাকে বসিয়ে রেখে প্রেসিডেন্ট জন হে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ায় স্ত্রী বিশ্রী দৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন।

মেরী রবার্টসন রাইনহার্ট আমাকে একবার বলেছিলেন চমৎকার স্বাস্থ্যবতী এক তরুণী গুরুত্ব বা প্রাধান্য অর্জনের জন্যই শুধু শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। মিসেস রাইনহার্ট বলেন,

একদিন মেয়েটি কিছু উপলব্ধি হয় খুব সম্ভব ওর বয়স, আর যে সে কোনদিন বিয়ে করতে পারবে না সেই কথাটা। নিঃসঙ্গ দিন কাটাতে গিয়ে সে বুঝেছিল তার ভবিষ্যৎ বলে আর কিছুই নেই। সে তাই শয্যার আশ্রয় নিলো। তারপর দশ বছর তার বৃদ্ধা মা চারতলা থেকে বারবার উপর নিচে যাতায়াত করে ট্রে নিয়ে তার সেবা করে চললেন। অবশেষে একদিন বৃদ্ধা মা পরিশ্রমের ক্লান্তিতে মারা গেলেন। কটা সপ্তাহ মেয়েটি অসহায় ভঙ্গীতে পড়ে থাকার পর উঠে পড়তে বাধ্য হলো। তারপর পোশাক পরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এল।

কোন কোন বিশেষজ্ঞর ধারণা যে মানুষ রূঢ় বাস্তব জগতে প্রধান্যের অনুভূতি লাভে ব্যর্থ হয়েই শেষ পর্যন্ত উন্মাদ জগতের স্বপ্নিল দুনিয়ায় প্রবেশ করে সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালগুলোয় মানসিক রোগের যত রোগী চিকিৎসায় আছে তার সংখ্যা অন্যান্য রোগাক্রান্ত রোগীর তুলনায় ঢের বেশি। আপনি যদি নিউইয়র্ক রাজ্যের অধিবাসী হন আর আপনার বয়স পনেরোর বেশি হয় তাহলে আপনার পাগল হয়ে সাত বছর কাটানোর সম্ভাবনা হলো কুড়িজনের মধ্যে একজন।

এরকম পাগল হওয়ার কারণ কি?

কারও পক্ষেই এরকম ঝটিতি উত্তর সম্ভব নয়, তবে আমরা জানি যে কিছু রোগ যেমন সিফিলিস, মস্তিষ্কের ক্ষতি কোষগুলো ভেঙে নষ্ট করে দেয় আর তার পরিণতিতেই আসে উন্মাদ রোগ। বাস্তবে, এই মানসিক রোগের অর্ধেকেই ঘটে নানা ধরনের শারীরিক কারণে, যেমন মস্তিষ্কের ক্ষতি, সুরা, টক্সিন বা আঘাত। কিন্তু বাকি অর্ধেকটা-এটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর-বাকি যারা উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয় তাদের মস্তিষ্কের কোষে আপাত দৃষ্টিতে

কোন গলদ থাকে না। ময়না তদন্তের সময় যখন উচ্চ ক্ষমতার অণুবীক্ষণের সাহায্যে মস্তিষ্কের ঝিল্লি পরীক্ষা করা হয় তখন দেখা গেছে ওইসব কোষ আমার আমার আপনার মস্তিষ্কের মতই সজীব আর কর্মক্ষম। তাহলে পাগল হওয়ার আসল কারণ কী?

প্রশ্নটা আমি কিছুদিন আগে আমাদের বিখ্যাত এক উন্মাদাগারের প্রধান চিকিৎসককে করেছিলাম। এই চিকিৎসক ভদ্রলোক উন্মাদ রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে উচ্চতম সম্মান আর অত্যন্ত লোভনীয় পুরস্কারও পেয়েছিলেন। তিনি খোলাখুলি আমাকে জানান যে মানুষ কেন উন্মাদ হয়ে যায় সেটা তিনি আদৌ জানেন না। আসলে নিশ্চিতভাবে এটা কেউই জানে না। তবে তিনি বলেন যে বহু লোক যারা পাগল হয়ে যায়, তারা এই পাগলামির মধ্যে একটা প্রাধান্য লাভ করার অনুভূতি খুঁজে পায়, যেটা রূঢ় বাস্তবে তারা পেতে ব্যর্থ হয়। তারপরেই তিনি নিম্নলিখিত কাহিনীটি শোনান :

বর্তমানে আমার হাতে একজন রোগিনী আছেন যাঁর জীবনে বিয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। তিনি চেয়েছিলেন ভালোবাসা, যৌন আনন্দ, সন্তান আর সামাজিক সম্মান। কিন্তু রূঢ় জীবন তার সব আশাই নষ্ট করে দেয়। তাঁর স্বামী তাকে ভালোবাসতেন না। এমন কি তাঁর সঙ্গে খেতেও তার আপত্তি ছিল। তিনি স্ত্রীকে উপরে তাঁর ঘরে খাবার দিতে বাধ্য করতেন। মহিলাটির কোন সন্তান বা সামাজিক সম্মান ছিল না। এর ফলে মহিলাটি পাগল হয়ে গেলেন এরপর কল্পনায় তিনি তাঁর স্বামীকে ডাইভোর্স করেন। কুমারী জীবনের নামও গ্রহণ করেন। তার এখন বিশ্বাস ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সমাজে তার বিয়ে হয়েছে–আর নিজেকে তাই লেডি স্মিথ বলে ডাকার দাবীও করেন।

সন্তানের ব্যাপারে, তিনি কল্পনায় দেখেন প্রতিরাতেই তিনি এক একটি নতুন সন্তান লাভ করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেই তিনি আমায় বলেন, 'ডাক্তার, গত রাত্রিতে আমার একটা বাচ্চা হয়েছে।'

জীবন একবার তাঁর স্বপ্নের তরী বাস্তবের রূঢ় প্রস্তরের বুকে আছড়ে ভেঙে দিয়েছিল কিন্তু রৌদ্রকরোজ্জ্বল, কল্পনাময় বিচিত্র উন্মাদ জগৎটায় সেই ভাবনার তরী পাল তুলে তরতর করেই এগিয়ে চলে।

একে কি বিষাদময় বলবেন? এটা বলতে পারবো না। তার চিকিৎসক একবার আমাকে বলেন, 'আমি যদি কোনভাবে হাত বাড়িয়ে ওঁর উন্মাদ অবস্থা দূর করে দিতে পারি তাহলেও সেটা করবো না। কারণ নিজের অবস্থাতেই উনি অনেক বেশী সুখী।'

দল হিসেবে থাকলে পাগলেরা আপনার বা আমার চেয়ে ঢের সুখী। অনেকেই পাগল হয়ে আনন্দ উপভোগ করে চলে। করবে নাই বা কেন? তারা এইভাবে তাদের সমস্যা সমাধান করে ফেলে। এমন অবস্থায় থাকার সময় তারা বেশ মেজাজেই আপনাদের লক্ষ লক্ষ ডলারের চেক লিখে দেবে বা আগা খায়ের কাছে একটা পরিচয় পত্রও। তাদের স্বপ্নের জগৎটাতে তারা তৈরী করে নেয়। যে প্রাধান্য তারা হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরেছে সেটাই।

কোন মানুষ যে প্রাধান্যের অনুভূতির আকাঙক্ষায় পাগল পর্যন্ত হয়ে যায়, একবার ভেবে দেখুন আমি বা আপনি সুস্থ মানুষদের প্রকৃত প্রশংসা করে কি অলৌকিক ব্যাপারই না ঘটাতে পারি।

যতদূর জানি ইতিহাসে মাত্র দুজন মানুষই বছরে দশ লক্ষ ডলার মাইনে হিসেবে পেয়েছেন। তারা হলেন ওয়াল্টার ক্রাইসলার আর চার্লস শোয়াব।

অ্যান্ড্রু কার্নেগি শোয়াবকে বছরে দশ লক্ষ ডলার বা দৈনিক তিন হাজার ডলারের চেয়েও বেশি কেন দিয়ে যান? কেন?

কারণ শোয়াব দারুণ প্রতিভাবান? না। তবে কি ইস্পাত তৈরির কাজে তিনি অন্যের চেয়ে বেশি কিছু জানতেন? এও বাজে কথা। চার্লস্ শোয়ব নিজেই আমায় বলেছিলেন তাঁর নিচে বহুলোক কাজ করতো যারা ইস্পাত তৈরির ব্যাপারে তার চেয়ে অনেক বেশি জানতো। তাহলে?

.

শোয়াব বলেছেন যে তাঁকে ওই মাইনে দেওয়া হতো বিশেষ করে তাঁর মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের অদ্ভুত দক্ষতার জন্যই। আমি জানতে চেয়েছিলাম এটা তিনি কেমন করে করেন। নিচে তার নিজের মুখে জানানো সেই রহস্যের বিষয় জানাচ্ছি। এই কথাগুলো চিরকালীন সম্পদের মতই প্রতিটি বাড়ি, স্কুল, দোকান বা দেশের কর্মস্থলে ব্রোঞ্জে ঢালাই করে টাঙিয়ে রাখা উচিত। শিশুরা লাতিন ব্যাকরণের ক্রিয়ার গোড়ার কথা শিখতে গিয়ে বা ব্রাজিলের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের কথা জানতে গিয়ে সময় নষ্ট করার বদলে মনে গেঁথে রাখবে–যে কথাগুলো শুধু মেনে চলতে পারলে আমার বা আপনার জীবন ধারাও পাল্টে দিতে পারে;

'আমি মনে করি মানুষের মধ্যে উৎসাহ জাগিয়ে তোলার ক্ষমতার মধ্যেই রয়েছে আমার যা কিছু সম্পদ, শোয়াব বলেছিলেন। এটাই আমার সমস্ত ক্ষমতার গোড়ার কথা আর আমি মনে করি কোন মানুষের মধ্যের সেরা বস্তু আহরণ করার শ্রেষ্ঠ পথ হলো তাকে প্রশংসা করা আর উৎসাহ দেওয়া।

'উপর মহলের কাছ থেকে নিম্ন পদস্থ লোকদের সমালোচনার মত আর কিছুই কোন মানুষের উচ্চাকাঙক্ষাকে এমনভাবে ক্ষতি করে না। আমি কাউকে সমালোচনা করি না। আমি কোন মানুষকে কাজ করার উৎসাহ দেওয়াতেই বিশ্বাসী। আমি তাই প্রশংসা করতেই উদ্বিগ্ন থাকতে অভ্যস্ত, আর দোষ খুঁজে পেতে আমি ঘৃণা করি। আমি যা পছন্দ করি তা হলো আমার কজে আমি আনন্দ লাভ করি আর প্রশংসা আমি দরাজ ভাবেই করি।'

ঠিক এটাই করেন শোয়াব। কিন্তু গড়পড়তা সাধারণ মানুষ কি করে? ঠিক এর উল্টোটাই। তাদের কোন কিছু পছন্দ না হলে তারা চিৎকার করে মরা মানুষকে জাগাতে চায় কিন্তু প্রশংসার কিছু থাকলে তারা মুখ খোলে না।

শোয়াব আরও বলেন, 'আমার জীবনে বহু মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে সারা পৃথিবীর বহু বিখ্যাত মানুষের সংস্পর্শে আমি এসেছি। আমি আজও পর্যন্ত এমন কোন মানুষ দেখিনি তারা যত নামী দামী মানুষই হোন না কেন প্রশংসা করলে ভালো কাজ করেন নি বা সমলোচনায় ক্ষুব্ধ হন নি এমন কাউকেই পাইনি।'

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

শোয়ব আরও জানিয়েছিলেন অ্যাণ্ডু কার্নেগীর সেই ঘটনাবহুল সাফল্যের চাবিকাঠিও এই জিনিস। কার্নেগী তার সহকর্মীদের খোলাখুলি আর আড়ালেও প্রশংসা করতেন।

এছাড়াও কার্নেগী তার সহকর্মীদের প্রশংসা করতে চেয়েছিলেন তার সমাধি প্রস্তরের মধ্য দিয়েও। তিনি নিজে একটা সমাধি ফলক লিখেছিলেন যাতে খোদাই করা ছিল এই কথাগুলো : 'এখানে এমন একজন শায়িত আছেন যিনি তার চেয়েও বুদ্ধিমান মানুষদের সঙ্গে মিশতে পারতেন।

জনসংযোগের কাজে রকফেলার সাফল্যের অন্যতম রহস্য ছিল আন্তরিকভাবে প্রশংসা করা। যেমন উদাহরণ হিসেবে একবার যখন তাঁর একজন অংশীদার এডওয়ার্ডটি বেডফোর্ড, দক্ষিণ আমেরিকায় কিছু লগ্নী করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রায় দশ লক্ষ ডলার ক্ষতি করে বসলেন, জন ডি অবশ্যই দারুণভাবে সমালোচনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি জানতেন বেডফোর্ড তার যথাসাধ্যই করেছেন–অতএব ব্যাপারটির ওখানেই ইতি ঘটলো। রকফেলার প্রশংসা করার একটা পথ পেয়ে গেলেন, তিনি তাই বেডফোর্ডকে প্রশংসা করে বললেন মোট টাকার শতকরা ষাট ভাগ তো তিনি বাঁচাতে পেরেছেন। একাজ সত্যিই দারুণ', রকফেলার বলেছিলেন। উঁচু তলার মানুষও এমন সচরাচর করতে পারে না।'

জিগফিল্ড ছিলেন ব্রডওয়েকে যাঁরা উদ্ভাসিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন সবসেরা প্রমোদ সংগঠক। তিনি সুনামের অধিকারী হয়ে ওঠেন আমেরিকান মেয়েদের গৌরবান্বিত করে তোলার কাজে সুক্ষ্ম ক্ষমতা অর্জন করে। তিনি কাজ করতেন এইভাবে, যাদের দিকে কেউ দুবার তাকায় না এমন সাধারণ মেয়েদের তিনি মঞ্চে বারবার নিয়ে এসে

ক্রমে তাদের রহস্যময়ী আর লাবণ্যময়ী করে গড়ে তুলতেন। প্রশংসা আর আত্মবিশ্বাসের মূল্য তিনি জানতেন বলেই তিনি মেয়েদের তার সাহসিকতা আর বিবেচনাবোধ দিয়ে এই বিশ্বাস জাগাতেন যে তারা সুন্দরী। তিনি আসলে ছিলেন বাস্তববোধের মানুষ, তাই তিনি কোরাস মেয়েদের মাইনে মাসে ত্রিশ ডলারের বদলে প্রায় একশ পঁচাত্তর ডলারে তুলে দেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন খুবই চমকদার মানুষ। কোন অনুষ্ঠান রাত্রির উদ্বোধনের সময় তিনি প্রতিটি অংশগ্রহণকারিনীকে টেলিগ্রামে শুভেচ্ছা জানাতেন আর প্রতিটি কোরাসের মেয়েকে চমৎকার রক্ত গোলাপ উপহার দিতেন।

একবার আমায় অনাহারে থাকার পাগলামিতে পেয়েছিল আর তাই ছ' রাত ছ' দিন না খেয়ে কাটাই। ব্যাপারটা তেমন কঠিন ছিল না। দুদিনের শেষে যতখানি ক্ষুধার্ত ছিলাম তার চেয়ে ছ'দিনের মাথায় কমই ক্ষুধার্ত হই। তা সত্ত্বেও আমি জানি, আর আপনিও জানেন, অনেকেই নিজেদের অপরাধী ভাবতে চাইবে তারা যদি তাদের পরিবারের লোকজন বা কর্মচারিদের ছ' দিন অনাহারে রেখে দেয়। অথচ তারাই আবার তাদের ছ'দিন কেন, ছ' সপ্তাহ বা ষাট বছরেও তাদের আকাঙ্ক্ষিত সেই আহার্যের মতই প্রশংসাটুকু করতে চাইবে না। অ্যালফ্রেড লাস্ট যখন 'রিইউনিয়ন ইন ভিয়েনা'তে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তখন তিনি বলেন, 'আমি যা সবচেয়ে বেশি চাই তা হলো আমার আত্মবিশ্বাস বজায় রাখার জন্য কিছু প্রশংসা।'

.

আমার নানা ভাবেই আমাদের ছেলেমেয়েদের, বন্ধু বাস্তব বা কর্মচারিদের শরীরের জন্য যত্নের ব্যবস্থা করি কিন্তু কদাচিৎ আমরা তাদের আত্মবিশ্বাসের যত্ন নিতে চাই। আমরা

তাদের মাংস আর আলু খাইয়ে শক্তি বাড়াতে সাহায্য করি কিন্তু দুঃখের কথা, তাদের প্রশংসার বাণী শোনাতে আমাদের অবহেলা অফুরন্ত। আমরা বুঝিনা এই প্রশংসা তাদের মনে প্রভাত সঙ্গীতের মতই চিরজাগরুক থাকতে পারে।

কোন কোন পাঠক বোধহয় এ পর্যন্ত পড়ে বলতে চাইবেন : পুরনো বস্তাবন্দী মাল! একদম বাজে আর তোষামোদ ছাড়া কিছুই না। এ জিনিস আমরা জানি। এতে কাজ হয় না–বিশেষ করে বুদ্ধিমান মানুষদের কাছে।

ঠিক কথা, তোষামোদ বুদ্ধিমান মানুষেরা কদাচিৎ ভোলেন। তোষামোদ হলো, স্বার্থপরতা মাখা আর কপটতায় জড়ানো কিছু। এটা সাধারণত ব্যর্থ হয় আর তা হওয়ারই কথা। এটাও সত্যি কথা যে কিছু কিছু মানুষ প্রশংসা শোনার জন্য এতই লালায়িত আর উদগ্রীব থাকে যে তারা যে কোন কিছুই গিলতে তৈরি। অনাহারক্লিষ্ট মানুষ যেমন ঘাস বা কুচোমাছের টোপও গিলে ফেলে।

উদাহরণ হিসেবে বহু বিবাহকারী ডিভানি ভাইদের কথাটাই একবার ধরুন। এই ডিভানি ভাইরা বিয়ের বাজারে একেবারে জ্বলজ্বলে তারার মতই ছিল। তারা অর্থাৎ এই তথাকথিত রাজপুত্ররা কেমন করে দুই অপরূপ সুন্দরী আর বিখ্যাত অভিনেত্রী, বিখ্যাত একজন অপেরা গায়িকা আর লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বারবারা হাটনকে বিয়ে করেছিলেন? কেন? আর কেমন করেই বা তারা এটা করে?

'লিবার্টি' নামে একটা কাগজে অ্যাডেলা রোজার্স সেন্ট জন লিখেছিলেন, '.... মেয়েদের কাছে ডিভানিদের আকর্ষণের ব্যাপার যুগ যুগ ব্যাপী কোন রহস্যেরই অঙ্গ।'

তিনি আরও জানান, ‘বিখ্যাত পোলা নেগ্রী পুরুষ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আর বিখ্যাত শিল্পী একবার ব্যাপারটা আমার কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ওরা তোষামোদের ব্যাপারটা এতই ভালো বোঝে যেটা আর কোন আমার দেখা পুরুষ কে কখনই দেখিনি। আর এই তোষামোদ ব্যাপারটা এই রসকষহীন বাস্তব জগতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আপনাকে কথা দিতে পারি যে, মেয়েদের কাছে ডিভানি ভাইদের আকর্ষণের রহস্যটাও এটাই।’

এমন কি মহারাণী ভিক্টোরিয়াও তোষামোদপ্রিয়া ছিলেন। ডিসরেলী স্বীকার করেছিলেন যে রাণীর সঙ্গে কাজকর্ম করার সময় তিনি এ কাজটা বেশ চমৎকার ভাবেই করতেন। তার ঠিক নিজের ভাষায় ব্যাপারটা ছিল এই রকম, ‘... বেশ চমৎকার করে তোষামোদের প্রলেপ লাগাতাম। এটাও জানা কথা ডিসরেলী ছিলেন বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ, নিখুঁত আর ধুরন্ধর একজন মানুষ। নিজের জগতে তিনি ছিলেন একজন পাকা লোক। তার পক্ষে যে কাজ করা সহজ ছিল সেটা আমার বা আপনার পক্ষে কাজের হবে না। শেষ পর্যন্ত এই তোষামোদ ভালো করার চেয়ে আপনার ঢের বেশি ক্ষতিই করতে পারে। তোষামোদ হলো অনেকটা জাল টাকার মত আর জাল টাকার মতই তা আপনাকে সেটা চালাতে গেলে বিপদে ফেলবে।

তাহলে প্রশংসা আর তোষামোদের মধ্যে তফাৎ কি? খুবই সহজ। একটা হলো আন্তরিক আর অন্যটা হলো কপটতা মাখানো। একটার উৎপত্তি হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে আর অন্যটা সম্পূর্ণ বানানো। একটা স্বার্থপরতা মুক্ত আর অন্যটা স্বার্থপরতা জড়ানো। একটিকে সারা পৃথিবীই প্রশংসা করে আর অন্যটাকে সারা দুনিয়া ঘৃণা করে।

আমি কিছু দিন আগে মেক্সিকো সিটির ক্যাপশটেপেক প্রাসাদে জেনারেল ওব্রেগণের একটা আবক্ষ মূর্তি দেখে এসেছি। মূর্তির নিচে জেনারেল ওব্রেগণের জীবন দর্শন থেকে এই কথাগুলো খোদাই করা আছে : 'যে শত্রু আপনাকে আক্রমণ করছে তাকে ভয় পাবেন না। যে বন্ধুরা আপনাকে তোষামোদ করে তাদের সম্পর্কে সাবধান থাকুন।

না! না! না! আমি তোষামোদের হয়ে ওকালতি করছি না। এর ধারে কাছেও আমি যাচ্ছি না। আমি শুধু এক নতুনজীবন প্রবাহের কথাই বলছি। আমাকে আবার বলতে দিন- 'আমি এক নতুন জীবন প্রবাহের কথাই বলছি।

রাজা পঞ্চম জর্জ বাকিংহাম প্রসাদে তাঁর স্টাডি কক্ষে ছয়টি নীতিবাক্য টাঙিয়ে রেখেছিলেন। একটি নীতিবাক্য হলো : 'সস্তা তোষামোদ করতে বা পেতে যেন শিক্ষা না পাই।' এটাই আসল কথা, তোষামোদ হলো সস্তা প্রশংসা। একবার তোষামোদের চমৎকার একটা অর্থ শুনেছিলাম। সেটা বলার লোভ সামলাতে পারছি না : 'তোষামোদ হলো লোকটি আসলে নিজের সম্পর্কে কি ভাবে সেটাই বলে দেওয়া।'

আমরা যদি সবাই তোষামোদ করতে চাইতাম, তাহলে সবাই সেটা গ্রহণ করে কাজ করতো আর আমরাও মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে রপ্ত হয়ে উঠতাম। আমরা যখন কোন বিশেষ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাই না, আমরা সাধারণত আমাদের ভাবনার শতকরা ৯৫ ভাগই নিজের সম্বন্ধে ভেবে কাটাই।

এখন কিছুক্ষণের জন্যও যদি নিজেদের সম্বন্ধে আমরা ভাবনা বন্ধ করি আর অন্য সবাইয়ের ভালো ভালো ব্যাপারে ভাবতে শুরু করি তাহলে আমাদের ওই সস্তা আর

মিথ্যে তোষামোদ রপ্ত করা দরকার হবে না। সেটা প্রায় মুখ থেকে বের করার আগেই লোকে জেনে ফেলবে।

এমার্সন বলেছিলেন : 'যেসব মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে তারা সবাই কোন না কোনভাবে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এর মধ্য দিয়েই আমি তার সম্পর্কে জানতে পারি।'

এটা যদি এমার্সনের ক্ষেত্রে সত্য হয় তাহলে কি তা আমার বা আপনার ক্ষেত্রে হাজার গুণ বেশি সত্য হয়ে উঠবে না? আসুন, আমাদের কাজ কর্ম আর চাহিদা নিয়ে চিন্তা ভাবনা বন্ধ করি আর চেষ্টা করি অন্য সবাইয়ের সদগুণ নিয়ে। তোষামোদ ব্যাপারটাও ভুলে যান। শুধু আন্তরিক আর ভালো প্রশংসা করতে থাকুন। অন্যকে সমর্থনের বেলায় হাসিমুখে সেটা করুন আর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠুন তাহলেই দেখবেন মানুষ আপনার কথা মনে রাখবে আর সেটা আঁকড়ে রেখে সারাজীবন বারবার বলেও চলবে– আপনি তা ভুলে গেলেও বহু বছর পরেও তারা সেটা মনে রাখবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্যকে আপনার সঙ্গী করুন–নয় তো একলা চলতে হবে

প্রতিটি গ্রীষ্মকালেই আমি মেইনে মাছ ধরতে যাই। ব্যক্তিগতভাবে আমি আবার স্ট্রবেরী আর ক্রীম খুবই ভালোবাসি, তবে আশ্চর্য ব্যাপার হলো মাছেরা ভালোবাসে পোকামাকড়। অতএব আমি মাছ ধরতে গেলে আমি আমার নিজের পছন্দের কথাটা ভাবিনা বরং মাছেরা কি চায় তাই ভাবি। বঁড়শিতে তাই স্ট্রবেরি বা ক্রীম না আটকিয়ে আমি লাগাই পোকামাকড় বা একটা ফড়িং তারপর মাছেদের বলি : 'এটা পছন্দ হয়েছে?'

তাহলে মানুষ গাঁথতে গিয়ে এই সাধারণ বুদ্ধিটাই কাজে লাগান না কেন?

লয়েড জর্জ ও ঠিক এমনটি করেছিলেন। তাঁকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল যুদ্ধের সময় উইলসন, অর্ল্যাণ্ডো আর ক্লিমেন্সের মত নেতারা যখন বিস্মৃত আর ক্ষমতাচ্যুত হন তখন তিনি কেমন করে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় আসীন থেকেছেন। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তার ক্ষমতার শীর্ষে থাকার কারণ একটাই, আর তা হলো তিনি শিখেছিলেন মাছ বুঝে চার ফেলা চাই।

আমরা যা চাই তা নিয়ে আলোচনা কেন? এটা ছেলেমানুষী অবাস্তব কাজ। এটা অবশ্য ঠিক আপনি যা চান তাতে আপনার আগ্রহ আছে, চিরকাল ধরেই সেটা আছে। কিন্তু আর কেউ তেমন আগ্রহশীল নয়। আমরা বাকি সবাই আপনারই মত, আমরা যা চাই তাতেই আমাদের আগ্রহ।

অতএব এ জগতটায় অন্য মানুষকে আগ্রহী করে তোলার উপায় হলো সে যা চায় সে সম্পর্কে কথা বলা আর কি করে সেটা সে পেতে পারে তা দেখিয়ে দেওয়া।

ভবিষ্যতে কাউকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিতে গেলে কথাটা মনে রাখবেন। ধরুন আপনি চান না আপনার ছেলে ধূমপান করুক, তাহলে তাকে উপদেশ দিতে যাবেন না বা আপনি যা চান বলবেন না। বরং তাকে দেখিয়ে দিন সিগারেট খেলে সে বেসবল টীমে সুযোগ না পেতে পারে বা একশ গজ দৌড়ে বিজয়ী না হতেও পারে।

এ ব্যাপারটা মনে রাখা খুবই ভালো, আর তা আপনি ছোট ছেলেমেয়ে, শাবক বা শিম্পাঞ্জি যাকে নিয়েই চলতে চান না কেন। যেমন উদাহরণ হিসেবে : রাফল ওয়ালডো এমার্সন আর তার ছেলে একটা বাছুরকে একদিন খোঁয়াড়ে ঢোকানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তারা খুব সাধারণ সেই ভুলই করলেন। তারা নিজেরা যা চান তাই করছিলেন। এমার্সন বাছুরটাকে ঠেলে দিচ্ছিলেন আর তাঁর ছেলে টানতে চাইছিলেন। বাছুরটাও নিজে যা চায় তাই করতে লাগল–সে পা শক্ত করে কিছুতেই জায়গাটা ছাড়তে চাইলো না। বাড়ির আইরিশ পরিচারিকা ওঁদের ঝামেলা লক্ষ্য করছিল। পরিচারিকার প্রবন্ধ বা বই লেখার ক্ষমতা ছিল না, তবে এমন অবস্থায় তার প্রচুর সাধারণ বুদ্ধি ছিল, যা এমার্সনের ছিল না। বাছুরের মনোভাব সে বুঝল। সে করলো কি ওর আঙুলটা মাতৃস্নেহে বাছুরের মুখে ঢুকিয়ে দিতেই বাছুরটা সেটা চুষতে শুরু করলো আর তাকে ঘরে ঢুকিয়েও দেয়া গেল।

জন্মের পর থেকে আপনি যা করে আসছেন তা হলো আপনার কিছু উদ্দেশ্য আছে বলে। মনে ভাবুন যেদিন রেড ক্রশের তহবিলে একশ ডলার দান করেছিলেন। হ্যাঁ, এটা নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নয়। আপনি রেড ক্রশকে একশ ডলার দিয়েছেন কারণ আপনি সাহায্যের হাত বাড়াতে চেয়েছেন, আপনি চেয়েছেন চমৎকার একটা স্বার্থপরতাহীন স্বর্গীয় কাজ করতে।

.

একশ ডলার আপনি যদি খুব বড় মনে করতেন তাহলে নিশ্চয় টাকাটা আপনি হাতছাড়া করতেন না। অবশ্য দানটা আপনি চক্ষুলজ্জাতেও করে থাকতে পারেন বা কোন মক্কেলের কথাতেও তা পারেন। তবে একটা ব্যাপার ঠিক। আপনি দানটা করেন যেহেতু আপনি কিছু চেয়েছিলেন।

প্রফেসর হ্যারী এ ওভারষ্ট্রীট তাঁর চমৎকার বই 'ইনফ্লুয়েন্সিং হিউম্যান বিহেভিয়ারে' লিখেছিলেন : আমাদের কাজের উৎপত্তি হল আমাদের ইচ্ছাশক্তি থেকেই ...ভবিষ্যতে যারা অন্যদের বশে আনতে চান, সেটা পরিবারে, স্কুলে, রাজনীতিতে যেখানেই হোক না কেন–তাদের প্রতি সব সেরা পরামর্শ হলো প্রথমে সেই মানুষের মনে সে যা চায় সে সম্বন্ধে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা। একাজ যে করতে পারে সারা দুনিয়াই তার সঙ্গে থাকবে। যে পারে না তাকে একলাই চলতে হয়।'

একেবারে গরীবের সন্তান স্কচ অ্যান্ড্রু কার্নেগী, যিনি ঘন্টায় দু সেন্ট রোজগার করে জীবন শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত কয়েক হাজার কোটি ডলার দান করেন। জীবনে শুরুতেই

শিখেছিলেন যে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারের গোড়ার কথা হলো অন্যরা কি চায় সেটা বুঝে কথা বলা। তিনি মাত্র চার বছর স্কুলে পড়েছিলেন, তবুও মানুষদের ভালোভাবেই চালনা করতে শেখেন।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি : তার শালী একবার তার দুই ছেলে নিয়ে দারুণ চিন্তায় পড়েন। দুজনে ইয়েলে পড়াশুনা করছিল আর তারা নিজেদের নিয়েই এতে মশগুল ছিল যে বাড়িতে চিঠিপত্র লেখার কথা বা মায়ের চিঠির জবাব দেওয়ারও সময় থাকতো না তাদের।

কার্নেগী সব শুনে একশ ডলার বাজি রাখলেন যে উত্তর না চেয়েও পরের ডাকেই তিনি ওদের উত্তর এনে দেবেন। একজন বাজিতে রাজীও হয়ে গেল। তিনি এবার দুজনকে বেশ তামাশা করে চিঠি লিখে জানালেন এবং সঙ্গে দুজনকে পাঁচ ডলার করে নোট পাঠাচ্ছেন তাও জানালেন।

টাকাটা অবশ্য তিনি পাঠালেন না।

পরের ডাকেই যথারীতি উত্তর এসে গেল মেশোমশায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে। অবশ্য চিঠিতে আর কি ছিল নিজেরাই সেটা ভেবে নিন।

আগামীকালই আপনি হয়তো কাউকে দিয়ে কোন কাজ করাতে চাইবেন। কথা বলার আগে একটু চিন্তা করে প্রশ্ন করুন : 'ওকে কাজ করতে আগ্রহী করবো কিভাবে?'

এই প্রশ্নটা মনে জাগলে আমরা পাগলের মত ছুটে গিয়ে সেই লোককে আমি কি চাই বোঝাতে বসবো না। একাজ বৃথাই হবে।

নিউইয়র্কের কোন এক হোটেলের বলরুমটা আমি কুড়িটি রাতের জন্য ভাড়া করেছিলাম, উদ্দেশ্য কিছু বক্তৃতা দেওয়া। এক সীজুনের শুরুতে আমাকে আচমকা জানানো হলো আমার আগের ভাড়ার প্রায় তিনশগুণ বেশি দিতে হবে। এ খবর আমার কাছে আসে টিকিট ছেপে বিলিয়ে দেবার আর ঘোষণা করার পরে।

স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি টাকা দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু আমি কি চাই তা নিয়ে হোটেলের সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ হতো কি? তাদের আগ্রহ তারা কি চায় তাই নিয়ে। তাই দিন কয়েক পরে

আমি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

দেখা করে আমি বললাম, আপনার চিঠিটা পেয়ে একটু ধাক্কা খেয়েছি। তবে আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আপনার জায়গায় থাকলে আমিও বোধ হয় এরকম চিঠিই লিখতাম।এ হোটেলের ম্যানেজার হিসেবে যত বেশি লাভ করা যায় সেটা দেখা উচিত। তা না করলে আপনার চাকরি হয়তো থাকবে না, আর না থাকই স্বাভাবিক। এখন একবার আসুন এক টুকরো কাগজে লেখা যাক এই ভাড়া বাড়ালে আপনার কি সুবিধে অসুবিধে হতে পারে।

.

এরপর আমি একটা লেটার প্যাডের কাগজ নিয়ে মাঝবরাবর একটা লাইন টেনে একপাশে লিখলাম ‘সুবিধা’ অন্যপাশে লিখলাম ‘অসুবিধা’।

এবারে সুবিধার ঘরে লিখলাম : বলরুম বিনা ভাড়ায়। তারপরেই বললাম, আপনি বলরুম নাচ আর অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া পেলে আপনাদের সুবিধেই হয়। এ বেশ বড় সুবিধে কারণ বক্তৃতার জন্য ঘরটা ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে বলরুমে নাচের অনুষ্ঠানে ভাড়া দিয়ে অনেক বেশি লাভ হয়। আপনাদের বলরুমটা কুড়িটা রাতের মত আটকে রাখলে নিশ্চয়ই আপনাদের লাভ বেশ কমই হবে।

‘এবার আসুন অসুবিধের ব্যাপারটা দেখা যাক। প্রথমে, আমার কাছ থেকে বেশি ভাড়া আদায় না করে আপনাকে তা কমাতে হবে। আসলে এটা আপনাকে মন থেকে একদম মুছে ফেলতে হবে। কারণ যে ভাড়া চাইছেন আমি তা দিতে পারবো না। আমাকে বাধ্য হয়ে অন্য কোথাও বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে হবে।

‘এছাড়াও আপনার আর একটা অসুবিধে আছে। এই বক্তৃতা আপনার হোটেলে বহু শিক্ষিত আর সংস্কৃতিবান মানুষ টেনে আনবে। আর সেটা আপনার পক্ষে চমকার বিজ্ঞাপন হবে, তাই না? আসলে, খবরের কাগজে আপনারা যদি ৫০০০ ডলারের বিজ্ঞাপন দেন তাহলেও এতো মানুষকে হোটেল দেখাতে হাজির করতে পারতেন না, আমি এই বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে যা পারবো। এটা হোটেলের পক্ষে অনেকখানি, তাই না?

কথা বলতে বলতে আমি অসুবিধা দুটো ঠিক জায়গায় লিখে ফেললাম, তারপর কাগজটা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে বললাম, আশা করি সুবিধে আর অসুবিধে দুটোই ভালো করে দেখে তারপর আপনার মতামত আমায় জানাবেন।'

পরের দিনই একটা চিঠি পেলাম, তাতে আমায় জানানো হয়েছিলো যে আমার জন্য ভাড়াটা তিনশগুণের বদলে মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ানো হয়েছে। মনে রাখবেন এই ভাগ কামানো হয়েছিল এ ব্যাপারে আমার মনের ইচ্ছে একটুও না জানিয়ে। আমি সারাক্ষণই অন্য জন কি চায় আর পেতে পারে সেটাই ভেবেছি।

মনে করুন স্বাভাবিক মানুষের মতই আমি যদি কাজ করতাম, ধরুন সটান সবেগে ঘরে ঢুকে আমি বলতাম, এভাবে তিনশগুণ ভাড়া বাড়ানোর মানে কি একবার বলবেন? আপনি জানেন যে টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে আর ঘোষণাও করা হয়ে গেছে? তিনশগুণ! হাস্যকর? অসম্ভব! এ টাকা কিছুতেই দেব না!

এতে কি হতো! এটা তর্কের অবকাশ শুরু হতো, বেশ গরম কথাবার্তা চলতো–আর আপনাদের অবশ্যই জানা আছে তর্কের পরিণতি কেমন হয়। তাকে যদি স্বীকার করাতেও পারতাম তার ভুল হচ্ছে, তাহলেও তার অহমিকাবোধই তাকে সব মেনে নিয়েও হার মানাতে দিতো না।

মানবিক সম্পর্ক নিয়ে চমৎকার একটা পরামর্শের বিষয়ে বলছি। কথাটা হেনরি ফোর্ডের। তিনি বলেছিলেন, কারও যদি সাফল্যের গোপন চাবিকাঠি থাকে, তাহলে সেটা

থাকে তার অন্যের কথার দৃষ্টিকোণ আর নিজের দৃষ্টিকোণ বুঝে নেওয়ার ক্ষমতার মধ্যে। কথাটা বারবার বলার আর মনে রাখার মতই।

ব্যাপারটা খুবই সরল আর এতোই স্বাভাবিক যে,যে কেউ একবার দৃষ্টি মেলেই এর অন্তরের সত্য দেখতে পারবে, তবুও দুনিয়ার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই শতকরা ৯০ বার এটা আগ্রাহ্য করে।

কোন উদাহরণ চান? তাহলে আগামীকাল সকালে যেসব চিঠি আসবে সেগুলো দেখে নিন–তাহলেই দেখবেন বেশির ভাগই এই সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপারটা মানতে চায় না। একটা উদাহরণ নিন : কোন বিজ্ঞাপন এজেন্সীর বেতার দপ্তরের প্রধানের লেখা সারা দেশের নানান অফিসের কাছে। সারা দেশের স্থানীয় বেতার স্টেশনের ম্যানেজারদের কাছে লেখা হয় চিঠিটা (প্রতিটি প্যারাগ্রাফেই আমার নিজস্ব মতামত আমি লিখে দিয়েছি)

.

মিঃ জন ব্ল্যাঙ্ক,
ব্ল্যাঙ্ক ভিল,
ইণ্ডিয়ানা।

প্রিয় মিঃ ব্ল্যাঙ্ক,

বেতার দুনিয়ায় আমাদের কোম্পানী বিজ্ঞাপন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে ইচ্ছুক।

(আপনার কোম্পানী কি চায় তাতে কার মাথা ব্যথা? আমি আমার সমস্যা নিয়েই বিব্রত। ব্যাঙ্ক আমার বাড়ির বন্ধক আগেই বন্ধ করে দিয়েছে। পোকায় সব ফসল নষ্ট করছে, শেয়ার বাজার গতকাল উল্টেছে, আজ সকালে ৮-১৫র গাড়ি ধরতে পারিনি, জোন্সের নাচের অনুষ্ঠানে গতরাতে আমি নিমন্ত্রিত হইনি, ডাক্তার বলছেন আমার ব্লাড প্রেসার খুব বেড়ে গেছে, স্নায়ুর রোগ আর খুশকিও হয়েছে। এরপর কি হবে? আমি দুশ্চিন্তা নিয়ে সকাল বেলা অফিসে আসবো, চিঠিপত্র খুলবো, আর খুলেই দেখবো নিউ ইয়র্কের কোন এক কেউকেটা তার কোম্পানী কি চায় তাই নিয়ে সাতকাহন লিখেছে। ফুঃ। লোকটার যদি ধারণা থাকতো এরকম চিঠি কি রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহলে বিজ্ঞাপন ব্যবসা ছেড়ে সে ঘোড়ার ঘাস কাটা শুরু করতো)।

'এই এজেন্সী জাতীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে টাকা আয় হয় সেটা সবার চেয়ে বেশি। আমাদের পরবর্তী কর্মসূচী বছরের পর বছর ধরে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে চলেছে।'

(আপনারা অনেক বড় আর ধনী, একেবারে চুড়াতেই আপনাদের আসন। তাতে কি আসে যায়? আপনারা জেনারেল মোটর, জেনারেল ইলেকট্রিক আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে নিয়ে গড়া বিরাট কিছু হলেও আমি তার কানাকড়ি দামও দিই না। আপনার যদি ক্ষুদে চড়ুই পাখির মতও বুদ্ধি থাকতো তাহলে বুঝতে পারতেন আমি কত বড় আর তাতেই আমার আগ্রহ আছে–আপনি কতো বড় তাতে নয়। আপনাদের বিরাট সাফল্যের কথা শুনে আমার নিজেকে দারুণ ছোট আর হীন মনে হয়)।

'আমরা চাই আমাদের প্রতিষ্ঠান বেতার সম্পর্কে শেষ কথাই হয়ে উঠুক ...।

(আপনারা চান। আপনারা আস্ত গর্দভ। আপনারা বা মুসোলিনী বা কিং ক্রসবী কি চান আমার জানতে কণামাত্রও আগ্রহ নেই। আপনাকে শেষবারের মত জানাতে চাই যে আমি নিজে কি চাই তাতেই শুধু আমার আগ্রহ আছে–আর আপনার এই অদ্ভুত চিঠিতে সে কথা আপনি একবারও বলেন নি।)

'অতএব আপনারা আমাদের প্রতিষ্ঠানকে আপনাদের তালিকায় সাপ্তাহিক বেতার ষ্টেশনের খবরের জন্য নথীভুক্ত করবেন আশা রাখি ...।'

(নথীভুক্ত করবো! আপনাদের স্নায়ুর জোর আছে বটে! আপনার বড় বড় কথায় আমার নিজেকে একেবারে অপদার্থ মনে হচ্ছে তার উপর আপনি আবার আমাদের তালিকায় আপনাকে নথীভুক্ত করতে বলছেন। লেখার সময় একবার দয়া করে কথাটা বলারও প্রয়োজন বোধ করছেন না।)।

এই চিঠির দ্রুত প্রাপ্তি স্বীকার করে আপনাদের বর্তমান কাজের ধারা জানালে উভয়ের পক্ষেই সেটা কাজের হবে।

(মূর্খ! একখানা সস্তাদরের, বাজে কাগজে লেখা চিঠি পাঠিয়াছেন-চৈত্রের ঝরাপাতার মত একখানা চিঠি-তার উপর আমি যখন বন্ধক, ব্লাড প্রেসার, পোকার উৎপাত নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন আবার বলার স্পর্ধা দেখিয়েছেন আপনার ওই বাজে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করতে–তাও আবার দ্রুত'! আপনার কি জানা আছে আপনার মত আমিও ব্যস্ত–অন্ততঃ আমি সেটাই ভাবতে চাই? আর কথাটা যখন উঠেছে তখন বলি এমন লাট সাহেবের মত হুকুম করার সাহস কোথায় পেলেন? আপনি বলেছেন 'এটা উভয়ের পক্ষেই কাজের

হবে। শেষ পর্যন্ত তাহলে আমার মনটা বুঝতে পেরেছেন দেখছি। তবে আমার কি সুবিধা হবে সে ব্যাপারটা ধোঁয়ার মতই রয়ে গেছে।)

আপনার বিশ্বস্ত,
জন ব্ল্যাঙ্ক
ম্যানেজার, বেতার দপ্তর।

'পুনশ্চ : ভিতরে পাঠানো ব্ল্যাঙ্কভিল পুস্তিকাটি আপনার আগ্রহ জাগাতে পারে, আর এটা আপনি বেতারে ঘোষণার ব্যবস্থাও করতে পারবেন।

(শেষ পর্যন্ত পুনশ্চতে যা লিখেছেন তাতে আমার কোন সমস্যার সমাধান হতেও পারে। আপনি এটা দিয়েই তো চিঠিটা শুরু করতে পারতেন–কিন্তু কি লাভ? যে কোন বিজ্ঞাপন দপ্তরের লোক এমন চিঠি লিখলে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ জাগে। আমাদের ইদানিং কালের কাজের বিবরণ লেখা চিঠি পেয়ে আপনার কোন কাজই হবে না– আপনার দরকার হলো আপনার থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের জন্য খানিকটা আয়োডিন।)

.

এখন ধরুন বিজ্ঞাপন ব্যবসাতেই জীবন কাটাচ্ছেন আর মানুষকে প্রভাবান্বিত করতে পারেন বলে আত্মশ্লাঘা আছে এমন একজনের কাছ থেকেই যদি এরকম চিঠি আসে তাহলে আমাদের মাংসওয়ালা, রুটিওয়ালা বা কার্পেট সারাইওয়ালা কাছ থেকে কেমন আশা করবো?

আর একখানা চিঠির উদাহরণ দেখুন। এ চিঠিটা লিখেছিলেন এই বিষয়ের একজন ছাত্রকে জনৈক মালপরিবহণ কোম্পানীর সুপারিন্টেন্ডেন্ট। যাকে লেখা হয়েছিল তার মনে এটা কি রকম প্রভাব ফেলেছিল? আগে চিঠিটা পড়ুন তারপর বলছি।

‘এ জেরেগাস সন্স ইনকরপোরেটেড
২৮, ফ্রন্ট স্ট্রীট,
ব্রুকলীন. এন. ওয়াই।
মিঃ এডওয়ার্ড ভার্মিলেন সমীপেষু।

মহাশয়,
আমাদের বহির্গামী রেলপথের মাল গ্রহণ কেন্দ্রে অপরাহ্নে মাল পাঠানোর জন্য বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে। এই সবের ফলে দেখা দিচ্ছে ভিড়, আমাদের কর্মীদের ওভারটাইম, ট্রাকের জন্য দেরি আর কোন কোন ক্ষেত্রে মাল পাঠানোয় দেরি হয়ে যাচ্ছে। ১০ই নভেম্বর আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ৫১০ পেটি মাল আসে প্রায় বিকেল ৪-২০ মিনিটে।

আমরা এই সব কাজের আর দেরীতে মাল পরিবহণের অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রেহাই পেতে আপনার সহযোগিতা কামনা করি। আমরা কি এই অনুরোধ জানাতে পারি এরপর যখন এই রকম বেশি পরিমাণে মাল পাঠাবেন তখন সেগুলি ট্রাকে করে বিকেলের আগেই পাঠাবেন বা অন্ততঃ কিছু সময় আগেই পাঠাবেন?

এই রকম ব্যবস্থায় আপনাদের যে লাভ হবে তাহলো আপনাদের ট্রাক আরও দ্রুত খালি হতে পারবে, আর আমরা এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আপনাদের ট্রাক সঙ্গে সঙ্গেই খালি করে দিতে পারবো।

আপনার অতি বিশ্বস্ত,

জে-বি

সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

চিঠিটা পড়ার পর এ জেরেগাস কোম্পানীর সেলস ম্যানেজার মিঃ ভার্মিলেন সেটা আমার কাছে নিচের মন্তব্যসহ পাঠিয়ে দেন :

'যা চাওয়া হয়েছিল এ চিঠিটায় ঠিক তার উল্টো ফল হয়। চিঠিটা শুরু করা হয়েছে মাল খালাস ইত্যাদির অসুবিধা জানিয়ে, তবে বলতে গেলে এ নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমাদের কোন অসুবিধার কথা চিন্তা ভাবনা ছাড়াই অনুরোধ জানানো হয়েছে যে আমরা সহযোগিতা করলে ট্রাক দ্রুত খালাস করে ঐদিনেই মাল পাঠানো হবে।

'অন্যভাবে বলতে গেলে আমাদের যে ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ আছে সেটা সবার শেষে লেখা হয়েছে আর চিঠিটা সহযোগিতার না হয়ে শত্রুতাপূর্ণই উঠেছে।

আসুন এবারে দেখা যাক এচিঠিটা আবার নতুন করে লিখে আরও ভালো করা যায় কিনা। আমাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। হেনরি

ফোর্ড যেমন বলেছিলেন : সব সময় অপরজনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবেন, সঙ্গে নিজেদেরও।'

নিচে চিঠিটা ঘুরিয়ে লেখার উদাহরণ রাখছি। এটাই হয়তো সবচেয়ে ভালো নয়, তবে অবশ্যই কিছুটা উন্নত, কী বলেন?

মি. এডওয়ার্ড ভার্মিলেন,
অ/এ. জেরেগাস সন্স ইনকং।
২৮ ফ্রন্ট স্ট্রীট,
ব্রুকলীন, এন. ওয়াই।

প্রিয় মি. ভার্মিলেন,

গত চৌদ্দ বছর যাবৎ আপনার প্রতিষ্ঠান আমাদের একজন ভালো মক্কেল হয়ে আছেন। স্বাভাবতই তাই আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তাই আপনাদের যা প্রয়োজন সেই দ্রুত পরিচ্ছন্ন। কাজ আমরা করতে প্রস্তুত। যাই হোক আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি এটা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব যদি আপনাদের ট্রাক প্রচুর মালসহ বিকেলের অনেক পরে আসে, যেমন এসেছিলো ১০ই নভেম্বর। কেন? তার কারণ অন্যান্য কোম্পানীও বিকেলের দিকে মাল সরবরাহ করে থাকেন। স্বভাবতই এর ফলে ভিড় জমতে থাকে। এর অর্থ হলো অনিবার্য ভাবেই আপনাদের ট্রাক জেটিতে আটকে যায়, আর অনেক ক্ষেত্রে আপনাদের মাল পরিবহণে দেরিও হয়ে যায়।

এটা বড়ই খারাপ। এটা কেমন করে এড়ানো যায়? এটা সম্ভব আপনাদের মাল বিকেলের আগেই জেটিতে পৌঁছে দেওয়া। এতে সব কাজ দ্রুত হতে পারবে, আপনাদের মাল আমাদের নজরে থাকবে আর আমাদের কর্মচারিরাও তাড়াতাড়ি রাতের আগে বাড়ি ফিরে নিজেদের তৈরি সুস্বাদু ম্যাকারোনি আর নুডলস্ সহযাগে নৈশভোজ সারবে।

আমার অনুরোধ এচিঠিকে কোন অভিযোগ বলে ভাববেন না, আর এটাও ভাববেন না আপনাদের ব্যবসা চালানোর ক্ষেত্রে মাথা গলাচ্ছি।

যখনই আপনারা মাল পাঠান না কেন আমরা আনন্দের সঙ্গেই যথাসাধ্য আপনাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবো।

আপনারা অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। দয়া করে এ চিঠির উত্তর দিতে চাইবেন না।

আপনার বিশ্বস্ত
জে–বি–সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

আজকের দিনে হাজার হাজার বিক্রেতা রাস্তার ধারে ক্লান্ত, ভগ্ন মনোবল অল্প মাইনেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেন? তার কারণ তারা সর্বদাই নিজেরা কি চায় সে কথাই ভেবে চলে। তারা উপলব্ধিই করতে পারে না আপনি বা আমি কিছু কিনতে আগ্রহী নই। আমরা যদি চাইতাম তাহলে দোকানে গিয়ে কিনে আনতাম। কিন্তু আমি বা আপনি চিরায়ত পথেই নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে ব্যস্ত। অবশ্য কোন বিক্রেতা যদি আমাদের দেখিয়ে দিতে পারে তার সাহায্য বা জিনিস আমাদের সমস্যা সমাধানে কতটা

সাহায্য করতে পারবে তাহলে তাকে আমাদের কাছে বিক্রি করতে হবে না। আমারাই কিনব। একজন খরিদ্দার এটাই ভাবে সে নিজের থেকে ক্রয় করছে–তাকে বিক্রি করা হচ্ছে সে ভাবতে চায় না।

এ সত্ত্বেও কিন্তু বহু লোকই সারা জীবন বিক্রীর চেষ্টায় কাটাতে চায়–তারা সব কিছু ক্রেতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চায় না। যেমন উদাহরণ দিচ্ছি–আমি গ্রেটার নিউ ইয়র্কের ফরেস্ট হিল এলাকাতে থাকি। একদিন যখন স্টেশনে ছুটছিলাম তখন একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়–লোকটি বহুদিন যাবত লং আইল্যাণ্ডে জমির কেনা বেচা করে কাটিয়েছেন। ফরেস্ট হিল এলাকা তার ভালই জানা ছিল তাই আমি তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলাম আমার বাড়িটি কি দিয়ে বানান-ধাতব পাত না ফাঁপা টালি। সে জানাল ওটা তার জানা নেই, বরং তিনি যা বললেন সেটা আমার আগে তেকেই জানা। অর্থাৎ আমি নিজেই যেন ফরেস্ট হিলস গার্ডেন অ্যাসোসিয়েশনকে ফোন করে জানতে পারি। পরের দিন সকালে লোকটির কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। চিঠিতে আমি যা জানতে চেয়েছিলাম সেটাই তিনি দিয়েছিলেন কি? সেটা তিনি ষাট সেকেণ্ডের মধ্যে একটা টেলিফোন করেই জানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি বরং লিখেছিলেন আমি নিজেই টেলিফোন করে অ্যাসোসিয়েশন থেকে জেনে নিই এবং চিঠির শেষে তিনি অনুরোধ করেছিলেন আমি যেন আমার বীমা সংক্রান্ত ব্যাপারটা তাকেই দেখতে দিই।

আমাকে সাহায্য করতে তার কোন আগ্রহ ছিলো না। তিনি শুধু নিজেকেই সাহায্য করতে চাইছিলেন। আমার উচিত ছিল ওকে ভ্যাস ইয়ং-এর চমৎকার বই, ‘এ গো গিভার’ আর

'এ ফরচুন টু শেয়ার' পড়তে দেওয়া। তিনি বই দুটো পড়ে বইয়ের বক্তব্য অনুসরণ করলে আমার বীমার কাজ করার চেয়ে হাজার গুণ বেশি লাভ করতেন।

পেশাদার মানুষরাও একই ভুল করে থাকেন। বেশ কয়েক বছর আগে আমি ফিলাডেলফিয়ার একজন নামী নাক আর গলা বিশেষজ্ঞর কাছে যাই। লোকটি আমার টনসিলটা না দেখেই প্রশ্ন করেছিলেন আমার কাজকর্ম কি। আমার টনসিলের আকার নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা ছিল না। তার আগ্রহ ছিল আমার টাকা দেবার ক্ষমতা সম্বন্ধে। আমাকে কতটা সাহায্য করতে পারেন না ভেবে তিনি ভাবছিলেন আমার কাছ থেকে কত আদায় করতে পারবেন। ফল দাঁড়ালো তিনি কিছুই পেলেন না। আমি তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম তার ব্যক্তিত্ব অভাবের নিন্দা করে।

দুনিয়াটাই এইরকম মানুষে ভর্তি, শুধু লোভী আর স্বার্থপর। তাই নিঃস্বার্থভাবে অন্যের সাহায্যে তৎপর এমন লোক বড় কম, অথচ অন্যের চেয়ে তাদের প্রচুর সুবিধা আছে। তার প্রতিযোগিতা থাকে সামান্য। ওয়েন ডি. ইয়ং বলেছিলেন : 'যে ব্যক্তি অন্যের জায়গায় নিজেকে ভাবতে পারেন, অন্যের ভাবনা নিজের করতে পারেন ভবিষ্যতে তার ভাবনা থাকে না।

এই বইটি পাঠ করার পর আপনি যদি শুধু একটা জিনিসই পান, শুধু বেশি করে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিন্তা করা, এবং তার দৃষ্টিভঙ্গিকে দেখা–এই একটামাত্র জিনিস বইটা থেকে পেলে সেটাই হবে আপনার জীবনের একটা সোপান।

.

বেশিরভাগ লোকই কলেজে যান ভার্জিল পাঠ করতে আর ক্যালকুলাসের রহস্যের মত বিষয়ে ওস্তাদ হতে। তারা নিজেদের মন কিভাবে কাজ করে আদৌ ভাবেন না। যেমন ধরুন, আমি একবার ঠিক মত বক্তৃতা করার বিষয়ে একটা শিক্ষার ব্যবস্থা করি–এটা করা হয় নিউ জার্সির নেওয়ার্কের ক্যারিয়ার কর্পোরেশনে কাজে যোগদানের জন্য তৈরি কিছু কলেজে ছাত্রের জন্য। তাদের কাজ হল তাপ নিয়ন্ত্রণ জিনিসপত্র তৈরি। তাদের একজন অন্যান্যদের বাস্কেটবল খেলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল। তার নিজের কথাটা ছিল এই রকম : আমার ইচ্ছে আপনারা বেরিয়ে এসে বাস্কেটবল খেলতে চলুন। আমার খেলাটা ভালো লাগে, কয়েকবার জিমনাসিয়ামে গেলেও খেলতে পারিনি তোক ছিল না বলে। কিছুদিন আগে দু'তিনজন মিলে বল ছুঁড়তে গিয়ে চোখটা প্রায় কানা হবার মত হয়েছিল। আমার ইচ্ছে আগামীকাল আপনারা সবাই চলুন বাস্কেটবল খেলা যাবে, আমার এটা খেলতে খুব ইচ্ছে।

সে কি আপনারা কি চান একবারও বলেছে? আপনারা কেউই জিমনাসিয়ামে যেতে চান না, তাই না? সে যা চায় তাও খেলতে চান না। চোখ কানা হোক তাও কেউ বোধহয় চাইবেন না।

সে কি জিমনাসিয়ামে গেলে আপনাদের কি উপকার হতো সেকথা বোঝাতে পারত? নিশ্চয়ই পারত। এতে শরীর চালনা দ্রুত হতে পারে, এতে ক্ষিদে হয়। মাথা সাফ হয়। মজা পাওয়া যায়। হৈ চৈ খেলাধুলা করা যায়, বাস্কেটবলও খেলা যায়।

প্রফেসর ওভারস্ট্রীটের কথাটা একবার শুনুন। তার কথা হল : ‘প্রথমে অন্যজনের মধ্যে একটা সাগ্রহ চাহিদা বাড়িয়ে তুলুন। যে এটা পারে সারা দুনিয়াই তার সঙ্গে থাকে। যে তা পারে না তাকে একলাই চলতে হয়।’

আমার শিক্ষানবীসদের মধ্যে একজন তার ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়েছিলেন। ছেলের ওজন কম ছিল, সে ঠিকমত খেতেও চাইত না। তার বাবা মা লোকে যা বলে তাই করছিলেন। ছেলেকে বকাবকি করছিলেন। ‘মা তোমাকে এটা খেতে বলেছে’ বা ‘বাবা তোমাকে মস্ত বড় হয়ে উঠতে বলেছেন।’

ছেলেটা কি ওই সব গুজবে কান দিয়েছে? একটুও না। যার মাথায় ছিটে ফোঁটা বুদ্ধিও তাকে তিনি বুঝতে পারেন, তিন বছরের একটা ছেলে আর ত্রিশ বছরের বাবার দৃষ্টিভঙ্গী এক হতে পারে না। ত। সত্ত্বেও কিন্তু এক্ষেত্রে ছেলেটির বাবা তাই চাইছিল। এটা একটা অবাস্তব ব্যাপার। অবশ্য এটা শেষ পর্যন্ত তার খেয়াল হয়। তাই তিনি নিজেকে বললেন : ‘ছেলেটা কি চায়? ও চায় আর আমি যা চাই দুটোকে মেলাবো কেমন করে?’

চিন্তা আরম্ভ করতেই ব্যাপারটা তার কাছে সহজ হয়ে গেল। তার ছেলের একটা তিন চাকার সাইকেল ছিল, সেটায় চড়ে সে তাদের ব্রুকলীনের বাড়ির পাশের রাস্তায় বেড়াতে চাইতো। কটা বাড়ির পরে রাস্তায় এক দুষ্টু ছেলে থাকতোতার ছেলের চেয়ে বয়সে সে বড়ো। সে ঐ ছোট ছেলেকে ওর সাইকেল থেকে টেনে নামিয়ে নিজেই সেটা চালাত।

স্বভাবতই ছোট্ট ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে মার কাছে ছুটে এসে বলতেই তার মা আবার গিয়ে সেই শয়তান ছেলেটাকে সাইকেল থেকে টেনে নামিয়ে ওকে চড়িয়ে দিতেন। এ রকমই প্রায় রোজ ঘটত।

বাচ্চাটি কি চাইত? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শার্লক হোমসের সাহায্যের দরকার হয় না। ওর অহঙ্কার, ওর রাগ, নিজেকে বড় বলে মনে করা ওর মনের এই সব আবেগই ওর মনে খেলে যেতে চাইত–আর সেটা ওকে প্রতিশোধ নেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করত, সেই শয়তান ছেলেটির নাক ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে জাগত। তার বাবা এরপর যখন বাচ্চাটিকে বুঝিয়ে ছিল, সে যদি ওর মার কথামত ঠিকঠিক খেয়ে নেয় তাহলে আর কিছুদিনের মধ্যেই ও বড় হয়ে সেই শয়তান বড় ছেলেটার নাক ভেঙে একেবারে সায়েস্তা করে দিতে পারবে-ব্যাস্ এর পর তাকে খাওয়ানোর ব্যাপারে আর কোন সমস্যাই রইল না। সে তখন সব খাবারই ঠিক ঠিক খেতে আরম্ভ করলো, ক্রমে তরিতরকারি, মাছ যাই থাকুক। এর কারণ হলো ওর চেয়ে বড় একটা ছেলেকে ও ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিল, যে ওকে সবসময় জ্বালাতন করত।

এই সমস্যার সমাধান করার পর তার বাবা তার একটা সমস্যা সমাধানে নামলেন। বাচ্চা ছেলেটি প্রায়ই বিছানা ভিজিয়ে ফেলত।

বাচ্চাটি ঘুমোত ওর ঠাকুমার কাছে। সকাল বেলায় ঠাকুমা উঠে বিছানার অবস্থা লক্ষ্য করে ওকে বলতেন, ‘দেখ জনি, রাত্তিরে আবার কি করছি।’

ছেলেটা জবাব দিত : না না, আমি করিনি, তুমি করেছ।

ওকে বকুনি দিয়ে, মারধর করে নানা রকমে বুঝিয়ে সুঝিয়েও কিন্তু বিছানা শুকনো রাখা যাচ্ছিল না। অতএব তার বাবা মা স্বভাবতই প্রশ্ন তুললেন : 'ছেলেটাকে দিয়ে কেমন করে এই নোঙরা কাজ বন্ধ করাব?

ছেলেটার ইচ্ছেটা কি ছিল? প্রথমত সে চাইত তার বাবার মত পাজামা পরতে, ঠাকুমার মত রাতের গাউন তার একটুও ভালো লাগতো না। ঠাকুমা ওই বিছানা ভেজান নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, অতএব নাতির জন্যে রাতের পাজামা এসে গেল বেশ আনন্দের সঙ্গেই। আশা ছিল যদিও বদলে যায়। দ্বিতীয়তঃ ছেলেটি আরও চাইত নিজের একটা বিছানা। ঠাকুমা তাতেও আপত্তি করলেন না।

ওর মা ওকে ব্রুকলীনের একটা বড় দোকানে নিয়ে গিয়ে সেলস গার্লকে চোখ টিপে বললেন : 'এই ছোট্ট ভদ্রলোক কিছু কেনাকাটা করবেন।'

মেয়েটিও ওর শ্রেষ্ঠত্ববোধ জাগাতে চেয়ে বলল, বল, তোমাকে কী দেখাব?

ছেলেটি পা উঁচু করে একটু লম্বা হয়ে বলল, আমি আমার জন্য একটা বিছানা চাই।

ওর মা মেয়েটিকে একটা বিছানা দেখিয়ে চোখ টিপলেন। আর ছেলেটিকে সে সেটাই পছন্দ করাল। আর তাই কেনাও হয়ে গেল।

বিছানাটি পরের দিন পৌঁছে গেল বাড়িতে। রাতের বেলা বাবা বাড়িতে আসতেই ছেলেটি দরজার কাছে এসে চিৎকার করে বলল, বাবা! উপরে এসে আমার বিছানা দেখে যাও, আমি নিজে কিনেছি।

বাবা চার্লস্ শোয়াবের কথাটাই মেনে চললেন। অর্থাৎ দারুণ খুশি হয়ে প্রশংসা করে চললেন ক্ষুদে ভদ্রলোকের।

'এ বিছানাটা নিশ্চয়ই ভেজাবে না, কী বলো?' বাবা এবার বললেন।

'ওঃ না, না। কখনও এ বিছানা ভেজাব না।' ছেলেটি অবশ্যই তার কথা রেখেছিল যেহেতু তার গর্ব এর উপর নির্ভর করছিল। বিছানাটা যে ওর নিজের। তাছাড়া সে এক খুদে ভদ্রলোকের মত পায়জামাও পরেছিল। সে তাই বড়সড় একজন মানুষের মত ব্যবহার করতে চাইছিল। আর তা করেও ছিল।

আর একজন বাবা যিনি টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার, আমারই একজন ছাত্র তার তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে দারুণ সমস্যায় পড়েন। মেয়েটি তার প্রাতরাশ খেতে চাইত না একেবারেই। নানা রকম বকাবকি, অনুরোধ কোন কিছুতেই কাজ হল না। অতএব তার বাবা মা স্বভাবতই প্রশ্ন করলেন : 'কি করে আমাদের ছোট্ট মেয়েকে প্রাতরাশ খাওয়াব?'

বাচ্চা মেয়েটি ওর মাকে নকল করতে ভালোবাসত। সে সব সময়েই নিজেকে মা-র মত মস্ত বড় হয়ে গেছে বলে ভাবতে চাইতো। অতএব ওর বাবা মা একদিন তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে প্রাতরাশ বানাতে দিলেন। আর ঠিক মনস্তাত্ত্বিক সময়টাতে মেয়েটির বাবা রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন, সে তখন খাবার নাড়াচাড়া করতে করতে বলে উঠল : 'ওঃ দেখ বাবা, আমি আজ সকালের জন্য মল্টেক্স বানাচ্ছি।'

এরপর সেদিন সকালে তাকে খাওয়ানোর জন্য একটুও কষ্ট পেতে হল না। সে সবই খেয়ে নিল কারণ আজ তার আগ্রহ জেগেছিল। সে নিজের সম্বন্ধে বেশ গর্ববোধ করতে আরম্ভ করেছিল। নিজেকে জাহির করার একটা উপায় মেয়েটি পেয়ে যায় খাবার বানানোর মধ্যে দিয়ে।

উইলিয়াম উইন্টার একবার বলেছিলেন : নিজেকে প্রকাশ করা মানুষের চরিত্রের একটা প্রধানতম দিক। আমরা ব্যবসার ব্যাপারে এই মনস্তত্ব কেন কাজে লাগাতে পারি না? যখন কোন একটা চমৎকার ধারণা কিংবা ভাল কাজ কররবার ইচ্ছা আমাদের মাথায় খেলে যায়, তখন তা অন্য লোককে দিয়ে চিন্তা করিয়ে নিলেই হয় যে, এই কাজ করবার ইচ্ছা তাদের মাথা থেকে বেরিয়েছে। সে তখন সেটা তার নিজের বলেই ভাবতে চাইবে, আর এতেই সে কাজ করতে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হবে।

মনে রাখবেন : প্রথমেই অন্য লোকটির মধ্যে বেশ কিছুটা আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। যে এটা পারে সারা দুনিয়াকেই সে সঙ্গে পেতে পারে। যে পারে না তাকে একা একাই পথ চলতে হবে।’

.

এই বই থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার পেতে হলে এই ন’টি পরামর্শ মেনে চলবেন।

(১) আপনি যদি এই বইটি থেকে সবচেয়ে বেশি কিছু চান তাহলে একটি অপরিহার্য কাজ করতেই হবে। সেটা অন্য যে কোন রকম আইন, নীতি বা নিয়মের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা এমনই অপরিহার্য যে আপনার হাজার হাজার নিয়ম জানা থাকলেও

কোন কাজ হবে না। অন্যদিকে আপনার এই রাজকীয় জিনিসটি যদি থাকে তাহলে এই বইয়ের পরামর্শ না দিয়েই আশ্চর্যজনক ফল পেতে পারবেন।

সেই যাদুকরী ব্যাপারটা কি রকম? সেটা হলো এই : গভীর আর আন্তরিকভাবে শেখার আগ্রহ এবং মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের কাজে নিজের দক্ষতা বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

এরকম আকাক্ষা বাড়ানোর কাজটা কিভাবে গড়ে তোলা যাবে? এটা করা সম্ভব অনবরত নিজেকে বোঝান এই নীতিগুরো আপনার কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। নিজের মনেই এঁকে দেখতে থাকুন একাজে দক্ষতা অর্জন করলে কিভাবে আপনি সামাজিক আর অর্থকরী লাভের কাজে সাফল্য পেতে পারবেন। বার বার আপনার নিজেকেই বলুন : ।আমার জনপ্রিয়তা, আমার সুখ আর আমার আয় নির্ভর করে মানুষের সঙ্গে আমার ব্যবহার করার দক্ষতারই উপর।

(২) প্রতিটি পরিচ্ছেদে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মনে মনে একটা ধারণা করে ফেলুন। এরপরেই আপনার লোভ জাগবে পরেরটাতে দ্রুত এগুনোর জন্য। কিন্তু তা করবেন না। শুধু মানসিক আনন্দের জন্যই যদি পাট করেন তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু জনসংযোগে দক্ষতা বাড়ানোর জন্যই যদি পাঠ করতে চান তাহলে প্রতিটি পরিচ্ছেদ বেশ ভাল করে বারবার পড় ন। শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবেন তাতে সময় বাঁচান এবং ফললাভ উভয়ক্ষেত্রেই দারুণ কাজ হয়েছে।

(৩) পড়তে পড়তে মাঝেমাঝে এটু থেমে যা পড়লেন সেটা সম্পর্কে ভাবতে থাকুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন প্রতিটি উপদেশ কোথায় কখন কিভাবে কাজে লাগাতে পারেন। এরকম ভাবে পড়লেই সবচেয়ে বেশি কাজ পাবেন তাতে সন্দেহ নেই।

(৪) পড়ার সময় লাল রঙের কোন পেন্সিল বা পেন রাখবেন, যাতে পড়তে পড়তে কোন উপদেশ যদি দেখতে পান সেটা কাজে লাগাতে লাল কালির দাগ দিয়ে চিহ্নিত করুন। যদি সেই পরামর্শ বা উপদেশ খুবই ভালো মনে হয় তাহলে তার তলার লাইন টেনে পাশে চারটে তারা চিহ্ন X X X X দিন। লেখার তলায় লাইন আর এই রকম তারা চিহ্ন এইটিকে আরও আগ্রহের করে তোলে। তাছাড়া আবার পড়ার কাজেও সুবিধা হয়।

(৫) আমি একজন ভদ্রলোককে চিনি যিনি পনের বছর ধরে বিরাট এক বীমা প্রতিষ্ঠানের অফিসের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি প্রতি মাসে তার প্রতিষ্ঠান সে সমস্ত বীমার চুক্তি করে তার সব পড়ে ফেলতেন। হ্যাঁ, তিনি একই চুক্তিপত্র মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পড়ে যেতেন। কিন্তু কেন? কারণ তিনি তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জেনেছিলেন চুক্তির শর্তাবলী এইভাবেই তিনি মনে রাখতে পারবেন।

আমি একসময় প্রায় দুবছর ব্যয় করি জনগণের সামনে বক্তৃতা দেবার উপর একখানা বই লিখতে তা সত্ত্বেও কিন্তু ওই বইটাতে কি লিখেছি মনে করার জন্য আমাকে প্রায়ই সে বইয়ের পাতা উল্টে দেখতে হত। কি রকম দ্রুততায় যে আমরা সব ভুলে যাই ভাবলে অবাক হতে হয়।

অতএব এ বইটি থেকে যদি সত্যিকার চিরকালীন কোন উপকারে পেতে চান, তাহলে মনেও ভাববেন না যে একবারের মত শুধু পড়ে ফেললেই যথেষ্ট হবে। বেশ ভাল করে পড়ে ফেলার পর প্রতি মাসে বেশ ভাল করে আপনাকে কয়েক ঘন্টা আবার এই বইয়ের সব কিছু আলোচনা করতে হবে। বইটা আপনার ডেস্কে চোখের সামনে রেখে দিন। প্রতিদিন সময় পেলেই একটু চোখ বুলিয়ে নেবেন। প্রতিদিন নিজেকে বোঝাতে চান আপনার নিজের উন্নতি করার আশাতিরিক্ত সম্ভাবনা রয়েছে। মনে রাখবেন, এই পরামর্শ আর নিয়মগুলো বারবার পড়া আর আলোচনার মধ্য দিয়েই সেগুলো সহজ হয়ে আসবে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

(৬) বার্নার্ড শ একবার বলেছিলেন : কোন মানুষকে কিছু শেখাতে চাইলে সে কিছুতেই শিখবে। শ ঠিকই বলেছিলেন। যেহেতু শেখা ব্যাপারটা ব্যবহারিক। আমরা কাজ করতে করতেই শিখি। অতএব, এই বই থেকে যে নিয়মগুলো আপনি শিখতে চান সেগুলো সম্বন্ধে কিছু করার চেষ্টা করুন। সুযোগ পেলেই নিয়মগুলো কাজে লাগান। তা না করলে খুব তাড়াতাড়ি সেগুলো ভুলে যাবেন। যে জ্ঞান কাজে লাগানো যায় তাই কেবল মনে থাকে।

এই উপদেশগুলো আপনি হয়তো সবসময় কাজে লাগাতে গিয়ে অসুবিধা বোধ করতে পারেন। আমি এটা জানি, কারণ বইটা আমরই লেখা আমি নিজে প্রায়ই যা বলেছি তার সব প্রয়োগ করতে অসুবিধা বোধ করি। উদাহরণ হিসেবে বলছি, আপনি যখন অসন্তুষ্ট হন তখন অপরের সমালোচনা করেন, কিন্তু তার মন বুঝতে কখনও চেষ্টা করেন না। অপরের দোষ খুঁজে বার করা প্রশংসা করার চেয়ে ঢের সহজ। আপনি যা চান সেটার সম্বন্ধে বলা খুব সহজ, কিন্তু অপরে কি চায় সেটা বুঝে ওঠা অনেকটা কঠিন। এরকম

আরও আছে। অতএব এই বই পড়ে চলার ফাঁকে, মনে রাখবেন যে আপনি কেবল খবরাখবর সংগ্রহ করছেন, আপনি চাইছেন নতুন অভ্যাস গড়ে তুলতে। হ্যাঁ, আপনি নতুন জীবনবেদ গড়ে তুলতে চলেছেন। এজন্য চাই সময়, ধৈর্য আর প্রাত্যহিক প্রয়োগ।

অতএব এই পাতাগুলো অনবরত দেখুন। এটাকে জনসংযোগের ক্ষেত্রে একটা ব্যবহারিক বই হিসেবেই ভাবতে আরম্ভ করুন–আর যখনই আপনি কোন বিশিষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হবেন–যেমন কোন শিশুর সঙ্গে ব্যবহার, আপনার স্ত্রীকে স্বমতে আনা বা কোন অসন্তুষ্ট মক্কেলকে সন্তুষ্ট করা–তখনই স্বাভাবিকভাবে চট করে যে ভাবনা আসে সেটা করবেন না। তাতে সাধারণত ভুলই করা হবে। এর বদলে এ বইয়ের পাতাগুলো উল্টে যেখানে লাইনের তলায় দাগ দিয়ে রেখেছেন সেগুলো একটু দেখে নিন। তারপর ওই নতুন পদ্ধতি কাজে লাগান, দেখবেন তাতে যাদুর মত কাজ হচ্ছে।

(৭) আপনার স্ত্রী, ছেলে বা কাজের সহকর্মীকে প্রত্যেক দিন আপনি এবইয়ের নিয়ম ভঙ্গ করছেন দেখিয়ে দিলে, তাদের আপনি এক ডলার করে দেবার ব্যবস্থা করুন। এই নিয়মগুলো আয়ত্ত করার ব্যাপারটা একটা খেলার পর্যায়ে এনে ফেলুন।

(৮) ওয়াল স্ট্রীটের কোন এক বিখ্যাত ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট আমার ক্লাসে একবার বর্ণনা করেছিলেন আত্ম উন্নতির জন্য তিনি কী রকম চমৎকার এক পথ অবলম্বন করতেন। ভদ্রলোক ছেলেবেলায় তেমন লেখাপড়ার সুযোগ পাননি, তা সত্ত্বেও তিনি আমেরিকার একজন বিখ্যাত অর্থ বিনিয়োগকারী। তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁর সাফল্যের জন্য দায়ী তার নিজেরই আবিষ্কার করা এই পদ্ধতি। তিনি যা করতেন তা হল এই রকম। যতটা আমার মনে আছে তার নিজের কথাতেই জানাচ্ছি :

বছরের পর বছর আমি রোজ আমার যে সব সাক্ষাৎকার ঘটত তার একটা বিবরণ লিখে রাখতাম। আমার পরিবারের লোকজন শনিবারের রাতে আমার জন্য কোনরকম পরিকল্পনা রাখত না, কারণ তারা জানত শনিবার আমি কাটাই আত্ম-সমীক্ষা আর সমালোচনার মধ্য দিয়ে নিজেকে জানার চেষ্টা করি। নৈশভোজের পর আমি সেই দেখা সাক্ষাতের বিবরণ লেখা বইটা খুলে সারাদিনের সাক্ষাৎ আলোচনা, সভা ইত্যাদি নিয়ে সমস্ত সপ্তাহের ব্যাপারটা পড়ে ফেলি। তারপর নিজেকে প্রশ্ন করি :

"ওই দিনে কি ভুল করেছি?"

"কোন্ কাজটা আমি ঠিক করেছি এবং আরও ভালোভাবে কাজটা কেমন করে করতে পারতাম?"

"ওই অভিজ্ঞতা থেকে কি শিক্ষা পেতে পারি?"

'আমি প্রায়ই দেখতে পেয়েছি ওই সমালোচনায় আমি দুঃখই পেয়েছি। আমার নিজের ভুল দেখে আমি প্রায়ই অবাক হয়েছি। অবশ্য, বছর ঘুরে চললে দেখছি এরকম ভুলের সংখ্যা কমে এসেছে। মাঝে মাঝে এই রকম বিচার করার পর নিজেকেই আমার প্রশংসা করতে ইচ্ছে জেগেছে। এই রকম আত্মবিশ্লেষণ, আত্মসমালোচনা বছরের পর বছর করার ফলে অন্য সব কিছুর চেয়ে আমার ঢের বেশি উপকার হয়েছে।

'এটা আমায় কোন সিদ্ধান্ত নিতে আমার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে–আর এটা জনসংযোগের কাজে আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছে। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কিছু আমি ভাবতে অপারগ।'

আপনিও এই রকম পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে, এই বইয়ের নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ করুন না কেন? এটা করলে দুটো ফল লাভ হবে।

প্রথমত, আপনি নিজেকে বেশ অদ্ভুত আর অমুল্য কোন শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত দেখতে পাবেন।

দ্বিতীয়ত, আপনি দেখতে পাবেন মানুষের সঙ্গে মেলামেশার কাজে আপনার দক্ষতা বর্ষাকালের চারাগাছের মতই হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে।

(৯) একটা ডায়েরি লেখার অভ্যাস করুন-যে ডায়েরিতে আপনি আপনার এই নিয়ম মেনে চলায় প্রাপ্ত সাফল্যের হিসাব রাখবেন। খুব স্পষ্ট ভাবেই লিখবেন। এতে দেবেন নাম, তারিখ, ফলাফল ইত্যাদি। এরকম তালিকা রাখার ফলে আরও কাজ করার প্রেরণা পাবেন। বেশ কয়েক বছর পরে ডায়েরীর পাতায় একবার যখন চোখ বুলিয়ে দেবেন তখন কি চমৎকার তৃপ্তিই না পাবেন।

এই থেকে সবচেয়ে বেশি ফল পেতে গেলে এই কথাগুলো মনে রাখবেন : (১) মানবিক সম্পর্কের নীতির সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জনের জন্য এক গভীর আকাক্ষা গড়ে তুলুন।

(২) পরবর্তী পরিচ্ছেদ পাঠ করার আগে প্রতিটি পরিচ্ছেদ দুবার পড় ন।

www.bengaliebook.com

(৩) পড়ে চলার ফাঁকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন প্রতিটি উপদেশ কিভাবে কাজে লাগাতে পারেন।

(৪) প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার তলায় দাগ দিন।

(৫) প্রতি মাসে বইটি পর্যলোচনা করুন।

(৬) সুযোগ পেলেই নীতিগুলো কাজে লাগান। আপনার দৈনিক সমস্যা মেটানোর কাজে এই বইকে কাজে লাগান।

(৭) নিজের ভুল ধরিয়ে দেবার জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করুন।

(৮) প্রতি সপ্তাহে কতটা এগোলেন তার হিসাব নিন। কি কি ভুল করলেন আর কি উন্নতি করেছেন তার হিসাব রাখুন।

(৯) নিয়মগুলি কি রকম কাজে লাগালেন তার জন্য ডায়েরি রাখুন। মনে রাখবেন : প্রথমেই অন্য লোকটির মধ্যে বেশ কিছুটা আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। যে এটা পারে সারা দুনিয়াকেই সে সঙ্গে পেতে পারে। যে পারে না তাকে একা একাই পথ চলতে হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একাজ করুন সবাই আপনাকে চাইবে

কী করে বন্ধু পেতে হয় জানার জন্য এ বই পড়ার দরকার আছে কি? পৃথিবীর সব সেরা বন্ধুত্ব অর্জন করা মানুষটির কৌশলটাই একবার পড়ে ফেলুন না কেন? সে কে জানেন না? হয়তো আগামীকালই তাকে দেখবেন রাস্তা দিয়ে আসছেন আর তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যাবে। আপনি তার দশ ফিটের মধ্যে আসতেই সে তার ল্যাজ নাড়তে চাইবে। আপনি তাকে থামিয়ে তার পিঠ চাপড়ে আদর করলেই সে প্রায়। লাফিয়ে উঠে জানিয়ে দেবে আপনাকে সে কতখানি পছন্দ করে। আপনিও বুঝতে পারবেন তার এই আনন্দ প্রকাশের মধ্যে কোন রকম উদ্দেশ্য একেবারেই নেই। সে আপনাকে কোন কিছু বিক্রি করতে চায় না বা আপনাকে বিয়ে করতেও চায় না।

কোনদিন কি একবার ভাবতে চেয়েছেন একমাত্র কুকুরকেই জীবন ধারণের জন্য কোন রকম কাজ করতে হয় না? মুরগীকে ডিম পাড়তে হয়, গরুকে দুধ দিতে হয়, কানারি পাখিকে গান গাইতে হয়। কিন্তু কুকুর বেঁচে থাকার জন্যে আপনাকে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই দেয় না।

আমার যখন পাঁচ বছর বয়স আমার বাবা পনের সেন্ট দিয়ে হলদে লোমওয়ালা একটা কুকুর ছানা এনে দিয়েছিরেন। এই কুকুরছানাটা আমার ছোট বেলার সারাক্ষণের আনন্দের সঙ্গী ছিল। প্রত্যেক দিন বিকেলে প্রায় সাড়ে চারটের সময় সে বাগানের সামনে তার সুন্দর চোখ মেলে আমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকত। আর আমার

গলার আওয়াজ শুনতে পেলেই প্রায় বন্দুকের গুলির মত ছিটকে বেরিয়ে এসে দারুণ আনন্দে আমাকে তার খুশীর ভাব জানিয়ে চিৎকার করে চলত।

কুকুরটির নাম ছিল টিপি। প্রায় পাঁচ বছর ধরে সে আমার সারাক্ষণের সঙ্গী ছিল। তারপর এক দুঃখময় রাত্তিরে–কোনদিন সে রাতের কথা ভুলবো না–সে আমার মাত্র দশ ফিটের মধ্যে বাজ পড়ে মারা যায়। টিপির মৃত্যু আমার ছোটবেলার জীবনে একটা চরম শোকাবহ ঘটনা।

মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তুমি কোন বই পাঠ করো নি টিপি। এর দরকারও ছিল না। কোন ঐশ্বরীক ক্ষমতার মধ্য দিয়েই তুমি জানতে মানুষদের সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়ে দুমাসেই তুমি ঢের বেশি বন্ধু পেতে পারো অথচ দুবছরেও তোমার প্রতি মানুষের আগ্রহ জাগাতে চেষ্টা করে লাভ হবে না।

এ সত্ত্বেও কিন্তু আমি জানি কত লোকেই না অন্য সকলকে তাদের প্রতি আগ্রহান্বিত করার চেষ্টায় প্রাণপাত চেষ্টা করে চলে।

এটা অবশ্যই জানা কথা এতে কোন কাজ হয় না। মানুষ আপনার কিংবা আমার সম্বন্ধে মোটেই আগ্রহান্বিত নয়। তারা কেবল নিজেদের সম্পর্কেই শুধু আগ্রহান্বিত -সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে সব সময়েই।

নিউইয়র্ক টেলিফোন কোম্পানী একবার বেশ ধারাবাহিক টেলিফোন কথাবার্তা শুনে হিসেব করার চেষ্টা চালায় সবচেয়ে কোন্ কথাটা বেশি ব্যবহার হয় জানার জন্য। ঠিকই আন্দাজ করেছেন আপনারা-কথাটা হলো 'আমি' 'আমি' 'আমি' .... হ্যাঁ, 'আমি' এই

সর্বনামটাই ৫০০ টেলিফোনের কথাবার্তায় প্রায় ৩৯৯০ বার ব্যবহার হয়। ভাবুন শুধু ‘আমি’, ‘আমি’, ‘আমি’ ....

যে গ্রুপ’ ছবিতে আপনিও আছেন সেটা হাতে নিয়ে সবার আগে কাকে দেখার চেষ্টা করেন বলুন তো?

আপনি যদি ভেবে থাকেন লোকে আপনার প্রতি আগ্রহান্বিত তা হলে এই প্রশ্নটার জবাব দিন : ‘আপনার আজ রাতে যদি মৃত্যু হয় তাহলে কতজন লোক আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আসবে?’

.

লোকে কেন আপনার সম্পর্কে আগ্রহী হবে, প্রথমে তার সম্পর্কে আপনি যদি আগ্রহী না হন? এবার একটা পেন্সিল হাতে নিয়ে আপনার উত্তরটা চটপট লিখে ফেলুন :

আমরা যদি কেবল লোককে আমাদের নিজেদের কথা বলে আগ্রহী করার চেষ্টা করি, তাহলে কখনই সত্যিকার কোন বন্ধু পাবো না। বন্ধু, সত্যিকার বন্ধু এভাবে পাওয়া যায় না।

নেপোলিয়ান এইভাবে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। জোসেফাইনের সঙ্গে শেষ সাক্ষাক্ষারে তিনি বলেছিলেন : ‘জোসেফাইন, মানুষ ভাগ্যবান হতে পারে আমি তাই হয়েছি, তবুও ঠিক এই মুহূর্তে, সারা দুনিয়া একমাত্র তুমিই একজন, যার উপর নির্ভর করতে পারি।’

ঐতিহাসিকদের সন্দেহ আছে নেপোলিয়ান জোসেফাইনের উপরেও আস্থা রাখতে পেরেছিলেন কি না।

ভিয়েনার বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ অ্যালফ্রেড অ্যাডলার ‘হোয়াট লাইফ সুড মীন টু ইউ’ নামে একটা বই লিখেছিলেন। বইটাতে তিনি লিখেছেন : যে বিশেষ লোক অন্যদের সম্পর্কে আগ্রহী হতে চায় না সে দুনিয়ায় জীবন কাটাতে সবচেয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয় আর অন্যকেও আঘাত দেয়। এই ধরণের মানুষ থেকেই সব রকম মানবিক ব্যর্থতা জন্ম নেয়।

মনস্তত্বের উপর আপনারা প্রচুর ভালো ভালো বক্তব্য পাঠ করতে পারেন কিন্তু এর চেয়ে চমৎকার কোন বক্তব্য খুঁজে পাবেন না। এক কথা বারবার বলতে চাই না তাহলেও অ্যাডলারের বক্তব্য এতই চমৎকার সারগর্ভ যে আবার বলার লোভ সামলাতে পারছি না :

‘যে বিশেষ লোক অন্যদের সম্পর্কে আগ্রহী হতে চায় না সে দুনিয়ায় জীবন কাটাতে সবচেয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয় আর অন্যকেও আঘাত দেয়।‘

আমি একবার নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোট গল্প লেখার ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম। এই ক্লাস চলার সময় ‘কোলিয়ার্স’ পত্রিকার সম্পাদক আমাদের কিছু বলেছিলেন। তিনি বলেন তার টেবিলে রোজ জমা পড়া ডজন ডজন ছোট গল্পের মধ্যে থেকে একটা মাত্র তুলে নিয়ে কিছু অংশ পড়লেই তিনি বুঝতে পারেন লেখক মানুষকে ভালবাসেন কিনা। তিনি বলেন : লেখক যদি মানুষকে ভালো না বাসেন তাহলে মানুষও তার গল্প ভালো

বাসবে না। ওই অভিজ্ঞ সম্পাদক ছোট গল্প নিয়ে কথা বলার সময় দুবার থেমে মার্জনা চেয়ে বলেন, তিনি একটা উপদেশ দিতে চান। তাঁর কথায় সেটা হলো এই রকম : ‘আমি আপনাদের যা বলছি আপনাদের কেউ কেউ হয়তো তাই বলবেন। কিন্তু মনে রাখবেন আপনারা যদি সফল গল্প লেখক হতে চান তাহলে মানুষ সম্পর্কে আপনাদের আগ্রহ থাকতেই হবে।‘

কল্পিত কাহিনী লেখার ক্ষেত্রে এটা যদি সত্য হয় তাহলে মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে এটা তিন গুণ বেশি সত্যি।

আমি একবার হাওয়ার্ড থানের সঙ্গে তাঁর সাজঘরে একটা সন্ধ্যা কাটিয়েছিলাম, ব্রডওয়েতে তিনি যেবার শেষবারের মত প্রদর্শনীতে অংশ নেন। থান ছিলেন সে কালের বিখ্যাত একজন যাদুকর। তিনি একেবারে যাদুর কিংবদন্তী ছিলেন। চল্লিশ বছর ধরে বারবার তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে মানুষকে তাঁর অলৌকিক যাদুর খেলা দেখিয়ে মুগ্ধ বিস্মিত করে তোলেন–মানুষ প্রায় বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকতো। ষাট লক্ষেরও বেশি মানুষ তাঁর যাদু প্রদর্শন দেখার জন্য টিকিট কেটে প্রেক্ষাগৃহে ঢোকে আর তিনি প্রায় বিশ লক্ষ ডলার লাভ করেন।

আমি থানের কাছে তার সাফল্যের গোপন রহস্য কি জানতে চেয়েছিলাম। অবশ্য স্কুলে তাঁর লেখাপড়ার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই–যেহেতু ছোট বেলায় তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিলেন। নানা জীবিকাই তিনি তারপর নেন–প্রথমে হন মজুর। গাড়ির মধ্যে খড়ের গাদায় ঘুমিয়েও ছিলেন। দরজায় দরজায় ভিক্ষেও করেছিলেন বেঁচে থাকার জন্য। তাছাড়া রাস্তার সাইনবোর্ড আর বিজ্ঞাপন পড়েই তাঁর পড়াশোনায় হাতে খড়ি।

.

যাদুবিদ্যা সম্পর্কে কি তাঁর দারুণ কোন জ্ঞান ছিলো? না। তিনি নিজেই আমায় বলেছিলেন, যাদুর খেলা বা ভোজবাজী সম্বন্ধে ঢের ঢের বই আছে আর তিনি যা জানেন বহু লোকও তাই জানে। কিন্তু তার এমন দুটো জিনিস ছিল যা অন্য কারও ছিল না। প্রথমত পাদপ্রদীপের সামনে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করার ক্ষমতা ছিল। তিনি ছিলেন এক দক্ষ প্রদর্শক। মনুষ্যচরিত্র তাঁর ভালোই জানা ছিল। তিনি যাই করতেন, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী, কণ্ঠস্বরের বিকৃতি, সামান্য ভ্রূ তোলা–সব কিছুই খুব সতর্কতার সঙ্গে তিনি আগে থেকে অভ্যাস করে রাখতেন। তাঁর সমস্ত কাজই প্রায় সেকেণ্ডের মধ্যে করতেন তিনি, একেবারে চোখের পলকে। কিন্তু এটাই তাঁর সাফল্যের মূল আদৌ ছিল না। থান মানুষ সম্পর্কে প্রকৃতই আগ্রহী ছিলেন। তিনি আমায় বলেন যে বহু যাদুকরই দর্শকদের লক্ষ্য করে নিজেদের বলতে চায় : 'হুম, আমার সামনে এক দল গবেট বসে রয়েছে ওদের ঠিক বোকা বানাবো।' কিন্তু থার্স্টনের কৌশল ছিল ঠিক একেবারে আলাদা। তিনি আমায় বলেন–মঞ্চে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজেকে বলতেন, 'আমি কৃতজ্ঞ যে এতো সব মানুষ আমার খেলা দেখতে এসেছেন। এঁরাই আমার জীবনটা ভালোভাবে কাটাতে সম্ভব করে তুলেছেন। আর সেই কারণেই আমি ওঁদের আমার সব সেরা যাদুবিদ্যাই যথা সম্ভব দেখাতে চেষ্টা করব।' তিনি এটাও বলেছিলেন, পাদপ্রদীপের তলায় তিনি কখনই নিজেকে একথা না বলে দাঁড়াতেন না : আমি আমার দর্শকদের ভালোবাসি, আমি আমার দর্শকদের ভালোবাসি। হাস্যকর বলে ভাবছেন? আপনার যেমন ইচ্ছে অবশ্য ভাবতে পারেন। আমি শুধু কথাগুলো আপনাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই শোনাচ্ছি–যে কথাগুলো আমি শুনেছি বিশ্বের একজন সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ যাদুকরের কাছ থেকে।

মাদার শূয়্যান-হিঙ্কও ঠিক এই কথাই আমাকে বলেন। খিদে এবং ভগ্ন হৃদয়ের জ্বালা আর শোকাবহ জীবন কাটানোর ব্যর্থতার সন্তানসহ একবার আত্মঘাতী হতে গিয়েছিলেন তিনি–অথচ এমন ঘটনা সত্ত্বেও তিনি সঙ্গীত জগতের সিঁড়িতে পা রেখে ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছিলেন একেবারে তার চূড়ায়। শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে উঠেছিলেন লক্ষ লক্ষ শ্রোতার সবার প্রিয় একজন গায়িকা। আর তিনিও স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি হল, তিনি মানুষ সম্পর্কে দারুণ আগ্রহী ছিলেন।

ঠিক এই রকমই ছিল থিয়োডোর রুজভেল্টের আশ্চর্যজনক জনপ্রিয়তার রহস্যের গোড়ার কথা। এমন কি তাঁর পরিচালকরাও তাকে ভালোবাসতো। তাঁর নিগ্রো পরিচালক জেমস ই. অ্যামোর্স তার সম্পর্কে 'থিয়োডোর রুজভেল্ট হিরো টু হিজ ভ্যালে' নামে একখানা বই লিখেছিল। ওই বইটার অ্যামোর্স একটা ঘটনার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন :

'একবার আমার স্ত্রী প্রেসিডেন্টকে পাখি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিল। সে কোনদিন কোয়েল পাখি দেখেনি, তাই প্রেসিডেন্ট তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেন। বেশ কিছুদিন পরে আমাদের কটেজের টেলিফোন বেজে উঠলো (অ্যামোর্স আর তার স্ত্রী অয়েস্টার বে'র রুজভেল্ট এস্টেটে বাস করতো। আমার স্ত্রী টেলিফোনে সাড়া দিতেই স্বয়ং মিঃ রুজভেল্টের গলা শুনতে পেলো। প্রেসিডেন্ট জানালেন তিনি ফোন করেছেন এটাই জানাবার জন্য যে তার জানালার সামনে একটা কোয়েল পাখি বসে আছে তিনি ইচ্ছে করলেই দেখতে পাবেন। এই রকম ছোটখাটো ব্যাপারে আগ্রহ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব ছিল। যখনই তিনি আমাদের কটেজের পাশ দিয়ে যেতেন, আমরা তখন

কাছাকাছি না থাকলেও তিনি ডাক ছাড়তেন, অ্যানি ...জেমস্!' যাওয়ার মুখে এটা ছিল তার বন্ধুত্বের ডাক।

এমন একজন মানুষকে কর্মচারীরা না ভালোবেসে থাকে কেমন করে? তাছাড়া তাকে ভালো না বাসার কোন কারণ ছিল না। রুজভেল্ট একবার হোয়াইট হাউসে আসেন। ঠিক সেই সময় প্রেসিডেন্ট ট্যাফট আর মিসেস ট্যাফট বাইরে ছিলেন। তিনি হোয়াইট হাউসের সমস্ত পরিচারকদেরই নাম ধরে ডাকলেন, এমন কি রান্নাঘরের পরিচারকাকেও। সাধারণ নিচের তলার মানুষদেরও যে তিনি কতটা ভালবাসতেন সেটা বোঝা যায় এটা থেকেই। এ বিষয়ে আর্চিবাট লিখেছেন : 'তিনি রান্নাঘরের পরিচারিকা অ্যালিসকে দেখতে পেয়ে বললেন সে এখনও ভুট্টার রুটি বানায় কি না। অ্যালিস জানালো সে মাঝে মাঝে বানায় বটে চাকর-বাকরদের জন্য, তবে উপরতলার কেউ তা খায় না।'

রুজভেল্ট উজ্জ্বল হয়ে বললেন : তাদের রুচিটাই বাজে। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা হলে বলব।

অ্যালিস প্লেটে করে তার জন্যে একটা রুটি নিয়ে এলে সেটা চিবোতে চিবোতে তিনি অফিসের দিকে চললেন। যাওয়ার সময় সমস্ত মালী আর মজুরদের শুভেচ্ছাও জানাতে চাইলেন ...।

'তিনি অতীতে যেভাবে সবাইকে ডাকতেন সেই ভাবেই তাদের ডাকলেন। তারা নিজেরা তখনও তাঁর কথা ফিসফিস করে আলোচনা করে। আইক হুভার সজল চোখে একবার

বলেছিল : দু বছরে এটাই ছিল আমাদের জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় দিন, আমাদের কেউই একশ ডলারের বদলেও এটা হাতচাড়া করতে চাইতাম না।'

.

অন্যান্য মানুষের সমস্যা সম্পর্কে এত গভীর ভাবনাই ডঃ চার্লস্ এলিয়টকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সফল প্রেসিডেন্ট হবার মর্যাদা দিতে পেরেছে–আপনাদের হয়তো মনে আছে তিনিই গৃহযুদ্ধের শেষ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়া অবধি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে চলেছিলেন।

তার কাজের ধারার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একদিন কলেজে প্রথম ভর্তি হওয়া নতুন ছাত্র এল, আর. জি. ক্র্যাণ্ডন প্রেসিডেন্টের অফিসে গিয়ে ছাত্রদের ঋণ ভাণ্ডার থেকে পঞ্চাশ ডলার ধার নিতে যায়। ঋণ মঞ্জুর হল। তার নিজের ভাষাতেই এবার সব শুনুন। এরপর আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে আসতে চাইছিলাম তখন প্রেসিডেন্ট এলিয়ট বললেন, দয়া করে একটু বোসো। তারপর দারুণ অবাক হলাম তিনি যেই বললেন : 'আমি শুনলাম, তুমি নিজের ঘরে তোমার রান্না করে খাও। আমার মনে হয় কাজটা খুবই ভালো, তোমার পক্ষে, বিশেষ করে ভালো আর যথেষ্ট খাবার যদি পাও। আমি যখন কলেজে পড়তাম তাই করতাম। তুমি কখনও মাংসের রুটি বানিয়েছ? জিনিসটা বানাতে পারলে খুবই ভালো, একটুও নষ্ট হয় না। আমি কিভাবে বানাতাম এবার শোন। তিনি এরপর আমায় বুঝিয়ে দিলেন কি করে মাংস কেটে ধীরে ধীরে রান্না করতে হয় যাতে সবটা শুকিয়ে না গিয়ে বেশ শুকনো হয়, তারপর রুটির মধ্যে নিয়ে ঠাণ্ডা করে খেতে হয়।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি তাদের প্রতি আগ্রহী হলে আমিরিকার সবচেয়ে নামী লোকদের নজর, সময় আর সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব হয়। একটা উদাহরণ রাখছি।

বেশ ক'বছর আগে আমি ব্রুকলীন ইনস্টিটিউট অব আর্টস্ অ্যাণ্ড সায়েন্সে গল্প লেখার পাঠক্রম পরিচালনা করেছিলাম। সেখানে আমরা ক্যাথলিন নরিন, ক্যালী হার্স, রিউপার্ট, হিউনেন ইত্যাদি নামী আর ব্যস্ত লেখকদের ব্রুকলীনে এনে তাদের অভিজ্ঞতার বিষয় জানাতে অনুরোধ করি। অতএব আমরা তাদের চিঠি লিখে বললাম আমরা লেখার প্রশংসা করি আর তাদের পরামর্শ পেতে আমরা খুবই আগ্রহী, আমরা আরও জানতে চাই তাদের সাফল্যের রহস্যই বা কি?

প্রতিটা চিঠিতে সই করেছিলো অন্ততঃ দেড়শ জন ছাত্রছাত্রী। আমরা লিখেছিলাম যে আমরা জানি তাঁরা অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ কোন বক্তৃতা তৈরি করা তাঁদের পক্ষে বেশ কঠিন। আর তাই আমরা সঙ্গে পাঠালাম কিছু প্রশ্ন। যেগুলোর উত্তর পেলে আমরা তাঁদের কাজের ধারা বুঝতে পারবো। তাঁদের এটা পছন্দ হলো। কার বা এমন চিঠি পছন্দ হয় না? অতএব তাঁরা তাঁদের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে ব্রুকলীনে এসে আমাদের সাহায্য করতে চাইলেন।

ঠিক একই রকম পদ্ধতিতে আমি জেসলি এম. শ. থিয়োডোর রুজভেল্টের অর্থ সেক্রেটারীকে, স্ট্যাফটের কেবিনেটের অ্যাটর্নী জেনারেল জর্জ ডব্লিউ উইকার্সহ্যামকে,

ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টাকে, আরও বহু বিখ্যাত মানুষকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে ছাত্রদের জনতার কাছে বক্তৃতার বিষয়ে বলাতে সক্ষম হই।

আমাদের সকলেই কসাই, রুটিওয়ালা বা সিংহাসনে বসা রাজা নাই হই, আমাদের যারা প্রশংসা করেন তাঁদের পছন্দ করি। জার্মানীর কাইজারের কথাটাই উদাহরণ হিসেবে ধরুন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে তিনিই বোধ হয় হড়ে পড়েন পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণিত আর বিতর্কিত একজন ব্যক্তি। এমন কি তার নিজের দেশবাসীও তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায় আর তিনিও নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে হল্যান্ডে পালিয়ে যান। তাঁর বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণা এমন জায়গায় পৌঁছায় যে তাঁকে হাতে পেলে লোকে বোধ হয় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতো বা আগুনে গালিয়ে ফেলতো। এই রকম ক্রোধের আর ঘৃণার মধ্যে একটি ছোট্ট ছেলে কাইজারকে একখানা চিঠি লিখে তাতে তার আন্তরিকতা আর প্রশংসা জানিয়েছিল। ছোট ছেলেটি লিখেছিল অন্যরা যা বলে বলুক সে সব সময়েই উইলহেলমকে তাঁর সম্রাট হিসেবে ভালোবেসে যাবে। কাইজার চিঠিটা পেয়ে একেবারে আন্তরিকভাবে গলে যান আর ছেলেটিকে নিমন্ত্রণ করে পাঠান, সে যেন এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। ছেলেটি এসেছিল আর সঙ্গে তার মা-ও এসেছিল–আর কাইজার পরে তাকে বিয়ে করেন। ছোট ছেলেটিকে ‘বন্ধুলাভ ও প্রভাব বিস্তার’ গোছের কোন বই পড়তে হয়নি। ব্যাপারটা সে অন্তর থেকেই উপলব্ধি করেছিল।

আমরা যদি বন্ধুত্ব করতে চাই, তাহলে অন্যদের কাজ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে–যে কাজ করতে হলে চাই সময়, মানসিকতা, নিঃস্বার্থতা আর চিন্তাধারা। ডিউক অব উইণ্ডসর যখন প্রিন্স অব ওয়েলস ছিলেন তখন দক্ষিণ আমেরিকা সফরে যাওয়ার আগে

তিনি স্প্যানিশ ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন যাতে সে দেশে গিয়ে তাদের ভাষাতেই কথা বলতে পারেন। দক্ষিণ আমেরিকার মানুষ এজন্য তাকে খুবই ভালবাসত।

.

অনেক বছর যাবৎ আমি এটা ঠিক করেছি আমার বন্ধু বান্ধবদের জন্মদিনের তারিখটা মনে রাখতে হবে। কিভাবে? যদিও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার কণামাত্রও বিশ্বাস নেই তাহলেও আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি কারও জন্মদিনের তারিখের সঙ্গে সেই মানুষের চরিত্র আর ভাবভঙ্গীর কোন সম্পর্ক আছে কি না? তারপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, তার জন্মমাস আর তারিখ কি? সে যদি বলে ২৪ নভেম্বর, তাহলে আমি বার বার আউড়ে চলি–২৪ নভেম্বর, ২৪ নভেম্বর! তারপর সে পিছনে ফিরলেই একটা কাগজে তার নাম আর জন্মতারিখটা লিখে ফেলি। পরে সেটা জন্মদিনের একটা ডায়েরীতে লিখে রাখি। প্রত্যেক বছরের গোড়ায় ঐ সব জন্ম তারিখ আমার ক্যালেণ্ডারে পর পর লিখে রাখি; ফলে সবই আমার সহজেই। মনে থাকে। ঠিক তারিখটা হলেই তার কাছে আমার চিঠি বা টেলিগ্রাম পৌঁছে যায়। এর প্রতিক্রিয়া দারুণ হয়! কারণ পৃথিবীতে আমিই একমাত্র মানুষ যে তার জন্মদিনের ব্যাপারটা আমার মনে আছে।

আমরা যদি বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চাই তাহলে মানুষকে অত্যন্ত সজীব ভঙ্গীতে আর উৎসাহ দিয়ে অভ্যর্থনা করি আসুন। কেউ টেলিফোন করলেই এমনভাবে 'হ্যাল্লো' বলুন যেন মনে হয় তার গলা পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন আপনি। দি নিউইয়র্ক টেলিফোন কোম্পানী তাদের অপারেটরদের শেখানোর জন্য নানা ব্যবস্থা করে থাকে। যাতে তারা কেউ ফোন করলেই এমনভাবে আপনার নম্বরটা বলুন যেন মনে হয় 'সুপ্রভাত, আপনার

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

সেবা করতে পেরে আনন্দিত’ এটাই বোঝায়। কাল টেলিফোন করার সময় কথাটা মনে রাখবেন।

কাজে কর্মে এই দার্শনিক তত্বটা কি কাজ দেবে? এর বেশ কিছু উদাহরণ আমি দিতে পারি তবে সময়ের অভাবে মাত্র দুটো দিচ্ছি।

নিউইয়র্ক শহরের একটা বড় ব্যাঙ্কের চার্লস এবং ওয়াল্টার্সের উপর দায়িত্ব পড়ে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা গোপন রিপোর্ট তৈরি করার। তিনি জানতেন মাত্র একজন লোকই তাঁর যে সব বিষয় জরুরী দরকার তা জানে। মি. ওয়াল্টার্স তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন–ভদ্রলোক বিরাট এক প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট। মি. ওয়াল্টার্সকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলে এক তরুণী দরজার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে প্রেসিডেন্টকে জানালো তার জন্য ওইদিন কোন ডাকটিকেট নেই।

আমার বার বছরের ছেলের জন্য ডাকটিকেট জোগাড় করছি, প্রেসিডেন্ট ওফাল্টার্সকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।

মিঃ ওয়াল্টার্স এবার তাঁর কাজের কথায় এলে প্রশ্ন করা শুরু করলেন। প্রেসিডেন্ট কিন্তু বেশ ছাড়া ছাড়া ভাব দেখাতে চাইছিলেন, তিনি দুচারটে কথাই শুধু বললেন। কথা বলার উৎসাহ তাঁর ছিল না, কোনভাবেই তাঁকে দিয়ে বলানোও গেল না। সাক্ষাৎকার পর্ব ওখানেই শেষ হলো।

‘খোলাখুলি বলছি,’ মিঃ ওয়াল্টার্স ক্লাসে কাহিনী বলতে গিয়ে জানালেন, কি করা দরকার বুঝতে পারিনি। তারপরেই আমার মনে পড়ে গেল তার সেক্রেটারি কি বলেছিল–

ডাকটিকেট, বার বছরের ছেলে ... তখনই আমার মনে পড়ে গেল আমাদের বিদেশ দপ্তর ডাকটিকিট জমায়–সাত সমুদ্র পার হয়ে আসা বিভিন্ন মহাদেশের যত ডাকটিকেট।

‘পরদিন বিকেলে আমি আবার ভদ্রলোকের কাছে হাজির হলাম আর খবর পাঠালাম যে তার ছেলের জন্য কিছু ডাকটিকিট এনেছি। আমাকে খাতির করে ভিতরে ডাকা হয়েছিল কি? হ্যাঁ স্যার তাই হয়েছিল। তিনি আমার সঙ্গে এতো জোরে করমর্দন করেন যেন কংগ্রেসের জন্য নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন। আনন্দে উচ্ছল হয়ে পেটে পড়লেন ভদ্রলোক। আমার জর্জের এগুলো খুবই পছন্দ হবে’, ডাকটিকিটগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি বললেন এটা একবার দেখুন। সত্যিই দারুণ তাই না?

‘এরপর আমরা প্রায় আধঘন্টা ডাকটিকিট নিয়ে আলোচনা করে আর তাঁর ছেলের ছবি দেখে কাটালাম। তারপর তিনি একঘন্টা ধরে আমি যে খবর চাইছিলাম তাই দিতে লাগলেন। সব খবরই তাঁর কাছ থেকে এসে গেলো। আমাকে কোন রকম চেষ্টাই করতে হল না। তার যা যা জানা ছিল সবই তিনি জানালেন আমায়। তারপর তার অধীনস্থ কর্মচারিদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক খবর দিলেন। নিজের সহকর্মীদের টেলিফোনেও করলেন। বলতে গেলে খবরের আর রিপোর্টের একটা বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দিলেন। খবরের কাগজের লোক হিসেবে আমি একেবারে বাজিমাত করেছিলাম বলা যায়।’

আর একটা উদাহরন নিন :

ফিলাডেলফিয়ার সি. এম. ন্যাফল, জুনিয়ার প্রায় তিন বছর ধরে একটা মস্ত চেইনষ্টোরকে কয়লা বিক্রি করার চেষ্টা চালান। কিন্তু ওই চেইন-স্টোর কোম্পানী শহরের বাইরের এক সরবরাহকারীর কাছ থেকেই কয়লা কিনে তা আবার মিঃ ন্যাফলের অফিসের দরজার সামনে দিয়েই নিয়ে আসত। এরপর একদিন মিঃ ন্যাফলে আমার ক্লাসে এসে ওই চেইন-স্টোরের বিরুদ্ধে তাঁর গায়ের জ্বালা মিটিয়ে গাল দিলেন আর বললেন এরা হচ্ছে দেশের শত্রু ছাড়া কিছু না।

তিনি খালি অবাক হয়ে ভাবতে চাইতেন তিনি ওদের কেন কয়লা বিক্রি করতে পারলেন না।

আমি তাকে পরামর্শ দিলেন অন্য কৌশল কাজে লাগাতে। ছোট্ট করে বললে, যা ঘটেছিল সেটা এই রকম। আমরা এই বিতর্কসভার আয়োজন করলাম–বিতর্কের বিষয় ঠিক হলো : ‘চেইনস্টোর দেশের ভালো করার বদলে ক্ষতিই করে চলেছে।

.

ন্যাফলে আমার পরামর্শে অন্য দিকই নিলেন, তিনি চেইন স্টোরের হয়েই বক্তব্য রাখতে রাজি হলেন। তারপর সোজা হাজির হলেন যাদের মনে প্রাণে ঘৃণা করেন সেই চেনইস্টোরের একজন কর্মকর্তার কাছে। তাকে তিনি বললেন : আমি এখানে কয়লা বিক্রি করতে আসিনি আমি শুধু আপনার কাছে একটা সাহায্যের জন্য এসেছি। তিনি এরপর ওই বিতর্ক প্রতিযোগিতা কথাটা জানিয়ে বললেন; আমি আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি এই কারণেই যে, আমি জানি যে খবর চাই সেটা আপনারা ছাড়া কেউই

দিতে পারবে না। প্রতিযোগিতাটা আমি যেমন ভাবেই হোক জিততে চাই, তাই যে সাহায্য দেবেন আপনি, তাতে কৃতজ্ঞ থাকবো।

এরপরের ঘটনা মি. ন্যাফলের নিজের কথাতে শুনুন :

‘আমি ভদ্রলোকের কাছে ঠিক এক মিনিট সময় দিতে অনুরোধ জানাই। এই শর্তেই তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাতে রাজি হন। আমার প্রয়োজনের ব্যাপারটা তাঁকে জানানোর পর আমাকে একটা চেয়ারে বসতে বলে তিনি আমার জন্য খরচ করেছিলেন ঠিক একঘন্টা সাতচল্লিশ মিনিট সময়। এরপর তিনি আর একজন কর্মকর্তাকে ডাকলেন, তিনি চেইনস্টোর নিয়ে একখানা বই লিখেছিলেন। তিনি যাবতীয় চেইনস্টোর সংস্থার কাছে চিঠি লিখে ওই বিষয়ে বিতর্ক সম্পর্কে একখানা বই আমাকে বানিয়ে দেন। তাঁর মত হল এই চেইন-স্টোর মানব সমাজের সেবা করে চলেছে। তিনি খুবই গর্বিত, সমাজের নানা স্তরের জন্য যা করে চলেছেন। কথা বলার ফাঁকে তাঁর মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। আমি স্বীকার করছি তিনি নানা অজানা বিষয়ে আমার দৃষ্টি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন–এসব আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তিনি আমার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পাল্টে দেন।

আমি যখন চলে আসছিলাম, তিনি আমার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এলেন,তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে বিতর্কে আমার সৌভাগ্য কামনা করলেন। পরে একসময় আবার দেখা করে বিতর্কে কি রকম ফল হলো

আমায় জানাতে অনুরোধ করলেন। শেষ যে কথা তিনি আমায় বললেন তা হলো : বসন্ত কালের শেষে আর একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনার কাছ থেকে কিছু কয়লা কিনবো।'

আমার কাছে ব্যাপারটা একেবারে অলৌকিক। তিনি আমার কাছ থেকে কোন রকম প্রস্তাব ছাড়াই কয়লা কিনতে চাইছেন। আর তাঁর সমস্যা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে মাত্র দু ঘন্টার মধ্যে আমি অনেকটা অগ্রসর হয়েছি যা আমি আমার কয়লার প্রতি আগ্রহী করতে দশ বছর চেষ্টা করেও করতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

আপনি নতুন কিছু আবিষ্কার করেন নি, মিঃ ন্যাফলে, কারণ বহু বছর আগে যীশুর জন্মেরও একশ বছর আগে বিখ্যাত এক রোমান কবি পাবলিয়ান সাইরাস মন্তব্য করেছিলেন : আমরা অন্যের প্রতি তখনই আগ্রহী হই, অন্যেরা যখন আমাদের প্রতি আগ্রহী হয়।

অতএব আপনি যদি চান লোকে আপনাকে পছন্দ করুক, তাহলে তার সব সেরা নীতি হলো এই রকম :

'অন্যের প্রতি সত্যিকার আগ্রহী হয়ে উঠুন।'

আপনি যদি সত্যিকার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে চান আর মানব সংসর্গ নিয়ে দক্ষতা অর্জন করতেও আগ্রহী হন তাহলে ড. হেনরি লিঙ্কের 'দি রিটার্ন টু রিলিজিয়ান' বইখানা পড়ে দেখতে পারেন। বইয়ের নাম দেখে চমকে যাবেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভালো লাগানোর সহজ পথ

আমি সম্প্রতি নিউইয়র্কে এক নৈশভোজের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। আমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন যিনি ইদানীং প্রচুর অর্থ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেকের মধ্যেই বেশ একটু সুখকর ছাপ ফেলার চেষ্টা করছিলেন। তিনি হীরে জহরত মানিক্যের মালা পরেছিলেন অথচ মুখের কোন পরিচর্যা করেন নি। সে মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল শুধু তিক্ততা আর স্বার্থপরতা! তিনি এটা বোঝেন নি যে প্রতিটি পুরুষ জানেন, কোন মহিলার মুখে যে ভাব থাকে সেটা তার জাঁকজমকপূর্ণ দেহের পোষাকের চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। (একটা কথা বলি, আপনার স্ত্রী যখন কোন ফার কোট কিনতে চাইবেন তখন

এ কথাটা মনে রাখবেন।) . চার্লস্ শোয়াব একবার আমায় বলেন তার হাসির দাম দশ লক্ষ ডলারেরও বেশি। কথাটা তিনি একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। কারণ শোয়বের ব্যক্তিত্ব, তাঁর আকর্ষণ,মানুষকে চট করে ভালো লাগানোর ক্ষমতাগুলোই তার অস্বাভাবিক উন্নতির মূল ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধূর্যের মধ্যে ছিল তাঁর বিজয়ী হাসি।

একবার আমি মরিস শেভালিয়েরের সঙ্গে সারা বিকেলটা কাটাই–আর সত্যি বলতে কি আমি সম্পূর্ণ হতাশ হই। গম্ভীর, অন্ধকার মুখ ভদ্রলোককে যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে আলাদাই লেগেছিল–যতক্ষণ না তিনি হাসলেন। তখনই মনে হলো যেন মেঘের মধ্য দিয়ে একফালি সোনাঝরা রোদের হাসি। তাঁর ঐ হাসি না থাকলে মরিস শেখভালিয়ের

বোধ হয় প্যারীতে তাঁর বাবা বা ভাইদের মতই কাঠের আসবাবপত্র বানানোর কাজেই থেকে যেতেন।

কোন কথার চেয়ে কাজের মধ্য দিয়েই মনের ভাব বেশি প্রকাশ পায় আর কোন হাসির মধ্যে জেগে ওঠে এই কথাটাই আমি আপনাকে পছন্দ করি। আপনাকে দেখে খুব খুশি আর আনন্দিত হলাম।

এই জন্যই কুকুরদের এত দাম। আমাদের দেখে তাদের খুশি সত্যই বাঁধ মানে না। আর স্বাভাবিকভাবেই আমরাও তাই হই।

কিন্তু কৃত্রিম কোন হাসি? না, তাতে কোন লোককে ঠকানো যায় না। আমরা বুঝতে পারি সেটা যান্ত্রিক আর তাই আমরা পছন্দ করি না। আমি যে হাসির কথা বলছি সেটা হলো সত্যিকার হৃদয় থেকে আনা হাসি। যে হাসি আসে অন্তর থেকে, এরকম কোন হাসিই ভুবন জয় করতে পারে।

নিউইয়র্কের বিরাট এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের নিয়োজন অধিকর্তা আমাকে বলেছিলেন যে বিক্রয়কারিণী মেয়ে হিসেবে স্কুলের বেড়া পেরোয়নি এমন কোন মেয়েকেও তিনি চাকরি দিতে প্রস্তুত যদি

তার চমৎকার হাসি থাকে, এর বদলে তিনি দর্শনশাস্ত্রের কোন গম্ভীর পণ্ডিতকে চাইবেন না।

আমেরিকার সবচেয়ে বড় রবার প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান একবার আমায় বলেছিলেন যে, তাঁর মতে কোন লোক তার কাজে আনন্দ না পেলে কখনও সাফল্য লাভ করেন না। এই শিল্পপতি ভদ্রলোক বলেছিলেন প্রাচীন সেই তত্ত্ব কথায় তাঁর বিশ্বাস নেই যে কঠিন পরিশ্রম করলেই সব কাজে অনায়াসে সফল হওয়া যায়। তিনি বলেন : আমি এমন সব মানুষকে জানি যারা সাফল্য লাভ করেন। যেহেতু তাদের কাজে তাঁরা প্রভুত আনন্দ পেতেন। আবার অন্যদের দেখেছি তারা কাজ করতে আরম্ভ করার পর সেটা একঘেঁয়ে হয়ে ওঠায় তারা ব্যর্থ হলেন।

আপনি যদি চান অন্যেরা আপনাকে দেখে আনন্দিত হোক তাহলে অন্যদের দেখে আপনিও আনন্দ প্রকাশ করুন।

আমি হাজার হাজার ব্যবসায়ীকে বলেছি প্রতিদিন এক সপ্তাহ ধরে যার সঙ্গেই দেখা হবে তাঁদের দেখে হাসতে। তারপর আমার ক্লাসে এসে জানাতে ফল কেমন হলো। এতে কি কাজ হয়েছিল? দেখা যাক ... নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের মিঃ উইলিয়াম বি. স্টাইনহার্টের লেখা একখানা চিঠি। তাঁর চিঠি কোন ব্যতিক্রম নয় বরং এরকম আরও শ'য়ে শ'য়েই আছে।

মিঃ স্টাইনহার্ট লিখেছিলেন আমার বিয়ে হয়েছে প্রায় আঠারো বছর, আর ওই সময়ে আমি কদাচিৎ স্ত্রীকে দেখে হেসেছি বা কাজে বেরিয়ে যাওয়ার আগে খুব কথা বার্তা বলেছি। ব্রডওয়েতে আমি ছিলাম সবচেয়ে অসুখী মানুষ।

আপনি যখন বললেন আমার হাসি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথা জানাতে তখন ঠিক করলাম এক সপ্তাহ ধরে সে চেষ্টা করব। তাই পরের দিন সকালে আয়নায় চুল আঁচড়ানোর সময় যখন আমার পেঁচার মত মুখখানা দেখলাম তখনই নিজেকে বলে উঠলাম, 'বিল, তোমার মুখ থেকে ওই অন্ধকারটা দূর করতে হবে। তোমায় এবার হাসতে হবে। আর সেটা এখন থেকেই শুরু করা চাই।' প্রাতরাশের সময় আমি আমার স্ত্রীকে হেসে বললাম : সুপ্রভাত, প্রিয়া।' ঠিকই যেমন ভেবেছিলাম।

'আপনি আমাকে সাবধান করেছিলেন ও অবাক হতে পারে। আসলে, আপনি ওর প্রতিক্রিয়াটা কম করেই বলেছিলেন। সে বেশ ধাঁধায় পড়ে যায় এবং বেশ ধাক্কাও খায়। আমি স্ত্রীকে বললাম ভবিষ্যতে এমন কিছুই সে রোজ আশা করতে পারে। আর তাই দু'মাস ধরে প্রত্যেক সকালে এই রকমই করে। যাই।

'আমার এই পরিবর্তিত মানসিক ভঙ্গী গত এক বছরে যা হয়নি সেই সুখ দুমাসে এনে দিয়েছে।'

'কোন অফিসে যাওয়ার সময় আমি বাড়ির লিফট বয়কে অভিনন্দন জানাই সুপ্রভাত' বলে, সঙ্গে থাকে হাসি। দারোয়ানকে দেখেও তাকে হাসি দিয়ে অভিনন্দন জানাই। সাবওয়ের ক্যাশিয়ারকেও খুচরো নেবার সময় অভিনন্দন জানাই। অফিসের দরজায় দাঁড়ানোর সময়েও যাদের কখনও দেখিনি তাদেরও হাসিতে অভ্যর্থনা জানাই।'

'আচমকা আবিষ্কার করলাম সকলেই আমাকেও হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করছে। যারা আমার কাছে অভিযোগ নিয়ে আসে আমি হাসিমুখেই তাদের কথা শুনি। হাসিমুখেই

তাদের বক্তব্য শুনে ব্যাপারটাও সহজে মিটিয়ে ফেলি। আমি দেখেছি এই হাসিই আমায় প্রত্যেকদিন অনেক বেশি টাকা এনে দিচ্ছে।

আর একজন ব্রোকারের সঙ্গে আমার অফিস চালাই আমি। তার একজন কেরানী ভারি চমৎকার একটি তরুণ, আমার ওই হাসির ফলাফলে এমনই আনন্দ হয়েছিল যে তাকে একদিন আমার নতুন মানবিক জীবন দর্শনের কথা বলে ফেললাম। সে তখন স্বীকার করলো সে যখন এই অফিসে প্রথম আসে তখন আমায় সাঙ্ঘাতিক রকম অসুখী বলে ভাবতো–ইদানিং কালে তার ধারণাটা বদলে গেছে। সে জানিয়েছে আমি হাসলে সত্যিই ভালো লাগে।

'আমার কাজের পদ্ধতিতে সমালোচনা করাও বন্ধ করেছি। দোষারোপের বদলে আমি এখন শুধু প্রশংসাই করতে থাকি। আমি কি চাই সে কথা বলা একদম ত্যাগ করেছি। এখন শুধু আমি চেষ্টা করি অন্য লোকদের দৃষ্টিতে সব কিছু যাচাই করতে। আর এগুলোই বলতে গেলে আমার জীবনে বিপ্লব ঘটিয়েছে। আমি এখন সম্পূর্ণ এক আলাদা মানুষ-একজন অর্থবান, বন্ধুত্বেও সমৃদ্ধ, সুখী মানুষ-এর চেয়ে জীবনে আর কি সুখকর হতে পারে?

ব্যাপারটা মনে রাখবেন–এ চিঠি এমন একজন লেখেন যার কাজ শেয়ার কেনাবেচনা–যে ব্যবসাটা অতি কঠিন, শতকরা ৯৯ জনই যে কাজে ব্যর্থ হন।

আপনার হাসবার মত মনের অবস্থা নেই? তাহলে আপনাকে দুটো কাজ করতে হবে। প্রথমে জোর করে হাসার চেষ্টা করুন। যদি একলা থাকেন তাহলে জোর করে এক

কলি গান গাইবার চেষ্টা করুন বা শিস দিন। ভাবতে চেষ্টা করুন আপনি সুখী, আর তাতেই আপনি সুখী হবেন। হার্ভার্ডের অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস কথাটা এইভাবে বলেছিলেন :

‘কাজকে মনে হয় অনুভূতি অনুসরণ করে থাকে। তবে আসলে কাজ আর অনুভূতি একসঙ্গেই চলে। তাই কাজের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, কারণ এটা মনের এক্তিয়ারে থাকে, আর তাতেই পরোক্ষে অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় যা ইচ্ছার বশবর্তী নয়।’

‘তাই সুখী হওয়ার একমাত্র পথ হলো, যদি সুখ না থাকে, আনন্দিত হয়ে সেইভাবেই কথাবার্তা বলা, যেন আপনি সত্যই সুখী ...।

পৃথিবীতে প্রত্যেকেরই সুখ অনুসন্ধান করে চলেছে–আর সেটা লাভ করার একটাই মাত্র পথ আছে। সেটা হলো আপনার চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা। সুখ কখনই বাইরের অবস্থার উপর নির্ভর করে না। এটা নির্ভরশীল ভিতরের অবস্থার উপর। আপনার কি আছে, আপনি কে, কোথায়ই বা আছেন বা কি করছেন এসবের উপর সুখ নির্ভর করে না। সেটা নির্ভর করে এ সম্বন্ধে আপনি কি ভাবেন তার উপর। একটা উদাহরণ দিচ্ছি–দুজন লোক একসঙ্গে, একই জায়গায় একই কাজ করতে পারে, দুজনেই একই টাকা আর সম্মানও পেতে পারে–তা সত্ত্বেও একজন দুঃখী আর অন্যজন সুখী হতে পারে। কেন? এর কারণ বিভিন্ন রকম মানসিক অবস্থা। চীন দেশে কুলিদের ঘর্মাক্ত কলেবরে প্রচণ্ড রোদে দৈনিক সাত সেন্ট আয় করতে যেমন হাসিমুখে কাজ করতে দেখেছি তেমনই দেখেছি এখানকার পার্ক অ্যাভিনিউতে।

‘কোন কিছুই ভালো বা খারাপ নয়, শেকস্পীয়ার বলেছেন, চিন্তাই এটা তৈরি করে।‘

লিঙ্কন একবার বলেছিলেন : কোন লোক যতখানি সুখী হতে চায় ততটাই সুখী হতে পারে।’ তিনি ঠিকই বলেছিলেন। এর একটা জ্বলন্ত উদাহরণ আমি সম্প্রতি দেখেছি। আমি একদিন নিউইয়র্কের লঙ আইল্যাণ্ড ষ্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম। ঠিক আমার সামনেই ত্রিশ বা চল্লিশ জন প্রতিবন্ধী খঞ্জ লাঠি আর ক্রাচে ভর রেখে সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল। একটি ছেলেকে প্রায় কোলে করেই তুলতে হয়। ওদের হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গী লক্ষ্য করে আমি অবাক হয়ে যাই। ছেলেদের সঙ্গে অভিভাবক হিসেবে যে লোকটি ছিল তাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই সে বললো, হ্যাঁ, ব্যাপারটা হলো কোন ছেলে যখন জানতে পারে সে জন্মের মতই খোঁড়া হয়ে গেছে, তখন প্রথমে সে একটু আঘাত পেলেও সেটা পরে কাটিয়ে ওঠে, তারপর ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে অন্যান্য সাধারণ ছেলের মতই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল ঐ ছেলেদের অভিনন্দন জানাই। ওদের কাছে যে শিক্ষা পেয়েছিলাম তা কোনদিনই ভুলবো না।

মেরী পিকফোর্ড যখন ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চলেছিলেন তখন তার সঙ্গে আমি একটা সন্ধ্যা কাটিয়েছিলাম। দুনিয়ার সবাই তখন বোধ হয় ভেবে নেয় মেরী পিকফোর্ড অত্যন্ত বিরক্ত আর অসুখী। কিন্তু আমি দেখলাম তিনি বেশ শান্ত স্বভাবের বেশ বিজয়িনী কোন মহিলা, এমন কাউকে আমি দেখিনি। তার মুখ থেকে সুখ ফেটে পড়ছিল। তার গোপন রহস্যটা কি? ব্যাপারটা তিনি প্রকাশ করেছেন পঁয়ত্রিশ পাতার একটা ছোট্ট বইতে–পড়ে দেখলে আনন্দ পাবেন। বইটার নাম ‘হোয়াই নট ট্রাই গড?

সেন্টলুইয়ের কার্ডিনালের ফ্রাঙ্কলিন বেটগার হলেন আমেরিকার অতি দক্ষ এক বীমাকারী পুরুষ। বেশ ক'বছর আগে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, যার মুখে সদাই হাসি লেগে থাকে তিনি সব সময়েই স্বাগতম। অতএব কোন লোকের অফিস কামরায় ঢোকার আগে তিনি একটু থেমে মনে মনে ভেবে নেন কি কি জিনিসের জন্য নিজেকে তিনি ধন্যবাদ জানাতে পারেন। তারপর মুখে একজন সৎ মানুষের হাসি ফুটিয়ে তিনি সেই ঘরে প্রবেশ করেন।

এই সামান্য কৌশলেই তিনি বীমা করানোর কাজে এমন সাফল্য অর্জন করেছেন বলেই ভাবেন।

এলবার্ট হাভার্ডের এই সুন্দর উপদেশটার কথা একটু পর্যালোচনা করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন শুধু পর্যালোচনায় কাজ হবে না যতক্ষণ না কাজে লাগাচ্ছেন এটা :

যখনই বাড়ির বাইরে যাবেন, মাথাটা উঁচু রেখে ফুসফুঁসে বেশ হাওয়া ভরে নিন, বেশ কিছুটা সূর্যকিরণ গায়ে মেখে নিন। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই হেসে অভ্যর্থনা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিকভাবে করমর্দন করুন। ভুল বোঝার কথা মোটেও ভাববেন না আর নিজের শত্রুদের কথা ভেবে এক মিনিট সময়ও নষ্ট করবেন না। কি করতে চলেছেন ভেবে মনটাকে দৃঢ় করে তুলুন, আর তারপর কোন কিছু না ভেবেই ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে যান। যে সব দারুণ কাজ করতে মনস্থ করেছেন সেই কথাটাই ভাবতে থাকুন-দেখবেন যে, দিন এগিয়ে চললেই আপনি অবচেতন ভাবেই আপনার ইচ্ছা পূরণ করার দিকে এগিয়ে চলেছেন আর সুযোগও পাচ্ছেন। ঠিক যেমনভাবে প্রবাল, সাগরের ঢেউ থেকে তার দরকারী জিনিসটুকু সংগ্রহ করে নেয়। আপনার মনে

আপনার যে সামর্থ আন্তরিক আর দরকারী ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে চান তাই শুধু ভাবতে থাকুন। দেখবেন ঘন্টায় ঘন্টায় আপনি নিজেকে যেমন কল্পনা করেছেন সেই রকম ব্যক্তিত্ব সম্পন্নই আপনি হয়ে উঠেছেন ...চিন্তাই হলো আসল। সর্বদাই যোগ্য একটা মন তৈরির চেষ্টা করুন–সাহস, সারল্য আর আনন্দময় একটা ভাব। ঠিক ভাবনার পরিণতিতে আসে সৃষ্টির দক্ষতা। সব জিনিসই আসে ইচ্ছা থেকে আর প্রতিটি আন্তরিক প্রার্থনাই সফল হয়। . প্রাচীন চীনারা খুবই জ্ঞানী মানুষ ছিল পৃথিবীর নানা ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ছিল অসীম। তাদের একটা প্রবাদ নিয়ে আমাদের উচিত সেটা আমাদের টুপির নিচে সেঁটে রাখা। সেটা হল এইরকম : 'যে মানুষের মুখে হাসি নেই, তার কোন দোকান খোলা উচিত নয়।'

দোকানের কথা বলতে গেলে ফ্রাঙ্ক আর্ভিন ফ্লেচারের বিজ্ঞাপনটার কথা মনে রাখা দরকার। তিনি দিয়েছেন এই ঘরোয়া দার্শনিক তত্ত্ব :

বড়দিনে হাসির মূল্য—

এতে খরচ নেই, তবে সৃষ্টি করে অনেক কিছু।

এতে যারা গ্রহীতা তাদের প্রচুর লাভ হয়, অথচ যারা দেয় তাদের কোন ক্ষতি হয় না।

এটা ঘটে যায় চোখের নিমেষে কিন্তু তার স্মৃতি থেকে যায় বহুদিন।

কেউ এমন বড় মানুষ নন যার এটি ছাড়াই চলে যায়, আর এমন কেউ দরিদ্রও নেই যার এতে লাভ হয় না।

এতে গৃহে সুখ আসে, ব্যবসায়ে আসে সুনাম, আর হাসি হলো বন্ধুত্বের চিহ্ন।

ক্লান্ত মানুষের কাছে হাসি হল বিশ্রাম, হতাশের কাছে আশার আলো, দুঃখিতের কাছে সূর্যের আলো, আর কষ্ট দূর করার ওষুধ।

তা সত্ত্বেও এটা কেনা যায় না, ভিক্ষা করে আনা যায় না, ধার করতে বা চুরি করতেও পারা যায় –কারণ হাসি যতক্ষণ না কাউকে দেওয়া যায় ততক্ষণ তার কোন জাগতিক মূল্য নেই। : বড়দিনের শেষে মুহূর্তের কেনাকাটার ভিড়ে দোকানের কর্মীরা যদি শ্রান্তিতে আমাদের তা না দিতে পারে আপনারা কি তাদের এই হাসির এক কণা দিয়ে আসতে পারেন না।

কারণ হাসি তাদের বেশি চাই যাদের দেবার মত আর নেই।

অতএব যদি চান লোকে আপনাকে পছন্দ করুক তাহলে দু নম্বর নীতি হল; হাসুন!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এ রকম না করলে ঝামেলায় পড়বেন

১৮৯৮ সালে নিউইয়র্কের রকল্যান্ড কাউন্টিতে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল। একটি শিশু মারা যাওয়ায় ওই দিন পড়শীরা তার শোকযাত্রার ব্যবস্থা করেছিল। জিম ফারলি নামে একজন তার ঘোড়াকে জলপান করাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বরফ পড়ায় রাস্তাটা পিছল হয়ে ছিল আবহাওয়াও বেশ ঠাণ্ডা, ঘোড়াটাকে বেশ। কদিন বাইরে আনা হয়নি। তাই বাইরে আনতেই সে আনন্দে পা ছুঁড়তে আরম্ভ করতেই তার আঘাতে জিম ফারলি মারা গেলেন। অতএব ছোট্ট স্টোনি পয়েন্ট গ্রামে দুটো শবযাত্রার ব্যবস্থা করতে হয়।

জিম ফারলি মৃত্যুর সময় তার বিধবা স্ত্রী আর তিনটে ছেলে এবং কয়েক শ ডলারের বীমা পত্র রেখে যান।

তাঁর বড় ছেলে জিমের বয়স তখন দশ, তাকে কাজ করতে যেতে হলো একটা ইট তৈরির কারখানায়। ওর কাজ ছিল বালি মাখা থেকে আরম্ভ করে, ইট সাজানো এমন কি রোদ্দুরে শুকিয়ে নেওয়াও। জিম ছেলেটি লেখাপড়ার কোন সুযোগই পায়নি তা সত্ত্বেও ওর আইরিশ সুলভ ভদ্র ব্যবহার তাকে মানুষের কাছে প্রিয় পাত্র তুলতো, সবাই ওকে পছন্দ করত। ও তাই রাজনীতিতে যোগ দেয়। বেশ ক'বছর কাটার পর ওর একটা অপার্থিব ক্ষমতা জন্মালো, মানুষের নাম মনে রাখা।

তিনি জীবনে কোনদিন উচ্চ বিদ্যালয়ে চৌকাঠ পার হতে পারেন নি তবু ওঁর ছেচল্লিশ বছর বয়স হওয়ার আগেই চারটে কলেজ তাঁকে ডিগ্রী প্রদান করে সম্মানিত করে, আর তিনি ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির চেয়ারম্যান আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোস্ট মাষ্টার জেনারেল হন।

আমি একবার জিম ফারলির সাক্ষাৎকার নিয়ে তাঁকে তাঁর সাফল্যের গোপন রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি জবাব দেন 'কঠিন পরিশ্রম'। আমি তাকে বলি, 'ঠাট্টা করবেন না, সত্যি কথাটা বলুন না।'

তিনি তখন আমাকে প্রশ্ন করেন তার সাফল্যের কারণ সম্বন্ধে আমার ধারণা কি? আমি জবাব দিই, 'আমার মনে হয় আপনি দু'শ মানুষকে তাদের প্রথম নামে চেনেন।'

তিনি জবাব দেন : না, সব ভুল। আমি পঞ্চাশ হাজার মানুষকে তাদের প্রথম নাম ধরে ডাকতে পারি।'

এ ব্যাপারে সন্দেহ করবেন না; জিম ফারলির ওই ক্ষমতার জন্যেই ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট হোয়াইট হাউসে ঢুকতে পেরেছিলেন।

জিম ফারলি গোড়ায় যখন এক জিপসাম কোম্পানীর হয়ে কাজে ঘুরছিলেন আর স্টোনি পয়েন্টে যখন কেরানীর কাজ করতেন তার কাজই ছিল নাম মনে রাখার কাজ করা।

গোড়ায় ব্যাপারটা বেশ সহজই ছিল। যখনই তার সঙ্গে নতুন কারও দেখা হতো তিনি তাঁর পুরো নাম, বাড়িতে কে কে আছেন, কাজ কর্ম কি করেন, রাজনৈতিক মতবাদ কি

সব জেনে নিতেন। এসব তিনি মনে একেবারে গেঁথে রাখতেন, তারপর লোকটির সঙ্গে যখনই দেখা হোক, তা সে এক বছর পরে হলেও তিনি তাঁর পিঠ চাপড়ে জিজ্ঞাসা করতেন স্ত্রী ছেলে মেয়েরা কেমন আছে। বাগানে ফুলগাছগুলো কেমন ফুল দিচ্ছে ইত্যাদি। এতে যে তাকে সবাই পছন্দ করতো সন্দেহ নেই।

রুজভেল্টের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের প্রচার আরম্ভ হওয়ার ঢের আগে থেকেই জিম ফারলি প্রত্যেক দিন প্রায় শ খানেক চিঠি লিখতে আরম্ভ করেন পশ্চিম আর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যের জনসাধারণের কাছে। তারপর একটা ট্রেনে চড়ে উনিশ দিনের মধ্যে কুড়িটা রাজ্য আর বারো হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছিলেন। মাঝখানে চড়েছেন কখনও বা বগিগাড়ি, রেল, মোটর গাড়ি ইত্যাদি। কোন শহরে নেমে বন্ধুদের সঙ্গে প্রাতরাশ, চা, বা নৈশভোজ সারার ফাঁকে তাদের সঙ্গে মন খুলে কথা বলে যেতেন। তারপর আবার রওয়ানা হতেন তার ভ্রমণে।

পূব দিকে হাজির হয়ে তিনি তাঁর একজন বন্ধুকে চিঠি লিখে যাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এসেছেন তাদের নামের তালিকা চেয়ে পাঠালেন। শেষ তালিকায় দেখা গেল হাজার হাজার নাম। তা সত্ত্বেও ফারলি প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠালেন। এইসব চিঠি তিনি আরম্ভ করতেন 'প্রিয় বিল' বা 'প্রিয় জো' বলে শেষে নাম লিখনেত 'তোমার জিম' বলে।

জীবনের গোড়াতেই জিম ফাররি আবিষ্কার করেন যে সাধারণ মানুষ পৃথিবীর সমস্ত নামের চেয়ে নিজের নামকেই বেশি ভালোবাসে। ওই নাম স্মরণে রেখে সহজে সেটা বলে ডাকলেই বুঝতে হবে তাকে আপনি সবচেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু একবার

সেটা ভুলে গেলে বা ভুল করলে, মনে রাখবেন বিরাট একটা গণ্ডগোলে পড়ে গেলেন আপনি। উদাহরণ হিসেবে জানাই যে একবার প্যারী শহরে আমি একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা করে ওখানকার সব আমেরিকানদের নিমন্ত্রণ করি। চিঠিগুলো টাইপ করেছিল সামান্য ইংরেজী জানা ফারসী টাইপিস্টরা, স্বাভাবিকভাবেই তারা নানা গণ্ডগোল করে ফেলে। একজন, প্যারীর কোন আমেরিকান ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তার নাম ভুল করার জন্য আমায় বেশ বকুনি দিয়েই চিঠি লেখেন।

অ্যান্ড্রু কার্নেগীর বিরাট যে সাফল্য তার কারণ জানেন?

তাকে ইস্পাতের রাজা বলা হতো, তা হলেও ইস্পাত তৈরি ব্যাপারটার তিনি প্রায় কিছুই জানতেন না। তার হয়ে কাজ করতো শয়ে শয়ে কর্মচারী–আর তারা ইস্পাত সম্বন্ধে তার চেয়ে ঢের বেশি জানতো।

কিন্তু তিনি যা জানতেন সেটা হলো মানুষকে কি করে ব্যবহার করতে হয়–আর এতেই তিনি ধনী হয়ে ওঠেন। জীবনের গোড়াতেই কোন প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে আর নেতৃত্বদানে তিনি অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় রাখেন। মাত্র দশ বছর বয়সেই তিনি বুঝতে পারেন মানুষ তাদের নিজের নাম কতটা ভালোবাসে, এই আবিষ্কারটাই তিনি কাজে লাগান সহযোগিতা পেতে। একটা উদহারণ দিই : অল্প বয়সে কার্নেগী যখন স্কটল্যাণ্ডে যান তিনি একটা খরগোশ ধরেন–এটা মা খরগোশ। কিছুদিন পরেই সেটা থেকে একগাদা খরগোশ হয়ে গেলো তার–কিন্তু তাদের কি খাওয়ানো যায় কিছুই তো নেই। তখন তার মাথায় দারুণ একটা মতলব খেলে গেল। আশে পাশের ছেলেদের ডেকে

তিনি বললেন, তারা যদি জঙ্গল থেকে কচি ফল আর ডালপালা আনতে পারে তাহলে বাচ্চা খরগোশের নাম তাদের নামেই রাখা হবে।

মতলবটায় ম্যাজিকের মতই কাজ হল। কার্নেগী ব্যাপারটা কোনদিন ভোলেন নি।

বহু বছর পরে তিনি একই মনস্তত্বের কৌশল কাজে লাগিয়ে ব্যবসায় কোটি কোটি টাকা করেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় তার পেনসিলভেনিয়া রেল রোডের জন্য ইস্পাত বিক্রির চেষ্টা। সে সময় ওই রেলপথের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জে. এডগার টমসন। অতএব অ্যান্ড্রু কার্নেগী একটা বিরাট ইস্পাতের কারখানা গড়লেন পিটসবার্গে। তার নাম দিলেন এডগার টমসন স্টীল ওয়ার্ক।

একটা ধাঁধা দিচ্ছি। দেখুন বলতে পারেন কিনা। পেনসিলভেনিয়া রেল লাইনের জন্য যখন ইস্পাতের দরকার হল জে. এডগার টমসন কোথা থেকে তা কিনেছিলেন জানেন? ... সীয়ার্স বা রোবাডের কাছে থেকে? মোটেই না, আপনার ভুল হচ্ছে। আবার ভাবুন।

.

কার্নেগি আর জর্জ পুলম্যান যখন রেল গাড়ির ঘুমের কামরার ব্যবসাতে লড়াই চালাচ্ছিলেন, ইস্পাতের রাজা তখনও সেই খরগোশের কাহিনী ভোলেন নি।

অ্যান্ড্রু কার্নেগীর সেন্ট্রাল ট্রান্সপোর্টেশান কোম্পানীর সঙ্গে পুলম্যানের কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। তারা দুজনেই বারবার দাম কমিয়ে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছলেন যে লাভের কোন আশা ছিল না। দুজনে নিউইয়র্কে পৌঁছলে তাঁদের হঠাৎ দেখা হলে

সেন্ট নিকোলাস হোটেলে। কার্নেগী তখন বললেন ‘শুভসন্ধ্যা, মিঃ পুলম্যান, আমরা কি দুজন মস্ত বোকার মতই ব্যবহার করছি না?’

‘আপনি কি বলতে চান?’ পুলম্যান জানতে চাইলেন।

এবার কার্নেগী তার মনের কথাটা বললেন–দুটো প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ একীকরণ। বেশ ফলাও করেই তিনি একসঙ্গে কাজ করার সুবিধা আর বিরুদ্ধাচারণের অসুবিধার কথাটা বুঝিয়ে বললেন। বেশ মন দিয়ে শুনে গেলেন পুলম্যান, তবে তিনি পুরোপুরি মেনে নিতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রশ্ন কররেন : ‘কোম্পানীর নাম কি হবে?’ কার্নেগী তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন : ‘কেন, অবশ্যই পুলম্যান প্যালেস কার কোম্পানী।‘

পুলম্যানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ‘আমার ঘরে আসুন’, তিনি আহ্বান জানালেন, ‘কথা বলা যাক।‘ ওই কথাবার্তার পরিণতিতে তৈরী হয়েছিল শিল্প জগতের এক ইতিহাস।

বন্ধু বান্ধব আর ব্যবসার সহযোগিদের নাম মনে রাখা আর তাকে সম্মান জানানোর নীতিই ছিল অ্যান্ড্রু কার্নেগীর নেতৃত্ব দানের রহস্য। তাঁর গর্ব ছিল যে তিনি তাঁর বহু শ্রমিককে তাদের প্রথম নাম ধরে ডাকতে পারতেন। তিনি অহঙ্কার করেই বলতেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যতদিন দায়িত্বে ছিলেন ততদিন তাঁর সুন্দর ইস্পাত কারখানায় কখনও ধর্মঘট হয়নি।

পেডেরুস্কি আবার তার কৃষ্ণকায় পাঁচককে সব সময় ‘মি. কপার’ বলে সম্বোধন করতেন। অন্ততঃ পনেরো বার নানা অনুষ্ঠানে পেডেরুস্কি আমেরিকা ভ্রমণ করে শ্রোতাদের নানাভাবে মনোরঞ্জন করেছেন আর প্রতিবারই তিনি একটা গাড়িতে তাঁর

পাঁচককে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই সে মাঝরাতে পেডেরুস্কির খাবার তৈরি করে দিয়েছে। আমেরিকানদের মত পেডেরুস্কি কখনই তার পাঁচককে 'জর্জ' বলে সম্বোধন করেন নি, প্রত্যেকবার ডেকেছেন 'মিঃ কপার' বলে আর মিঃ কপারও সেটা ভালোবাসতো।

মানুষ তার নিজের নাম নিয়ে এমনই গর্ব বোধ করে যে সেটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার চেষ্টার অন্ত নেই। অমন যে শক্ত ধাচের মানুষ পি.টি. বারনাম, তিনিও হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন যেহেতু তাঁর নাম বহন করার জন্য তাঁর কোন ছেলে ছিল না। নিজের নামকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি তার নাতি মি. এইচ সীলি'কে পঁচিশ হাজার ডলার দেন শুধু তার নামে নাম জড়িয়ে নিজেকে 'বারনাম সীলি' বলে প্রচার করতে।

দু'শ বছর আগে ধনী ব্যক্তিরা তাদের নামে বই উৎসর্গ করার জন্য লেখকদের টাকা দিতেন।

পাঠাগার আর যাদুঘরগুলোয় যে দামী সব সংগ্রহ রয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে হয় মানুষকেই। বিশ্বের বহু পাঠাগারেই অনেকে বই দান করে নাম কিনতে আর তা রক্ষা করতে চেয়েছেন। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী বা মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে এরকম সংগ্রহ আছে। তাছাড়া প্রতিটি গির্জার জানালার কাঁচেও বহু দাতা মানুষের নাম খোদাই করা থাকে।

বহু লোক নাম মনে রাখতে পারছেন না এই সকল কারণেই যে তারা তাদের শোনা নামগুলো কষ্ট করে মনের পর্দায় চিরকালীন করে গেঁথে রাখার চেষ্টা করেন না। ওজর হল তাঁরা বড় ব্যস্ত মানুষ।

কিন্তু যত ব্যস্তই তাঁরা হোন নিশ্চয়ই ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের মত ব্যস্ত নন। রুজভেল্ট বেশ সময় ব্যয় করেই এমন কি কোন মেকানিকের সংস্পর্শে এলে তারও নাম মনে মনে রাখতেন।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ক্রাইসলার প্রতিষ্ঠান একবার মিঃ রুজভেল্টের জন্য বিশেষ ধরনের একখানা গাড়ি তৈরি করে। সে গাড়ি পৌঁছে দিতে ডব্লিউ. এফ. চেম্বারলেনের আর এক মেকানিক হোয়াইট হাউসে আসেন। আমার সামনেই রয়েছে মিঃ চেম্বারলেনের লেখা একখানা চিঠি–তিনি এটায় তাঁর সেদিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন : ‘আমি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে গাড়িটা চালানো সম্বন্ধে সব বুঝিয়ে দিতে থাকি, কিন্তু তিনি আমাকে শিখিয়ে দেন মানুষকে কেমন করে চালাতে হয়।’

‘আমি হোয়াইট হাউসে যেতেই, মি. চেম্বারলেন লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট চমৎকার খুশি হয়ে দেখা করলেন।‘ আমায় তিনি নাম ধরে ডাকলেন, আমায় বেশ সহজ হতে দিলেন। আমার আরও ভালো লাগলো এটাই দেখে যে আমি তাকে যা দেখাচ্ছিলাম সেটা তিনি বেশ আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগলেন। গাড়িটা এমনভাবে বানানো হয়েছিল যে শুধু এক হাত দিয়েই চালানো যায়। গাড়িটা দেখতে বেশ লোকও জমায়েত হয়। তিনি বললেন :

‘ভারি চমৎকার গাড়ি। শুধু বোতাম টিপলেই চালানো যায়। আমার কাছে এটা দারুণ–কি করে এমন হয় জানি না, আমার এখনই চালিয়ে ঘুরে আসতে ইচ্ছে করছে।

রুজভেল্টের বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয় স্বজন গাড়িটার প্রশংসা করতে তিনি বললেন : ‘মি. চেম্বারলেন, এটা তৈরি করার জন্য আপনারা যে সময় আর পরিশ্রম করেছেন আমি তার প্রশংসা করছি। এরপর তিনি গাড়ির সব যন্ত্রপাতি খুঁটিনাটির প্রশংসা করলেন। মিসেস রুজভেল্ট আর নিজের সেক্রেটারি মিস পার্কিনসকেও দেখালেন। তারপর পুরনো কৃষ্ণাঙ্গ চাকর জর্জকে বললেন : ‘জর্জ, তুমি সুটকেসের দায়িত্ব নেবে।’

‘শেষ পর্যন্ত চালানোর কৌশল শেখা হলে তিনি বললেন: ‘মি. চেম্বারলেন, আমি ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডকে ত্রিশ মিনিট বসিয়ে রেখেছি। এবার তাই কাজে যাই, কেমন?’

‘আমি হোয়াইট হাউসে একজন মেকানিককে নিয়ে যাই। রুজভেল্টের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। প্রেসিডেন্ট তাঁর সঙ্গে আগে কথা বলেন নি, শুধু নামটাই শুনেছিলেন। মেকানিক একটু লাজুক মানুষ। বিদায় নেওয়ার সময় প্রেসিডেন্ট মেকানিককে তার নাম ধরে ডেকে করমর্দন করে ওয়াশিংটনে আসার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। এই ধন্যবাদ দেবার মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। সত্যিই তা ছিল আন্তরিকতা মাখা।’

‘নিউইয়র্ক ফেরার পর আমি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সই করা একটা আলোকচিত্র পাই তার সঙ্গে আমার কাজের জন ধন্যবাদও। এসব করার সময় তিনি কোথায় পেলেন এটাই আমার কাছে এক রহস্য।’

ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট জানতেন মানুষের সবচেয়ে ভালো ধারণা তৈরির সরল প্রয়োজনীয় আর গুরুত্বপূর্ণ উপায়টি হলো, মানুষের নাম মনে রাখা আর তাদের নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে দেওয়া–তবুও কজনেই বা সেটা করে?

বেশির ভাগ সময়েই কোন অচেনা মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটলে আমরা কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর যখন বিদায় নিই তার নাম আর মনে রাখি না।

কোন রাজনৈতিক নেতা প্রথমেই যা শেখেন তা হলো : 'কোন ভোটদাতার নাম মনে রাখা বিচক্ষণ নেতার কাজ। সেটা ভুলে যাওয়া মানে নিজে ডুবে যাওয়া।'

আর এই নাম মনে রাখার দক্ষতা রাজনীতির মত ব্যবসা আর সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভাইপো ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন অহঙ্কার করে বলতেন যে, রাজকীয় কাজকর্মের ব্যস্ততা সত্ত্বেও যাদের সঙ্গে দেখা হতো তাদের নাম ভুলতেন না।

এ কাজে তার কৌশল কি রকম? খুবই সরল। নামটা পরিষ্কার না শুনতে পেলে তিনি বলতেন : 'খুব দুঃখিত, নামটা ভালো করে শুনিনি। তারপর নামটা একটু অসাধারণ হলে তিনি বলতেন : নামের বানানটা কি রকম একটু বলবেন?'

কথাবার্তা চলার ফাঁকে তিনি বেশ কয়েকবার উচ্চারণ করতেন, যাতে মনে সেটা গেঁথে রাখা যায়। সঙ্গে মনে রাখতেন লোকটির বাচনভঙ্গী, আকৃতি সব কিছু।

লোকটি নামী কেউ হলে নেপোলিয়ন আরও একটু খাটতেন। রাজামশাই একা হলেও একখণ্ড কাগজে নামটা লিখে ফেলতেন তারপর বার কয়েক চোখ বুলিয়ে মনে গেঁথে নিয়ে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলতেন। এইভাবেই তিনি লোকটির পরিপূর্ণ একটা ছবি এঁকে ফেলতেন।

এসব করতে সময় লাগে, তবে ভালো ব্যবহার করতে গেলে, এমার্সন বলেছেন, ‘ছোটখাটো স্বার্থত্যাগ করতেই হয়।’

অতএব আপনি যদি চান লোকে আপনাকে পছন্দ করুক, তাহলে তিন নম্বর নিয়ম হলো : মনে রাখবেন কোন মানুষের কাছে তার নিজের নামই হলো সব ভাষাতেই সব চেয়ে মিষ্টি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভালো বক্তা হওয়া যায় কী করে

সম্প্রতি আমি এক ব্রিজ খেলায় আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি ব্রীজ খেলি না, সেখানে স্বর্ণকেশী একটি মেয়েও ছিল যে ব্রিজ খেলে না। সে জানতো লাওয়েল টমাস রেডিওয় যোগ দেবার আগে আমি তার ম্যানেজার ছিলাম। সে আরও জানতো আমি তার সঙ্গে ইউরোপ ভালোভাবে ঘুরেছি আর তার বক্তৃতাও বানিয়ে দিয়েছি। মেয়েটি তাই বললো : ‘ওহ, মিঃ কার্নেগী, আপনার দেখা সব জায়গা আর সুন্দর দৃশ্যগুলোর কথা আমাকে বলুন।’

‘আমরা সোফায় বসার পর সে জানালো স্বামীর সঙ্গে ও ইদানীং আফ্রিকা ভ্রমণ করে এসেছে। ‘আফ্রিকা!’ আমি প্রশংসা করে বলে উঠলাম। কী চমৎকার! আমি নিজেও আফ্রিকায় বেড়াতে চেয়েছি, কিন্তু একবার কেবল আলজিয়ার্সে চব্বিশ ঘন্টা থাকা ছাড়া আর যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। তোমরা

সেখানে বড় শিকারের এলাকায় গিয়েছো নাকি? গেছো! বাঃ! দারুণ! কি সৌভাগ্য। তোমাকে দেখে হিংসে হচ্ছে আমার। তোমার আফ্রিকার গল্প শোনাও।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট মেয়েটি ওর কাহিনী শুনিয়ে গেল। সে আর একবারও জানতে চাইলো না আমি কোথায় গিয়েছি বা দেখেছি। সে আমার বেড়ানোর গল্প আর শুনতে চায়নি। সে

যা চাইছিলো তা হলো একজন আগ্রহী শ্রোতা। যাতে সে কোথায় গিয়েছিল শুনিয়ে আত্মগর্বে ফুলে উঠতে পারে।

মেয়েটি কি অস্বাভাবিক কিছু? মোটেই না। অনেকেই এই রকম।

যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি, সম্প্রতি আমি নিউইয়র্কের প্রকাশক কে. ডব্লিউ গ্রীণবর্ণের দেওয়া এক ডিনার পার্টিতে একজন বিখ্যাত বোটানিস্টের সঙ্গে সাক্ষাত করি। কোন বোটানিস্টের সঙ্গে আগে আমার আলাপ হয়নি। তাই তাকে আমার দারুণ মনে হলো। আমি চেয়ারের প্রায় হাতলে কোন রকমে বসেই তার কথা গিলছিলাম। তিনি নানা রকম বিষয়ে তাঁর কথা শোনালেন। গাঁজা, সাধারণ আলু, ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি আশ্চর্য সব কথা শোনালেন। আমার নিজের একটা ছোট্ট বাগান আছে–তিনি আমায় সে সম্বন্ধে নানা সমস্যা মেটানোর উপদেশ দিলেন।

যা বলছি, আমরা ডিনার পার্টিতে ছিলাম। সেখানে আরও বহু নিমন্ত্রিত নিশ্চয়ই ছিলেন। কিন্তু আমি চিরাচরিত ভদ্রতা ত্যাগ করে ওই উদ্ভিদতত্ত্ববিদের সঙ্গে কথা বলে কাটাই।

মাঝরাত এসে গেল। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ এবার আমার নিমন্ত্রণকারীকে আমার সম্পর্কে প্রশংসাচ্ছলে অনেক কথা বললেন। আমি নাকি দারুণ উদ্দীপনায় 'ভরপুর', আমি 'এই', 'তাই' ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন কথাবার্তায় আমি চমৎকার।

আমি কথাবার্তায় চমৎকার? আমি? সে কি। ভদ্রলোকের সঙ্গে বোধ হয় দুএকটার বেশি কথাই বলিনি-বলার কিছু বোধ হয় ছিলও না কারণ উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কোনই

জ্ঞান নেই। তবে আমি একটা কাজই করেছি–তাহলো গভীর মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনেছি। তার কারণ আমার আগ্রহ বাঁধ মানে নি। তিনি তা অনুভব করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাতে খুশি হন। এ ধরনের শোনার ব্যাপারই হলো সম্মান জানাবার সেরা পথ! জ্যাক উডফোর্ড তার 'স্ট্রেঞ্জার্স ইন লাভ' বইতে লিখেছেন খুব কম লোকই গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে। আমি আরও কিছুটা বেশিই করি–আমি কথার মাঝখানে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলাম।

আমি তাঁকে বলেছিলাম তার কথায় আমার দারুণ উপকার হলো–আর সত্যিই তাই। আমি এও তাকে বলি, তাঁর মতো জ্ঞান থাকলে ভালো হতো। এ কথাও বলেছিলাম তার সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরতে পারলে মজা হতো। তার সঙ্গে আবার দেখা করতেও চেয়েছিলাম।

এই কারণেই তিনি আমার কথাবার্তায় দক্ষ বলেন–আসলে আমি একজন ভালো শ্রোতা, আর তাকে কথা বলায় উৎসাহিত করেছি মাত্র।

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সফল সাক্ষাতের কাজের রহস্যটা কি? এ বিষয়ে চার্লস্ এলিয়ট বলেছেন, 'সকল ব্যবসায়িক সাক্ষাতের ব্যাপারে কোন রহস্য নেই .... যিনি কথা বলছেন তার কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনাই গুরুত্বপূর্ণ। এর চেয়ে স্তাবকতা আর হয় না।'

.

এ তো জানা কথা, তাই না? হার্ভার্ডে চার বছর পড়ে সেটা জানতে হয় না। অথচ আমরা জানি যে আপনারা জানেন ব্যবসায়ীরা প্রচুর খরচ করে বড় জায়গা নেন, পয়সা খরচ

করে তাদের দোকান সাজানোর ব্যবস্থা করেন। তারপর যে সব কেরাণী নিয়োগ করেন তারা কিন্তু ভালো শ্রোতা না হওয়ায় ক্রেতাদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়। তারা ক্রেতাদের বিরক্তি উৎপাদন করার ফলে দোকান থেকে তাদের প্রায় পালাতে হয়।

জে. সি. উটনের কথাটাই ধরুন। তিনি আমার ক্লাসে এটা বলেন। একবার কোন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে তিনি একটা সুট কেনেন। সেটা খারাপ হয়ে যায়-রঙ উঠে গিয়ে সেটা কালারটাকে নষ্ট করে দেয়।

সুটটা নিয়ে গিয়ে তিনি বিক্রেতা লোকটিকে দেখান। লোকটি কোন কথাই শোনে না বরং নিজের কথাই বলতে চায়। তিনি অভিযোগ জানাবার আগেই সে বলতে থাকে, আমরা এরকম সুট হাজার হাজার বিক্রি করেছি, আর এরকম অভিযোগ এই প্রথম পেলাম।

লোকটার ব্যবহার জঘন্য হয়ে উঠলো। অপমানজনক ভঙ্গিতে সে বলল, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। আমাদের উপর জোর করে এসব চাপাবার চেষ্টা করছেন। আমাদের ঠকাতে চান আপনি।

কথাবার্তার ফাঁকে আরও একজন এসে যোগ দিল তার সঙ্গে। সে বলল, ‘এতে কিছু করার নেই। এরকম দামে এর থেকে ভালো সুট পাওয়া যায় না।’

ইতিমধ্যে আমারও মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। উটন কাহিনীটি বলতে গিয়ে বলেছিলেন, প্রথমতঃ বিক্রেতা আমার সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে, দ্বিতীয় জন মন্তব্য করে আমি সস্তায় মাল কিনেছি। আমি রাগে ফেটে পড়তে চাইছিলাম। আমি যখন বলতে চাইছিলাম ওরা ওদের সুট নিয়ে চুলোয় যাক, ঠিক তখনই দোকানের মালিক এসে পড়লেন।

নিজের ব্যবসা তিনি ভালোই জানতেন। তিনি আমায় একদম বদলে দিলেন। একজন ক্রুদ্ধ ক্রেতাকে তিনি সন্তুষ্ট মানুষে বদলে দিলেন। তিনি এটা কিভাবে করলেন জানেন? তিনটি উপায়ে :

প্রথমতঃ, তিনি কোন কথা না বলে আমার কথা গোড়া থেকে শুনে গেলেন।

দ্বিতীয়তঃ, আমার কথা শেষ হতেই বিক্রেতারা যখন আবার কথা বলার চেষ্টা করতে চাইছিল তিনি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করলেন। তিনি শুধু যে ওদের দেখালেন আমার কালারটা সত্যিই নষ্ট হয়ে গেছে তাই নয়, বরং বললেন সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করা যায় না এমন কিছু যেন দোকান থেকে বিক্রি করা না হয়।

তৃতীয়তঃ, তিনি স্বীকার করলেন গোলমালের ব্যাপারটা তার জানান ছিল না। তারপর তিনি সরলভাবেই বললেন, এই সুট সম্পর্কে কি করতে বলছেন বলুন। যা বলবেন তাই করবো।

ক'মিনিট আগেই তাদের চুলোর সুট নিয়ে গোল্লায় যেতে বলব ভাবছিলাম, কিন্তু এখন বললাম, 'আমি আপনার পরামর্শ চাইছি। আমি জানতে চাই এ অবস্থাটা সাময়িক কিনা এবং কিছু করা সম্ভব কিনা।'

তিনি পরামর্শ দিলেন সুটটা আরও এক সপ্তাহ ব্যবহার করতে। তাতে যদি দোষ দূর না হয় তাহলে সেটা নিয়ে আসতে, তিনি সেটা বদলে দেবেন। আপনার সুসবিধের জন্য সত্যিই দুঃখিত।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আমি খুশি মনেই দোকান ছেড়ে এলাম। সপ্তাহের শেষে সুটটা ঠিকই হয়ে গেল। আর ওই দোকান সম্পর্কে আমার বিশ্বাসও বেড়ে গেল।

এত আশ্চর্যের কিছু নেই যে ভদ্রলোক দোকানের কর্তা–আর ওই দুজন বিক্রেতা সারা জীবন কেরাণীই থেকে যাবে। না, তাদের সম্ভবতঃ প্যাক করার দপ্তরে পাঠানো হবে যাতে তারা কোন ক্রেতার সংস্পর্শে না আসে।

সমস্ত সময়েই আঘাতবিলাসী বা সমালোচকও প্রায়ই মনোযোগী শ্রোতা পেলে বেশ নরম হয়ে প্রায়ই মনোযোগ এই কাতার বিষ বাইরে পড়েন–এমন শ্রোতা যে চুপচাপ শুনে যাওয়ার মুহূর্তে গোখরো সাপের মত মানুষেও তার বিষ বাইরে ঢেলে ফেলে। নিউইয়র্ক টেলিফোন কোম্পানীর একটা উদাহরণ দিই। তারা একজন গ্রাহককে নিয়ে সাংঘাতিক বিব্রত হয়। ভদ্রলোক গালমন্দ দিয়ে রাগের বশে টেলিফোনের তার আর খুঁটি উপড়ে ফেলতে চান। তিনি কিছু কল' এর চার্জ মিথ্যা বলে দিতেও অস্বীকার করেন। খবরের কাগজেও তিনি লেখালেখি করেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনেও তিনি অজস্র অভিযোগ করেন আর টেলিফোন কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলাও করেন।

শেষ পর্যন্ত কোম্পানি তাদের অত্যন্ত দক্ষ একজন কুশলী লোককে মারাত্মক ওই গ্রাহককে ঠাণ্ডা করতে পাঠান। এই লোকটি ওই খিটখিটে গ্রাহকের সব কথা মন দিয়ে শোনেন। লোকটি ঠাণ্ডা মাথায় সব গালাগাল শুনে গেলেন আর মাঝে মাঝে গ্রাহক যে ঠিক বলছেন তাই জানালেন।

ভদ্রলোক তিন ঘন্টা ধরে গালাগাল দিয়েছিলেন আর আমিও তা শুনে যাই, আমার ক্লাসে টেলিফোনের সেই লোকটি জানিয়ে ছিলেন। এরপরেও তিনি গ্রাহকের কাছে আবার যান-বারবার চার বার। চার বারের পর লোকটি একটা টেলিফোন গ্রাহক স্বার্থরক্ষা সমিতির সদস্যও হন। তিনি এখনও তার সদস্য আছেন–অবশ্য আরও একজন সদস্য আছেন তিনি সেই মিঃ।

আমি ভদ্রলোকের কথা ধৈর্য ধরেই শুনেছিলাম বলে লোকটি জানিয়েছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে আমি একমত হই। ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত প্রায় বন্ধু হয়ে ওঠেন। প্রথমবার তাঁর অভিযোগের কথা উঠল না, দ্বিতীয় বারেও না। চতুর্থবারে মামলাটাই বদলে গেল–তিনি বিলের সব টাকাই মিটিয়ে দিলেন। আর এই প্রথম টেলিফোন কোম্পানির ইতিহাসে তিনি মামলা প্রত্যাহার করে নেন।

সন্দেহ নেই মি.নিজেকে একজন গ্রাহকের স্বার্থরক্ষাকারী নিঃসঙ্গ যোদ্ধা বলেই ভাবতে চাইছিলেন। বাস্তবে কিন্তু তিনি চাইছিলেন কিছুটা গুরুত্ব। প্রথমে গালাগাল দিয়ে সেটা পান তিনি, তারপর কোম্পানির এক প্রতিনিধি এলে তার কাল্পনিক অভিযোগ বাতাসে মিলিয়ে যায়। এমন তিনি আশাই করেন নি।

একদিন সকালে বেশ ক'বছর আগে ডেটমার উলেন কোম্পানির জুলিয়ান এফ. ডেটমারের অফিসে ঝড়ের বেগে ঢুকলেন এক ক্রুদ্ধ ক্রেতা।

লোকটির কাছে আমাদের প্রতিষ্ঠান পনেরো ডলার পেত, মি. ডেটমার পরে আমায় বলেছিলেন। ক্রেতা সেটা অস্বীকার করলো, তবে আমরা জানতাম ওরই ভুল হচ্ছে। তাই

আমরা তার কাছে সেটা দাবি করি। ভদ্রলোক রাগে একেবারে শিকাগোয় এসে হাজির হলেন–শুধু আমাকে জানাতে যে টাকা তিনি কখনই দেবেন না, আর আমার দোকান থেকে এক ডলারেরও জিনিস কিনবেন না।

আমি বেশ ধৈর্য নিয়েই ভদ্রলোকের সব কথা শুনে গেলাম। বাধা দেবার কিছু ইচ্ছে যে হয়নি তাও নয়–তবে তাতে খারাপ হবে ভেবেই চেপে গেলাম। তাকে তাই কথা বলে যেতে দিলাম। তারপর সে একটু কথা শোনার মত অবস্থায় এলে বেশ শান্ত স্বরে আমি বললাম : 'আপনি যে শিকাগোয় এসে আমাকে এ কথাটা বলেছেন তার জন্য ধন্যবাদ। আমার খুব উপকার করেছেন আপনি। কারণ আমার প্রতিষ্ঠান আপনার বিরক্তি উৎপাদন করে থাকলে আরও অনেকেরই হয়তো করবে। সেটা খুব খারাপ হতো। আপনার বলার চেয়েও আমার শোনার আগ্রহ বেশি বিশ্বাস করুন।

এরকম কিছু তিনি একেবারেই আশা করেন নি। আমার ধারণা তিনি একটু হতাশই হলেন, কারণ শিকাগোয় এসে দু চার কথা তিনি শোনাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার বদলে পেলেন ধন্যবাদ। আমি তাকে বললাম, 'ওই পনেরো ডলার আমরা বাতিল করে দেবো কারণ তিনি খুবই সাবধানী মানুষ। তাকে মাত্র একটাই হিসাব রাখতে হয় তাই ভুল হবার সম্ভাবনা কম–যেখানে আমাদের রাখতে হয় হাজার হাজার।'

আমি তাকে আরও বললাম, 'তাঁর মনের ভাব কি রকম হয়েছে, তার জায়গায় থাকলে আমারও তাই হতো। যেহেতু তিনি আমাদের কাছ থেকে আর কিছু কিনবেন না, আমি বললাম অন্য কয়েকটা উলের দোকানের নাম আমি বলতে পারি।'

আগে উনি শিকাগো এলে আমরা একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারতাম, আজও তাই তাকে আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি গররাজী হলেন। এরপর আবার অফিসে ফিরে এলে তিনি বেশ বড় বায়না দিলেন। বাড়ি ফেরার সময় তাঁর মন বেশ প্রফুল্ল হয়ে রইলো। আমার ভদ্রতার বদলে তিনিও ভদ্র হতে চাইছিলেন। বাড়ি ফিরে কাগজপত্রের মধ্যে তিনি সেই পনেরো ডলারের বিলটা খুঁজে পেয়ে আমাদের কাছে মার্জনা চেয়ে টাকাটা পাঠিয়েও দিলেন।

পরে তাঁর স্ত্রীর একটি ছেলে হলে তার নাম রাখলেন 'ডেটমার। এরপর থেকে তিনি আজীবন আমার বন্ধু ছিলেন আর এরও বাইশ বছর পর তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন।

বেশ কয়েক বছর আগে এক গরীব ডাচ্ ছেলে স্কুলের পর একটা রুটির দোকানের কাঁচ সাফাই করতো, তার জুটতো মাত্র সপ্তাহে পনেরো সেন্ট। ওরা এমনই গরীব ছিল যে প্রতিদিন কয়লার গাড়ি চলে যাওয়ার পর একটা ঝুড়ি নিয়ে, রাস্তা থেকে কয়লার টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিত। ছেলেটি অর্থাৎ যার নাম এডওয়ার্ড বব জীবনে ছ'বছরের বেশি স্কুলে যায়নি, অথচ সেই আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে সফল সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক হতে পেরেছিল। কিভাবে তার পক্ষে এটা সম্ভব হয়? সেটা বেশ বিরাট গল্প– কিন্তু তার শুরু করার ব্যাপারটা অল্প কথায় বলা যেতে পারে। যে নীতি তিনি নিয়েছিলেন সেটাই এই পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে।

.

মাত্র তের বছর বয়সে তাঁকে স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করতে হয়। তিনি একটা অফিসে প্রতি সপ্তাহে দু'ডলার পঁচিশ সেন্ট মাইনের অফিস-বয়ের কাজ শুরু করেন। কিন্তু তাতে তার পড়াশোনার আগ্রহ চলে যায়নি। বরং তিনি নিজেই পড়াশোনার ব্যবস্থা করলেন। গাড়ী ভাড়া আর মধ্যাহ্নভোজের খরচ বাঁচিয়ে তিনি আমেরিকান মনীষীদের একসেট জীবনী বা এনসাইক্লোপেডিয়া কিনে নিলেন। তার পরেই তিনি অদ্ভুত একটা কাজ করলেন–বিখ্যাত সব মানুষের জীবনী পড়ে তাদের কাছে চিঠি লিখে জীবনের আর ছোটবেলার আজানা কথা জানতে চাইলেন। তিনি বিখ্যাতদের তাদের সম্বন্ধে কথা বলায় উৎসাহিত করলেন। তিনি চিঠি লিখলেন জেনারেল জেমস এ গারফিল্ডকে, যিনি প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি গারফিল্ডের কাছে জানতে চান এটা সত্য কিনা যে ছেলেবেলায় তিনি কোন খালের নৌকোর গুণ টানতেন কিনা। গারফিল্ড উত্তরও দেন। একটা বিশেষ যুদ্ধের কথা জানতে চেয়ে তিনি জেনারেল গ্র্যান্টকে চিঠি লেখেন। গ্র্যান্ট তাঁকে একটা মানচিত্র এঁকে পাঠিয়ে ওই চৌদ্দ বছরের ছেলেটিকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান আর সারা সন্ধ্যা কথা বলেন কাটান।

তিনি এমার্সনকেও চিঠি লিখে কথা বলায় উদ্বুদ্ধ করেন। এই সামান্য পশ্চিমী ছেলেটি এক এক করে আমেরিকার এই সব বিখ্যাত মানুষকে চিঠি লেখেন–এমার্সন, ফিলিপ্স ব্রুকস, অলিভার, ওয়েণ্ডেল হোমস, লঙফেলো, মিসেস আব্রাহাম লিঙ্কন, লুইসা মেরি অ্যালকট, জেনারেল শেরম্যান আর জেভারসন ডেভিস। তিনি শুধু যে এইসব নামী মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগই করেন তাই নয়, বরং তাকে প্রায়ই দেখা যেত তিনি ওইসব নামী মানুষদের বাড়ীতে ছুটি কাটাতে ব্যস্ত। তাদের অভিজ্ঞতা ওঁকে নানা ভাবেই উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই সব নামী স্ত্রী পুরুষ তার জীবনকে প্রায় বৈপ্লবিক অবস্থায় এনে দেয়। মনে রাখবেন এই সব নীতি প্রয়োগের কথাই এই পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করছি।

পৃথিবীর সবচেয়ে খ্যাতিমান সাক্ষাৎকারী মানুষটির নাম হলো আইজ্যাক মার্কোসন। তাঁর বক্তব্য হলো বহু মানুষ অপ্রীতিকর হন কারণ তাঁরা মন দিয়ে কথা শুনতে চান না। মার্কোসন বলেছেন : তাঁরা নিজেদের কথাতেই এমন ব্যস্ত থাকেন যে চোখ কান খোলা রাখতে ভুলে যান ... খ্যাতিমান মানুষেরা আমাকে বলেছেন যে ভালো কথা বলা লোকের চেয়ে তারা ভালো শ্রোতাই পছন্দ করেন। অথচ ভালো শ্রোতার সংখ্যা অন্যসব ভালো কাজের মানুষের মতই কম।'

শুধু যে নামী মানুষরাই কেবল ভালো শ্রোতা খোঁজেন তাই নয়, সাধারণ মানুষই তাই। রীডার্স ডাইজেস্টে একবার লেখা হয় : বহুলোক ডাক্তার ডাকেন শুধু কথা শোনাবার জন্যই।

গৃহযুদ্ধের অন্ধকার দিনগুলোয় লিঙ্কন একবার ইলিনয়ের স্প্রিংফিল্ডে তাঁর এক পুরনো বন্ধুকে চিঠি লিখে ওয়াশিংটনে আসতে বলেন। লিঙ্কন লিখেছিলেন কোন একটা সমস্যা নিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চান। পুরনো সেই বন্ধু হোয়াইট হাউসে এসে পৌঁছলে লিঙ্কন তার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ক্রীতদাসদের মুক্তিদানের ব্যাপারে কথা বলে গেলেন। সেটা ছিল একটা ঘোষণাপত্র জারি করা। লিঙ্কন-এর পক্ষে আর বিপক্ষে বলা সব রকম বক্তব্য আর খবরের কাগজের বক্তব্যও উল্লেখ করলেন। ক্রীতদাসদের মুক্তিদান করার ব্যাপারে কেউ তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিল আবার কেউ কেউ নিন্দা করতেও ছাড়েনি। কথা শেষ হওয়ার পর লিঙ্কন বন্ধুর করমর্দন করে ইলিনয়ে ফেরত পাঠালেন, আর আশ্চর্য ব্যাপারে একবারও তার মতামত চাইলেন না। সারাক্ষণ লিঙ্কন একাই কথা বলে গেলেন। এতে তার মন ঠিক হয়ে গেল। বন্ধুটি বলেছিলেন 'কথা শেষ

হওয়ার পর তাঁকে সহজ মনে হচ্ছিল', আসলে লিঙ্কন মোটেই কোন পরামর্শ চাননি–তিনি কেবল চাইছিলেন ধৈর্যশীল বন্ধুর মত কোন শ্রোতা যার কাছে কথা বলে তিনি মনের ভার লাঘব করতে পারেন। ঝামেলায় পড়লে আমরা সবাই তাই চাই-আর বিরক্ত ক্রেতারাও তাই চান। এরকমই চায় অসন্তুষ্ট কর্মচারিরা বা আহত বন্ধুও।

আপনি যদি চান লোকে আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করুক বা আপনার পিছনে টিটকিরি দিক বা নিন্দে করুক তাহলে এই রকম করে দেখতে পারেন : কারও কথা বেশিক্ষণ শুনবেন না। খালি নিজের সম্পর্কে। কথা বলে যান। আপনি যদি বোঝেন অন্যজন কি বলতে যাচ্ছে তাকে শেষ করতে দেবেন না। সে হয়তো আপনার মত চালাক নয়, তাহলে তাকে আজেবাজে বকতে দেবেন কেন? তার কথার মাঝখানে তাই বাধা দিতে চেষ্টা করুন।

এ ধরনের কাউকে চেনেন নাকি? দুর্ভাগ্যবশত আমি চিনি, আর তাদের কারও কারও নাম আবার সামাজিক উচ্চ স্তরেও আছে।

এরা সবাই নেহাত বিরক্তি উদ্রেককারী মানুষ-বিরক্তিসর্বস্ব মানুষ, যারা খালি নিজেদের অহংভাব নিয়ে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ মনে করে স্ফীত হয়ে থাকে।

যে লোক কেবল নিজের কথা বলে সে শুধু নিজের কথাই ভাবে। ড. নিকোলাস মারে বাটলার, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট বলেন, "যে লোক কেবল নিজের কথাই ভাবে সে নেহাতই অশিক্ষিত। যত শিক্ষাই তার থাক না কেন সে শিক্ষিত হতে পারে না।

অতএব আপনি যদি ভালো কথক হতে চান তাহলে ভালো শ্রোতা হওয়ার চেষ্টা করুন। মিসেস চার্লস্ নর্দান কী বলেন : ‘নিজেকে ভালো লাগাতে গেলে অন্যের প্রতি আগ্রহ দেখান।’ এমন প্রশ্ন করুন অন্যে যার উত্তর দিতে চাইবে। তাকে তার নিজের কাজ সম্বন্ধে বলতে উৎসাহিত করুন।

মনে রাখবেন যার সঙ্গে কথা বলছেন সে নিজের সম্পর্কে একশ ভাগ আগ্রহী, তার নিজের চাহিদা আর সমস্যাকে যে আপনার চেয়ে ঢের বেশি মূল্য দেয়। চীন দেশে দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার মানুষ মরলেও তার চেয়ে নিজের দাঁতের ব্যথায় সে বেশি নজর দেয়। আফ্রিকার চল্লিশটা ভূমিকম্পের চেয়ে সে তার ঘাড়ের ফোড়া নিয়ে বেশি চিন্তিত হবে। অতএব এবার কথাবার্তা বলার আগে এটা স্মরণ রাখবেন।

অতএব অন্যেরা আপনাকে পছন্দ করুক তাই যদি চান তাহলে ৪ নম্বর নিয়ম হল : ভালো শ্রোতা হয়ে উঠুন। অন্যদের নিজেদের কথা বলায় উৎসাহ দিন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অন্যদের কীভাবে উৎসাহী করা যায়

যারা অয়েস্টার বে'তে থিয়োডোর রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন তাঁরা তাঁর জ্ঞানের পরিধি আর বিশালতা দেখে আশ্চর্য হয়েছেন। গ্যামালিয়েল ব্রাডফোর্ড লিখেছেন যে দর্শনার্থী কোনো কাউবয় বা রাজনীতিক বা কূটনীতিক যাই হোক রুজভেল্ট জানতেন তার সঙ্গে কি কথা বলা দরকার। এটা তিনি কি করে করতেন? উত্তরটা খুবই সরল। রুজভেল্ট যখন জানতেন কেউ সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে আসবে, তিনি সারারাত ধরে সেই লোকটির পছন্দসই বিষয়ে কতটা জানা যায় জানতে চেষ্টা করতেন।

কারণ রুজভেল্ট জানতেন, যেমন নেতারাও জানেন যে, মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করার একমাত্র উপায় হলো তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় নিয়ে কথা বলা।

সহৃদয় উইলিয়াম লায়ন ফেলপস, ইয়েলের তত্ত্বালীন সাহিত্যের অধ্যাপক অল্প বয়সেই এ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

'আমি যখন আট বছরে পড়ি তখন একবার আমার ফুপুর বাড়িতে এক সপ্তাহ কাটাচ্ছিলাম, অধ্যাপক ফেলপস তাঁর 'হিউম্যান নেচার' বইতে লিখেছেন, একজন মধ্য বয়স্ক লোক এক সন্ধ্যায় এলেন। তারপর পিসীর সঙ্গে কথাবার্তার পর আমার সঙ্গে আলাপ হলো। তখন আমার নৌকো সম্বন্ধে খুবই আগ্রহ ছিল। ভদ্রলোক তাই নিয়ে আমার সঙ্গে এতো কথা বললেন যে আমার খুব ভালো লাগলো। উনি চলে গেলে আমি

উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লাম-কী চমৎকার মানুষ! নৌকো সম্বন্ধে ওঁর কত আগ্রহ। পিসী বললেন, ‘উনি নিউইয়র্কের একজন আইনবিদ আর নৌকো নিয়ে তার ছিটে ফোঁটাও মাথা ব্যথা নেই। তাহলে এ নিয়ে এত কথা তিনি বললেন কেন?’

পিসী বললেন, কারণ তিনি একজন ভদ্রলোক। তিনি দেখেছিলেন তুমি নৌকো সম্পর্কে আগ্রহী, তিনি বুঝেছিলেন নৌকো নিয়ে কথা বললে তুমি আনন্দ পাবে। তিনি নিজেকে তোমার কাছে প্রিয় করে তুলেছিলেন।

উইলিয়াম ফেলপস লিখেছিলেন, ‘আমি কখনও পিসীর কথা ভুলিনি।‘

এই পরিচ্ছেদ লেখার সময় আমার সামনে খোলা রয়েছে বয় স্কাউট আন্দোলনের একজন নামী কর্মী এডওয়ার্ড এল চ্যালিফের একখানা চিঠি।

একদিন আমার বিশেষ এক সাহায্যের দরকার হয়। ইউরোপে এক বিরাট বয় স্কাউট জাম্বোরীর ব্যবস্থা হচ্ছিলো। আমি চাইছিলাম আমেরিকার বিরাট এক কোম্পানির প্রেসিডেন্ট যাতে একটি ছেলেকে সেখানে পাঠানোর খরচ দেন।

সৌভাগ্যবশত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে আমি জানতে পেরেছিলাম তিনি দশ লক্ষ ডলারের একটা চেক লিখেছিলেন, সেটার ক্যাশ দেয়া হয়ে গেলে ব্যাঙ্ক চেকটা আবার তাঁকেই ফিরিয়ে দেয় আর তিনি সেটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখেন।

অতএব তাঁর অফিসঘরে ঢুকে প্রথমেই আমি সেই চেকটা দেখতে চাইলাম। দশলক্ষ ডলারের চেক, আমি তাকে বললাম আমার জানা নেই এত টাকার চেক কেউ লিখেছেন।

আমি আমার সব ছেলেদের বলতে চাই, এমন চেক আমি দেখেছি। তিনি খুশি হয়েই আমায় তা দেখালেন। আমি প্রশংসা জানিয়ে কিভাবে ওটা লেখা হয় জানতে চাইলাম।

'নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন। তাই না, মি. চ্যালিফ বয়স্কাউট, বা অন্য কিছু দিয়ে কথা শুরু করেন নি বা তার চাহিদা কি? তিনি অন্যজন যাতে আগ্রহী তাই দিয়েই আরম্ভ করেন। তার কথাটা হয় এই রকম :

'যার সঙ্গে কথা বলছিলাম তিনি বললেন, 'ওহ, আপনি কি জন্য যেন দেখা করতে চান?' আমি তখন আসার উদ্দেশ্য বললাম।

'খুবই আশ্চর্য হলাম।' মি. চ্যালিয়া লিখেছেন, তিনি যে আমি যা চাইলাম তাই দিলেন তা নয়। বরং আমি একটি ছেলেকে ইউরোপ পাঠাতে চেয়েছিলাম। তিনি আরও পাঁচজন এবং আমাকেও পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। তা ছাড়া এক হাজার ডলারের একটা হুন্ডি লিখেও দিলেন আর আমাকে সাত সপ্তাহ ইউরোপে থাকতে বললেন। তিনি ইউরোপে তাঁর শাখায় প্রেসিডেন্টদের পরিচয়পত্রও লিখে দিলেন। আর প্যারীতে আমাদের সঙ্গে দেখা করে শহরটাও ঘুরিয়ে দেখালেন। তার পর তিনি অভাবী কয়েকটি ছেলেকে চাকরিও দেন, আর আমাদের কাজে সক্রিয় অংশ নেন।

তবুও আমি জানি তিনি কিসে উৎসাহী। আগে যদি মেনে না নিতাম তাহলে তাঁর কাছ থেকে এর দশভাগের একভাগও পেতাম কিনা জানি না।

এই মূল্যবান কৌশল কি ব্যবসায় লাগানো হয়? দেখাই যাক! ডুভার্নয় কোম্পানীর হেনরি জি. ডুভার্নয়ের কথাটাই ধরুন। তিনি নিউইয়র্কের বিখ্যাত রুটি কোম্পানীর মালিক।

তিনি নিউইয়র্কের বিখ্যাত কোন হোটেলে তাঁর রুটি বিক্রীর চেষ্টা করছিলেন। চার বছর ধরে তিনি প্রতি সপ্তাহে হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ম্যানেজার যেখানে যান তিনি সেখানেই যেতেন। এমন কি একই হোটেলেও তিনি তাঁর সঙ্গে থেকেছেন, সবই সেই রুটির অর্ডার পাওয়ার জন্য। তবে সবই বৃথা।

'তারপর', মি. ডুভার্নয় বলেছিলেন, 'মানব চরিত্র অনুধাবন করে আমি আমার কৌশল পাল্টানোর ব্যবস্থা করলাম। আমি বের করতে চাইলাম ভদ্রলোকের আগ্রহ কিসে।'

আমি জানতে পারলাম তিনি হোটেল অভ্যর্থনা সমিতির একজন সদস্য। দেখতে পেলাম তিনি শুধু সদস্যই নন, তাঁর দারুণ আগ্রহের জন্য তাঁকেই সভাপতি করা হয়েছে। তাছাড়া তিনিই আন্তর্জাতিক সমিতির প্রেসিডেন্ট। যেখানেই ওই সমিতির সভা হোক, সেটায় হাজির হতে পাহাড়, সমুদ্র বা মরুভূমি পার হতে হলেও তিনি গররাজী নন।

'অতএব তার সঙ্গে পরদিন যখন দেখা করলাম আমি ওই অভ্যর্থনাকারীদের নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। কি আশ্চর্য ব্যাপার যে ঘটল কী বলব! তিনি আমার সঙ্গে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে অভ্যর্থনাকারীদের সম্পর্কে কথা বললেন, তাঁর কণ্ঠস্বর প্রায় আবেগে আপ্লুত হল। পরিস্কার বুঝতে পারলাম এই সমিতি তার শখ আর জীবনের একমাত্র বাসনা। তাঁর অফিস ছেড়ে আসার আগে তিনি আমাকে তার সমিতির সভ্য করে নিলেন।

'ইতিমধ্যে আমি রুটি নিয়ে একটা কথাও বলিনি। তবে কদিন পরে হোটেলের স্টুয়ার্ড রুটির নমুনা নিয়ে দেখা করতে ফোন করলেন।

স্টুয়ার্ড আমায় অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, ‘বুড়োকে আপনি কি করেছেন জানিনা তিনি তো আপনার প্রশংসায় ফেটে পড়ছেন।‘

‘একবার কথাটা ভাবুন। চার বছর ধরে আমি যা পারিনি, উনি কিসে আগ্রহী তা যদি বার করতে না পারতাম।‘

তাই যদি চান লোকে আপনাকে পছন্দ করুক তবে ৫নং নিয়ম হোল :

অন্যের উৎসাহের ব্যাপার নিয়ে কথা বলুন।

নবম পরিচ্ছেদ

চট করে ভালো লাগানোর পথ

নিউইয়র্কের এইটথ অ্যাভিনিউর থারটি-থার্ড স্ট্রিটের এক ডাকঘরে একখানা চিঠি রেজিষ্ট্রি করার জন্য আমি লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম রেজিষ্ট্রির কেরানি ওর কাজে বেশ একঘেঁয়েমী বোধ করে চলেছে–সেই একঘেঁয়ে খাম ওজন করা, ডাকটিকিট দেয়া, খুচরো দেয়ানেয়া করা, রসিদ লেখা-সারা বছর ধরে সেই একঘেঁয়ে যাতা পিষে চলা। আমি তাই নিজেকে বললাম আমি লোকটিকে আমায় পছন্দ করাবো। স্বভাবতই আমাকে পছন্দ করার জন্য আমায় ভালো কিছু বলতে হবে। আমার সম্পর্কে অবশ্য নয়, ওর সম্পর্কেই। অতএব আবার নিজেকে প্রশ্ন করলাম : 'ওর মধ্যে কি আছে যেটার সত্যিকার প্রশংসা করতে পারি?' এরকম প্রশ্নের উত্তর পাওয়া অনেক সময়েই কঠিন। বিশেষ করে : অচেনা মানুষ সম্পর্কে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা সহজেই হবে। আমি ঠিক তখনই এমন কিছু দেখলাম যাতে আমার প্রশংসা বাধ মানল না।

তাই সে যখন আমার খামখানা ওজন করছিল তখন বেশ সাগ্রহে মন্তব্য করলাম : 'আহা, আপনার মতো আমার যদি চুল থাকতো।'

লোকটি হাসিমুখে বেশ একটু চমকেই মুখ তুলল। নাঃ, আগের মতো তো এখন আর নেই–সলজ্জ ভঙ্গীতে সে জানালো। আমি জবাবে বললাম, 'তা হলেও আগেকার জৌলুস হারিয়ে এখনও চমৎকার আছে।' লোকটি অসম্ভব খুশি হলো। সে আমার সঙ্গে বাকি

সময় বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললো। শেষ যে কথাটা সে আমায় বললো তা হলো : ‘বহু লোকেই আমার চুলের প্রশংসা করেছে।’

আমি বাজি রাখতে পারি লোকটি প্রায় হাওয়ায় ভাসতে ভাসতেই সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজ সারতে যায়। আরও বাজি ধরতে পারি সে সেদিন রাতে বাড়ি গিয়ে ওর স্ত্রীকে ব্যাপারটা বলেছে। তারপর নিশ্চয়ই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলে : সত্যিই আমার চুল বড় সুন্দর।

এই গল্পটা একবার আমি অনেকের সামনেই বলেছিলাম, আর একজন আমায় পরে প্রশ্ন করেছিল; আপনি ওর কাছ থেকে কি চাইছিলেন?

আমি ওর কাছে কি চাইছিলাম। ভাবুন একবার!

আমরা এরকম স্বার্থপর হয়ে উঠেছি যে সামান্য খুশির ভাব ছড়িয়ে কাউকে কিছু নিঃস্বার্থ প্রশংসাও করতে পারবো না? সব সময়েই আমাদের একাজে উদ্দেশ্য হবে কারও কাছ থেকে পরিবর্তে কিছু পাওয়ার আকাঙক্ষা? আমাদের মন যদি এই রকম নীচতা আর ক্ষুদ্রতা ভরা হয় তাহলে আমাদের সব কাজে ব্যর্থতাই শুধু প্রাপ্য।

হ্যাঁ, লোকটির কাছ থেকে আমি কিছু আদায় করতে চাইছিলাম। দাম দেওয়া যায় না এমন কিছুই আমি চাইছিলাম, আর তা পেয়েও ছিলাম। আমার এটাই লাভ হয়েছিল যে আমি আমার জন্য কিছু না চেয়েও একটা চমৎকার মানসিক আনন্দ লাভ করি। এরকম মানসিক অনুভূতি উজ্জ্বল আনন্দময় হয়ে মানুষের স্মৃতিতে ঘটনার পরেও জ্বলজ্বল করে।

মানুষের ব্যবহারের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আইন আছে। আমরা সেই আইন মেনে চললে, আমরা বলতে গেলে জীবনে কোনদিনই ঝামেলায় পড়বো না। আসলে এই আইন মেনে চললে তার বদলে পেয়ে যাবো অসংখ্য বন্ধু আর অনাবিল সুখ। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা এ আইন ভঙ্গ করবো তখনই আমরা সীমাহীন ঝামেলায় পড়ে যাব। আইনটা হলো এই রকম : 'সব সময়েই অপর ব্যক্তিটিকে শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে সুযোগ দিন।' আগেই বলেছি প্রফেসর জন ডিউই বলেছেন যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ভাবা মানুষের একটা চিরন্তন আকাঙক্ষা। প্রফেসর উইলিয়া জেমস বলেন : 'মানব চরিত্রের গভীরতম নীতি হলে প্রশংসিত হওয়ার আশা।' আগেই যেমন বলেছি এই আকাঙক্ষাই আমাদের অন্যান্য সব প্রাণীদের সঙ্গে তফাৎ বুঝিয়ে দেয়। এই আকাঙক্ষাই আসলে সভ্যতা সৃষ্টির মূল।

দার্শনিকরা হাজার হাজার বছর ধরেই মানবিক সম্পর্ক নিয়ে নানা চিন্তা ভাবনা করে আসছেন। আর ওই সব চিন্তা ভাবনার মধ্য থেকে যে ফসল মিলেছে তা হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এটা নতুন কিছু নয়–এ ইতিহাসের মতই পুরনো। জরথুষ্ট্র তিন হাজার বছর আগে তাঁর সব অগ্নি-উপাসক অনুগামীকে শিক্ষা দেন। কনফুসিয়াস চীনদেশে এটা শিখিয়েছেন ২৪০০ বছর আগে। লাওৎসে, তাও ধর্মের উদগাতা যিনি, সেটা শিখিয়েছিরেন হান উপত্যকায় তাঁর শিষ্যদের। বুদ্ধদেব এটা শিখিয়েছিলেন খ্রষ্টের জন্মের পাঁচশ বছর আগে পবিত্র গঙ্গার তীরে বসে। হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি তারও হাজার বছর আগে এটা শিখিয়েছিল। যীশু একটা মাত্র বাক্যেই এটা প্রকাশ করেছিলেন আর এটাই হয়তো সারা বিশ্বে সবচেয়ে দামী কোন নীতি : 'অন্যের প্রতি সেই ব্যবহারই কর অন্যের কাছ থেকে যা আশা কর।'

আপনি যাদের সংস্পর্শে আসেন তাদের সমর্থন আশা করেন। আপনি চান, আপনার প্রকৃত মূল্যায়ন। আপনি চান, আপনার ছোট্ট দুনিয়ায় নিজের গুরুত্ব। আপনি কখনই সস্তাদরের ফাঁপা তোষামোদ চান না, বরং চান সত্যিকার প্রশংসা আপনি আশা করেন, আপনার বন্ধুবান্ধবী আর সহকর্মীরা চার্লস্ শোয়াব যেমন বলে গেছেন সেই রকম হবে। তিনি যা বলেছেন : তারা দেবে হৃদয়ের স্বীকৃতি আর কমবে সত্যিকার প্রশংসা। আমরা সবাই তাই চাই।

.

অতএব আসুন আমরা সোনার অক্ষরে লেখা নীতিটাই বরং মেনে চলি। আর অন্যদের সেই জিনিসই দিই যা তাদের কাছ থেকে আমরা আশা করি।

কিন্তু কেমন করে? কখন আর কোথায়? এর উত্তর হলো সব সময়েই আর সব জায়গাতেই।

যেমন উদাহরণ হিসেবে রেডিও সিটির খবর সরবরাহকারী কেরানীর কাছে আমি একবার হেনরি শুভেইন অফিসের নম্বরটা চেয়েছিলাম। পরিচ্ছন্ন আর চমৎকার পোশাক পরিহিত লোকটি যেভাবে জবাব দিল তাতে মনে হলো সে খবরটা জানিয়ে বেশ গর্ব বোধ করছিল। বেশ পরিষ্কারভাবে সে জানাল : ‘হেনরি শুভেইন। (বিরতি) উনিশতল, ঘরের নম্বর ১৮১৬।

আমি এলিভেটরের দিকে ছুটে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম, তারপর আবার ফিরে এসে বললাম, ‘আপনি যেভাবে সব জানালেন তার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই।

আপনি বেশ সুন্দর, পরিষ্কার করে উত্তর দিয়েছেন। আপনি ঠিক কোন শিল্পীর মতই কাজ করেছেন। ভারি চমৎকার।'

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে কেরানীটি জানালো কেন কথার ফাঁকে ফাঁকে সে একটু বিরতি দিয়েছে। কেরানীটি আমার প্রশংসায় সত্যিই খুব গর্বিত বোধ করতে শুরু করেছিল। উনিশতলায় যাওয়ার অবসরে আমার এই ভেবেই বেশ আনন্দ হল যে, অন্ততঃ ওইদিন বিকেলে একজনের মনে মানুষের আকাঙ্ক্ষিত সুখের পরশ জাগাতে পেরেছি।

প্রশংসা করার দর্শন সম্বন্ধে আলোক লাভ করার জন্য আপনাকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত বা কোনো চেয়ারম্যান হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। আপনি প্রতিদিনই এই ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে পারে না।

যেমন ধরুন, আপনি খাবারের আদেশ দিলেন পরিবেশনকারিণীকে। সে ভুল কিছু আনলে যদি বলেন, তোমায় কষ্ট দিচ্ছি বলে দুঃখিত, আমি আসলে চেয়েছি অন্য জিনিস। সে এটা ভয়ে নিশ্চিয়ই বলবে, না, না, কষ্ট কি। আসলে সে আনন্দের সঙ্গে কাজটা সংশোধন করে নেবে যেহেতু আপনি তাকে সম্মান দিয়েছেন।

'আমি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি বলে দুঃখিত', 'দয়া করে কি'—'ধন্যবাদ, যদি-' এই ধরনের ছোটখাটো কথাতে প্রতিদিনের একঘেঁয়েমি জড়ানো জীবন অনেকটা সহ্য করার অবস্থায় এনে তাকে মোলায়েম করে তোলে। তাছাড়াও এই রকম সম্মান দেখানো কথাতেই ফুটে ওঠে বংশ মর্যাদা আর প্রকৃতি শিক্ষার ভাব। আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আপনি কি 'হল কেইনের লেখা উপন্যাস কখনও পড়ে দেখেছেন? যেমন ধরুন, 'দি ক্রিশ্চিয়ান',

‘দি ডিমষ্টার’, ‘দি ম্যাক্সিমাম’? একলক্ষ মানুষ তার উপন্যাস পাঠ করেছেন। তিনি ছিলেন একজন কর্মকারের সন্তান। সারা জীবনে তিনি আট বছরের বেশি স্কুলে শিক্ষা নিতে পারেন নি, তাসত্ত্বেও তিনি যখন মারা গেলেন তখন তিনি ছিলেন পৃথিবীতে যত অর্থবান সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে প্রথম সারির।

তার কাহিনীটা হলো এই রকম : হল কেইন সনেট আর বীরগাথা ভালো বাসতেন। আর তাই তিনি দান্তে, গ্যাব্রিয়েল, রসেটির সব কবিতা একেবারে গোগ্রাসেই গিলে ফেলেন। এ ছাড়াও তিনি রসেটির শিল্পমণ্ডিত রচনার অকুণ্ঠ প্রশংসা করে একটা বক্তৃতা বানিয়ে ফেলেন–আর স্বয়ং রসেটিকেই একটা কপি পাঠিয়ে দেন। রসেটি সেটা পেয়ে দারুণ খুশি হন। রসেটি হয়তো স্বগতোক্তি করেছিলেন : ‘যে তরুণ আমার রচনা সম্পর্কে এ রকম উঁচু ধারণা পোষণ করে সে নিঃসন্দেহে দারুণ কিছু। তাই রসেটি ওই কামারের ছেলেকে লণ্ডনে এসে তার সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করার আমন্ত্রণ জানালেন। এটাই হল কেইনের জীবনের মোড় ঘোরার প্রথম অংশ। এই ভাবেই তিনি সে কালের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের সংস্পর্শে এলেন। তাঁদের পরামর্শ আর উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি এমন এক জীবনে প্রবেশ করলেন যে জীবনকে তিনি আলোক উদ্ভাসিত করে তুললেন–সারা আকাশে বাতাসে তা ছড়িয়ে গেল। তাঁর বাড়ি আইল অব ম্যানের গ্রীবা ক্যাসল সারা বিশ্বের ভ্রমণ বিলাসীদের কাছে হয়ে উঠেছিল একেবারে মক্কার মতো। এছাড় তিনি রেখে গেলেন কয়েক কোটিরও বেশি টাকার সম্পত্তি। তা সত্ত্বেও-কে বলতে পারে–তিনি হয়তো গরীবের মতই মারা যেতেন অনামা হয়ে, শুধু যদি না তিনি একজন খ্যাতনামা মানুষকে প্রশংসা করে একটা প্রবন্ধ না লিখতেন।

হৃদয় থেকে করা আন্তরিক প্রশংসার শক্তিই এই অফুরন্ত সে শক্তি।

রসেটি নিজেকে বড় মানুষ বলেই ভাবতেন। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। প্রায় সব মানুষই নিজেকে খুব বড় বলে ভেবে থাকে।

আর ঠিক সেই রকমই ভাবে প্রতিটি জাতিই।

.

আপনি কি ভাবেন জাপানিদের চেয়ে আপনি শ্রেষ্ঠ? আসল সত্য হলো জাপানীরা আবার আপনাদের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে ভাবে। কোন রক্ষণশীল জাপানি কোন সাদা চামড়ার মানুষকে জাপানি মহিলার সঙ্গে নাচতে দেখলে ক্ষেপে আগুন হয়ে যায়।

আপনারা কি নিজেদের ভারতের হিন্দুদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন? অথচ হিন্দুরা নিজেদের আপনার চেয়ে ঢের বেশি শ্রেষ্ঠ বলেই ভাবে। আপনি কি নিজেদের এক্সিমোর চেয়ে সেরা বলে ভাবেন? এটা অবশ্যই, আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু না। তবে এক্সিমোরা আপনাদের সম্পর্কে কি রকম ভাবে একটু জানতে চান? এক্সিমোর মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা ভারি অলস, তারা কাজকর্ম করতেই চায় না। এক্সিমোরা তাদের বলে সাদা চামড়ার মানুষ'-এর কারণ হলো এটাই তাদের ঘৃণার চরম প্রকাশ।

যে কোন জাতিই অন্য জাতির চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে ভাবে। আর এর থেকেই জন্ম নেয় দেশপ্রেম–আর যুদ্ধ।

খোলাখুলি সত্য কথাটা হলো, যে কোন মানুষের সঙ্গেই আপনার দেখা হোক না কেন সে নিজেকে আপনার চেয়ে যে কোন দিক থেকেই তোক শ্রেষ্ঠ বলে ভাবে। তার হৃদয়ে প্রবেশাধিকার করার নিশ্চিত উপায় হলো, যে কোন রকমেই তাকে জানিয়ে দেওয়া এই ছোট্ট পৃথিবীতে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে আপনি ওয়াকিবহাল, আর এ কাজটা করবেন আন্তরিক ভাবেই।

এমার্সন কি বলেছেন একটু স্মরণ রাখবেন : যে কোন মানুষের সঙ্গেই আমার দেখা হোক, আমি জানি কোন না কোন বিষয়ে সে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আর এর ভিতরে সবচেয়ে দুঃখজনক অবস্থা হলো যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কণামাত্র সত্যিই নেই তারা নিজেদের অসামার্থ ঢাকতে গলাবাজী করে লোক ঠকাতে চেষ্টা করে। ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই কদর্যতায় ভরা।

শেক্সপিয়ার এ সম্পর্কে বলেছিলেন : 'মানুষ! গর্বিত মানুষ! সামান্য অধিকারের সাজে সজ্জিত হয়ে সে এমন সব অদ্ভুত কাজ করে যাতে স্বর্গের দেবদূতরাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।'

.

আমি এবার জানাতে চাই আমার নিজের পাঠক্রমের ছাত্র কিছু ব্যবসায়ী মানুষ এই নীতিগুলো কাজে লাগিয়ে কি অভুতপূর্ব ফল লাভ করেছেন। প্রথমেই ধরা যাক কানেকটিকাটের সেই অ্যাটনীর কথাটাই। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনের জন্যেই নিজের নাম প্রকাশ করতে চাননি।

আমার পাঠক্রমে যোগ দেবার ঠিক পরে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ভদ্রলোক, (যাকে আমরা মিঃ 'আর' বলে ডাকবো) কিছু আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে লং আইল্যাণ্ড যাত্রা করেন। তাঁর স্ত্রী এরপর গেলেন তার এক বৃদ্ধা পিসীর সঙ্গে কথা বলতে, তারপর সেখান থেকে অন্যান্য ছোট বয়সের আত্মীয়দের দেখতে। মিঃ আর'কে যেহেতু প্রশংসা করার ব্যাপারটা কাজে লাগিয়ে দেখতে হবে সেই জন্যেই তিনি ঠিক করলেন ওই বৃদ্ধাকে দিয়েই শুরু করবেন। সেই জন্য বাড়ির চারদিকে তিনি তাকিয়ে দেখার চেষ্টা

করতে লাগলেন কি দিয়ে প্রশংসা শুরু করা যায়।

তিনি জানতে চাইলেন, 'এ বাড়িটা ১৮৯০ সালে বানানো হয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ', বৃদ্ধা জবাব দিলেন 'ঠিক ওই বছরেই তৈরি হয়।'

'এটা দেখেই যে বাড়িতে আমার জন্ম হয় তার কথা মনে পড়ছে', মিঃ আর বললেন, 'ভারি চমৎকার বাড়িটা। কি সুন্দর করে বানানো। কত ঘর। জানেন তো, আজকাল আর কেউ এরকম করে বানাতে চায় না।'

তুমি ঠিক বলেছো, বৃদ্ধা বললেন, 'আজকালকার ছেলেবয়সীরা আর সুন্দর করে বাড়ি বানাতে চায় না। তারা চায় শুধু ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্ট, ইলেকট্রিক বরফের বাক্স, তারপর কেবল তাদের মোটর গাড়ি চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াতে।'

একটু থামলেন বৃদ্ধা।

‘এ বাড়িটা স্বপ্নের বাড়ি, তারপর আবার বলে চললেন আগের স্মৃতি আর সুখস্বপ্ন রোমন্থন করতে করতে। এ বাড়ি তৈরি হয়েছিল ভালোবাসা দিয়ে। আমার স্বামী আর আমি এটা তৈরি করার অনেক আগে থেকেই স্বপ্ন দেখেছি। আমাদের কোন সম্পত্তি ছিল না। সব পরিকল্পনাই আমরা নিজেরা করি।’

বৃদ্ধা এরপর তাকে সারা বাড়ি ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। বৃদ্ধ সারাজীবন ধরে নানা দেশ বেড়িয়ে যেসব জিনসপত্র এনে সাজিয়েছেন, সব কিছুরই মি, আর অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে লাগলেন। চমৎকার কাজ করা শাল, পুরনো আমলের চায়ের সরঞ্জাম, চীনামটির পাত্র ফ্রেঞ্চ বিছানা আর চেয়ার, ইতালীয় তেলরঙা ছবি, আর রেশমী পর্দা, যেটা কোনকালে ফরাসি দুর্গে শোভা পেত।

আমাকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখানোর পর মি. আর বলেছিলেন, বৃদ্ধা আমায় নিয়ে গেলেন একটা গ্যারেজে। সেখানে যত্ন করে রাখা ছিল একটা প্যাকার্ড গাড়ি প্রায় নতুন।

‘আমার স্বামী মারা যাওয়ার অল্পদিন আগেই গাড়িটা কিনেছিলেন’, নরম গলায় বললেন বৃদ্ধা। তাঁর মৃত্যুর পর আমি আর গাড়িটায় চড়িনি ... তুমি ভালো জিনিসের কদর বোঝ, তাই তোমাকেই আমি গাড়িটা উপহার দেব।’

‘সেকি পিসীমা’, মিঃ আর বললেন, একি বলছেন। আপনার এ সদাশয়তা সত্যিই চমৎকার। কিন্তু আমি তো তা নিতে পারবো না। আমি তো আপনার কোন আত্মীয়ই নই, তাছাড়া আমার একটা গাড়ি আছে। আপনার কত আত্মীয় আছে তারা গাড়িটা পেলে খুশি হবে।

'আত্মীয়। বৃদ্ধা বলে উঠলেন। হ্যাঁ, আমার অনেক আত্মীয় আছে, তারা চাইছে আমি মরলে তারা গাড়িটা পাবে। কিন্তু না, তারা গাড়িটা পাচ্ছে না।

কাউকে যদি গাড়িটা না দিতে চান তাহলে যারা পুরনো গাড়ি কেনাবেচা করে তাদের কাছে বিক্রি করতে পারেন,' মিঃ আর বললেন।

বিক্রি করব! বৃদ্ধা চেঁচিয়ে উঠলেন, তুমি কী করে ভাবলে এ গাড়ি আমি বিক্রি করবো? তুমি কি ভাবছ যে গাড়ি আমার স্বামী আমার জন্য কিনেছিলেন তাতে অচেনা মানুষরা চড়বে সেটা আমি সহ্য করবো? আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না এ গাড়ি বিক্রি করব। আমি এটা তোমাকেই দেব। কারণ তুমি ভালো জিনিসের প্রশংসা কর!

মিঃ আর নানাভাবে উপহারটা না নেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু বৃদ্ধার মনে আঘাত লাগবে বলেই তা পারলেন না।

এই বৃদ্ধা বিরাট একটা বাড়িতে তার দামী জিনিসপত্র সেই শাল, ফরাসী ছবি, চায়ের সরঞ্জাম সব কিছু নিয়ে শুধু একটু মর্যাদা আর মমত্ববোধই চেয়েছিলেন। একদিন অতি সুন্দরী আর সবার প্রিয় এক যুবতীই তিনি ছিলেন। একদিন ভালোবাসা দিয়ে একটা বাড়ি তৈরি করে সারা ইউরোপ ঘুরে জিনিস এনে তা সাজিয়েও ছিলেন সুন্দর করে তোলার জন্যেই। আর আজ বৃদ্ধ বয়সে নিঃসঙ্গতায় তিনি কেবল চাইছিলেন একটু মানব হৃদয়ের উষ্ণতা আর সামান্য প্রশংসা–কিন্তু তা কেউ তাকে দেয়নি। তাই সেটা যখন পেলেন তা হয়ে উঠলো মরুভূমির বুকে ঝরণার মতো–তার কৃতজ্ঞতা তাই ওই প্যাকার্ড গাড়িখানা উপহার দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারলেন না।

আর একটা উদাহরণ দিই। কাহিনীটি বলেছেন নিউইয়র্কের লুইস অ্যাণ্ড ভালেন্টাইনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের শিল্পী ডোনাল্ড এম. ম্যাকমোহন।

তাঁর কথাতেই এবার শোনা যায় : 'বন্ধুত্বলাভ ও প্রভাব বিস্তার' সম্পর্কে বেতার কথিকাটি শোনার ঠিক পরেই আমি একজন বিখ্যাত অ্যাটনীর এস্টেটের ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকছিলাম। বাড়ির মালিক এক সময় এসে আমায় একটু উপদেশ দিলেন–কোথায় একগুচ্ছ রডোড্রেনডন ফুলগাছ লাগাবেন।

আমি বললাম, 'জজ সাহেব, আপনার ভারি চমৎকার শখ আছে তো। আপনাদের সুন্দর ওই কুকুরগুলো চমৎকার। আমার ধারণা ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে কুকুর প্রদর্শনীতে আপনি প্রচুর পুরস্কার পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ,' জজসাহেব বললেন, 'কুকুরদের নিয়ে আমার খুব আনন্দ। আমার কুকুরের ঘর দেখবেন?'

এরপর তিনি এক ঘন্টা ধরে তার কুকুর আর সব পুরস্কারগুলো আমায় দেখালেন। তাছাড়া কুকুরের বংশপরিচয়ও আমাকে দিলেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : 'আপনার কোন ছোট ছেলে আছে?'

হ্যাঁ', আছে,' আমি জবাব দিলাম।

জজসাহেব এবার জানতে চাইলেন। 'একটা কুকুরছানা তার ভালো লাগবে না?'

'ওহ্ হ্যাঁ, সে প্রায় আনন্দে লাল হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, তাকে একটা কুকুরছানা উপহার দিচ্ছি,' জজসাহেব বললেন।

এরপর তিনি আমায় বুঝিয়ে দিলেন কেমন করে কুকুরছানাটাকে খাওয়াতে হয়। তারপর নিজেই একটু থেমে জানালেন, মুখে বললে আমি ভুলে যাবো তাই কাগজে তিনি সব লিখে দেবেন। জজ সাহেব তখন ঘরে গিয়ে কুকুরছানার বিষয়ে সমস্ত কিছু লিখে দিলেন, এমনি কি তার বংশ পরিচয় পর্যন্ত। তিনি তাঁর একঘন্টা পনেরো মিনিট মূল্যবান সময় নষ্ট করে প্রায় একশ ডলার দামের কুকুরছানাটাও সঙ্গে দিলেন। এর কারণ আর কিছুই না, আমি শুধু তার শখ সম্বন্ধে আমার আন্তরিক প্রশংসা জানিয়ে ছিলাম বলেই।

.

কোডাকের বিখ্যাত জর্জ ইস্টম্যান যিনি ফিল্ম আবিষ্কার করেন আর যার ফলে চলচ্চিত্র তৈরিও সম্ভবপর হয়। জীবনে প্রায় একশ কোটি ডলার আয় করেছিলেন আর পৃথিবীর একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী বলেও নাম কেনেন। অথচ এই ধরনের দারুণ নাম করা সত্ত্বেও তিনি আমার বা আপনার মতো সামান্য একটু প্রশংসার কাঙাল ছিলেন।

বেশ কয়েকবছর আগে ইস্টম্যান তাঁর মায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য রেচেষ্টারে স্কুল অব মিউজিক আর কিলবোর্ন হল নামে একটি নাট্যমঞ্চ তৈরী করেছিলেন। ওই সময় নিউইয়র্কের সুপিরিয়র সীটিং কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট জেমস অ্যাডামসন ওই বাড়িগুলোর জন্য থিয়েটারের চেয়ার সরবরাহ করার অর্ডারটা পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ইস্টম্যানের স্থপতিকে ফোন করে তিনি মিঃ ইস্টম্যানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন।

অ্যাডামসন শুধু এইটুকুই চাইছিলেন।

তাকে যখন ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো তিনি দেখলেন মিঃ ইস্টম্যান তাঁর ডেস্কের সামনে কিছু কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখছেন। একটু পরেই মুখ তুললেন মিঃ ইস্টম্যান তারপর চশমা খুলে স্থপতি আর মিঃ অ্যাডমসনের দিকে এগিয়ে এলেন।

সুপ্রভাত, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের জন্য কি করতে পারি? তিনি বললেন।

স্থপতি তার পরিচয় দিতেই মি. অ্যাডামসন বললেন : 'আপনার জন্য অপেক্ষা করার ফাঁকে আপনার চমৎকার অফিসের তারিফ করছিলাম। সুযোগ পেলে এরকম একটা ঘরে কাজ করতে পারলে খুব ভালো লাগতো। আপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন আমি বাড়ি সাজানোর কাজ করি। জীবনে এতো সুন্দর সাজানো অফিস আমি কখনও দেখিনি।'

জর্জ ইস্টম্যান জবাবে বললেন : আপনি এমন কিছু মনে করিয়ে দিলেন যে কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। এটা সুন্দর বলেছেন, তাই না? এটা যখন প্রথম বানানো হয় তখন সত্যিই এটা উপভোগ করতাম। কিন্তু আজকাল এত রকম কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় যে কয়েক সপ্তাহ ধরেই হয়তো ঘরটার দিকে তাকানোই হয়ে ওঠে না।

অ্যাডামসন এগিয়ে গিয়ে একটা প্যানেলে হাত রাখলেন। এটা ইংলিশ ওক কাঠে বানানো তাই না? ইতালীয় ওকের চেয়ে এর খাজগুলো আলাদা।

'হ্যাঁ, ইস্টম্যান জবাব দিলেন। এটা ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা ওক। কাঠের বিষয়ে অভিজ্ঞ আমার একজন বন্ধুই এটা বেছে দিয়ে ছিলেন।

এরপর ইস্টম্যান অ্যাডামসনকে ঘরে ঘুরতে ঘুরতে নানা জিনিসপত্র, রঙ, হাতের কাজ ইত্যাদি দেখাতে লাগলেন যেগুলো তাঁরই ইচ্ছেমত বানানো হয়।

ঘরটায় ঘুরতে ঘুরতে তারা একটা জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জর্জ ইস্টম্যান এবার খুব আস্তে আস্তে তার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে তাঁর কিছু জনদরদী কাজের নমুনা দিচ্ছিলেন। এসবের মধ্যে ছিল রচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়, জেনারেল হাসপাতাল, ফ্রেণ্ডলি হোম, শিশু হাসপাতাল ইত্যাদি। মিঃ অ্যাডামসন তাঁকে আন্তরিকভাবেই তাঁর মানবদরদী কাজে অর্থব্যয় করার জন্যে অভিনন্দন জানালেন। একটু পরেই জর্জ ইস্টম্যান একটা কাঁচের বাক্স খুলে একটা ক্যামেরা বের করলেন, একজন ইংরেজের কাছ থেকে কেনা এই ক্যামেরাটি তিনি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।

.

অ্যাডামসন এরপর জর্জ ইস্টম্যানকে তাঁর ছেলে বেলার কথা, কি করে তিনি ব্যবসা আরম্ভ করেন সব জিজ্ঞাসা করতেই মি. ইস্টম্যান আন্তরিকভাবে তাঁর ছেলেবেলার দারিদ্র্যময় জীবনের কাহিনী শোনালেন। তিনি জানালেন কিভাবে তার বিধবা মা একটা বোর্ডিং হাউস চালাতেন আর তিনি রোজ মাত্র পঞ্চাশ সেন্ট মাইনেয় একটা বীমা কোম্পানির কেরানির কাজ করতেন। দারিদ্রের ভয়ঙ্কর দিনরাত তাড়া করে চলত, তাই তিনি শপথ করেছিলেন জীবনে অনেক টাকা করবেন যাতে মাকে কখনও বোর্ডিং

হাউসের কাজ করে মৃত্যুর দিকে যেতে না হয়। মি. অ্যাডাম আরও প্রশ্ন করে অনেক কিছু আগ্রহ নিয়ে শুনে গেলেন-মিঃ ইস্টম্যান আরও বললেন শুকনো ফটোগ্রাফির প্লেট নিয়ে তিনি কিভাবে কাজ করেছেন। তিনি শোনালেন কিভাবে তিনি দিনরাত পরিশ্রম করে যান; কখনও সারারাত ধরে। কাজের ফাঁকে কখনও বা একটু ঘুমিয়ে নিতেন। একই পোশাক একটু ঘুমিয়ে কখনও বা টানা বাহাত্তর ঘন্টাও কাজ করেছিলেন তিনি।

জেমস অ্যাডামসন জর্জ ইস্টম্যানের ঘরে ঢোকেন দশটা পনেরোয়, তাঁকে জানানো হয়েছিল মাত্র ৫ মিনিটের বেশি সময় পাওয়া যাবে না। কিন্তু এক ঘন্টা কেটে গেল, দুঘন্টাও গেল তারা তখনও কথা বলে যাচ্ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত জর্জ ইস্টম্যান অ্যাডামসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শেষবার যখন জাপানে যাই কয়েকটা চেয়ার কিনে বাড়ি নিয়ে আসি। সেগুলো বারান্দায় রেখেছি। কিন্তু রোদ্দুরে লেগে রঙ চটে যাওয়ায় আমি রঙ কিনে নিজেই এগুলো রঙ করেছি। আমি কেমন চেয়ার রঙ করতে পারি একবার দেখবেন নাকি? ঠিক আছে, চলুন বাড়ি গিয়ে আমার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ সারবেন তারপর আপনাকে দেখাবো।'

মধ্যাহ্ন ভোজের পর মি. ইস্টম্যান অ্যাডামসনকে তার জাপান থেকে আনা চেয়ার দেখালেন। চেয়ারগুলোর দাম দেড় ডলারের বেশি নয়। কিন্তু জর্জ ইস্টম্যান যিনি ব্যবসাতে একশ কোটি টাকা করেছেন, চেয়ারগুলো নিজেই রঙ করেছেন বলে গর্ববোধ করতেন।

চেয়ারগুলোর জন্য যে অর্ডার দেবার কথা তার মোট দাম প্রায় ৯০,০০০ ডলার ছিল। অর্ডারটা কে পেয়েছিল বলে আপনার ধারণা-জেমস অ্যাডামসন না তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান?

এরপর থেকে মি, ইস্টম্যানের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আর জেমস অ্যাডমসন ঘনিষ্ট বন্ধু হয়েই ছিলেন।

এবার বলুন দেখি আপনি বা আমি এই প্রশংসা করার ইন্দ্রজাল স্পর্শ কোথা থেকে শুরু করবো? নিজের বাড়িতেই শুরু করুন না কেন? অন্ততঃ আর কোন জায়গার কথা আমার জানা নেই যেখানে এর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি বা যে জায়গায় সবচেয়ে বেশি অবহেলা করা হয়। আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই কিছু ভালো গুণ আছে–অন্ততঃ সেটা নিশ্চয়ই ভাবতেন, না হলে তাকে বিয়ে করতেন না। কিন্তু কতদিন আগে তার আকর্ষণ সম্পর্কে তারিফ জানিয়েছেন আপনি? কতদিন আগে মনে আছে? বলুন কতদিন হলো?

কয়েক বছর আগে নিউ ব্রানসউইকের মিরামিচির কোন জলাশয়ে মাছ ধরছিলাম। আমি এজন্য কানাডীয় অরণ্য এলাকায় একটা নির্জন তাবুতেই থেকে যাই। পড়বার মতো পেতাম কেবল গ্রামের কোন খবরের কাগজ। কাগজের সবই আমি পড়ে ফেলতাম মায় বিজ্ঞাপন পর্যন্ত আর ডরোথি ডিক্সের একটা প্রবন্ধও। তাঁর প্রবন্ধটা এতই সুন্দর ছিল যে সেটা কেটে রেখে দিই। তার কথা হলো কনেকে দেয়া বক্তৃতা শুনতে শুনতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর উপদেশ হলো বরকে একপাশে টেনে নিয়ে তাকে এই উপদেশটা কারও দেওয়া উচিত :

'প্রেয়সীকে চুমু দেবার আগে কখনও বিয়ে করবেন না। বিয়ের আগে কোন মেয়েকে প্রশংসা করা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বিয়ের পরে সেটা করা হলো বিশেষ প্রয়োজন-আর আপনার পক্ষে নিরাপত্তারও কারণ বটে। বিয়েতে স্পষ্ট কথার স্থান নেই। এটা হলো কূটনীতির জায়গা।'

আপনি যদি প্রতিদিনের বিবাহিত জীবন সুখে শান্তিতে কাটাতে চান তাহলে কোন ভাবেই আপনার স্ত্রীর ঘরকন্নার কাজে মাথা গলাবেন না বা তার কাজের সঙ্গে আপনার মায়ের কাজের তুলনা করবেন না। বরং অন্যদিকে, বারবার তার ঘরকন্নার কাজের প্রশংসা করবেন আর খোলাখুলি বার বার তার মতো একজনকে বিয়ে করেছেন বলে নিজেকে ধন্যবাদ দেবেন। বলবেন তার মধ্যে পেয়েছেন ভেনাস আর মিনার্ভার রূপ। মাংস যদি শক্ত হয়ে যায় বা রুটি যদি পুড়ে যায় একদম অভিযোগ করবেন না। বরং বলবেন আজকের রান্নাটা তার রোজের মতো হয়নি। আর তাতেই আপনার স্ত্রী আবার সযতে সব কিছু করার ব্যবস্থা করবেন।

এমন ব্যবহার কিন্তু আচমকা করতে চাইবেন না–তাহলে তার সন্দেহ হতে পারে। যেমন ধরুন আজ বা আগামী কাল রাত্তিরে আপনার স্ত্রীর জন্য একগুচ্ছ ফুল বা কিছু মিষ্টি নিয়ে এলেন। তবে শুধু বলবেন না 'হ্যাঁ এটা আমার আগেই করা উচিত ছিল। বরং মুখে কিছু হাসি ছড়িয়েই ঘরে ঢুকবেন। সঙ্গে বলবেন প্রেমময় দুটো চারটে কথাও। আরও বেশি সংখ্যায় যদি স্বামী স্ত্রী একাজ করতো তাহলে বোধ হয় আমাদের দেশে ছটা বিয়ের মধ্যে একটা বিবাহ বিচ্ছেদও আর হতো না।

.

কোন মেয়েকে আপনার প্রেমে পড়ানোর জন্যে কি করতে হবে শুনবেন? বেশ তবে সেই গোপন রহস্যটা বলে দিই শুনুন। এটায় কাজ হবেই, তবে কৌশলটা আমার নয়। আমি এটা ধার করেছি ডরোথি ডিক্সের কাছ থেকে। তিনি একবার বিয়ে পাগলা একজনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। লোকটা অন্ততঃ তেইশ বার সুন্দরীদের হৃদয় আর তাদের ব্যাঙ্ক তহবিল জয় করেছিল (তবে একটা কথা আড়ালে জানাই লোকটার সঙ্গে ডরোথি ডিক্সের দেখা হয় জেলখানায়)। ডরোথি ডিক্স তার কাছে ঐ প্রেমে পড়ার কৌশলের কথা জানতে চেয়েছিলেন। সে জবাব দেয় এতে রহস্য কিছুই নেই : আপনাকে যা করতে হবে তা হলো মেয়েটির সম্বন্ধে অনর্গল শুধু কথা বলে যান, ব্যস তাতেই কাজ হবে।

পুরুষদের সম্পর্কেও একই কৌশল খাটে। ডিসরেলী একবার বলেন : যে কোন পুরুষের সঙ্গে তার নিজের বিষয়েই বলুন, দেখতে পাবেন সে ঘন্টার পর ঘন্টা শুনে যাবে। ডিসরেলী ছিলেন অতি ধুরন্ধর মানুষ। তার মতো কেউ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চালাতে পারেনি।

অতএব মানুষ আপনাকে পছন্দ করুক তাই যদি চান তাহলে এই নিয়মটা মেনে চলুন : অপর ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করার সুযোগ দিন–আন্তরিকভাবে সেটা করবেন।

এ বইটা আপনারা বেশ কিছুক্ষণ ধরেই তো পড়ে চলেছেন। বইটা এবার বন্ধ রেখে পাইপের তামাক ঝেড়ে ফেলে কাছাকাছি মানুষটির উপর ওই তত্ত্বটা একটু কাজে লাগান দেখি–সঙ্গে সঙ্গে এর যাদুকরী ক্ষমতাটাও লক্ষ করতে ভুলবেন যেন।

অল্প কথায় নিজেকে অপরের কাছে পছন্দসই করে তোলার উপায় :

১নং নিয়ম : অপরের সম্পর্কে আন্তরিকভাবে আগ্রহী হয়ে উঠুন।

২নং নিয়ম : হাসুন।

৩নং নিয়ম : মনে রাখবেন কোন মানুষের কাছে তার নিজের নামটি যে কোন ভাষাতেই সবচেয়ে মিষ্টি।

৪নং নিয়ম : ভালো শ্রোতা হোন। অপরকে তার নিজের বিষয়ে বলতে উৎসাহ দিন।

৫নং নিয়ম : অন্যের আগ্রহের ব্যাপার নিয়ে কথা বলুন।

৬নং নিয়ম : অপর ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ ভাববার সুযোগ দিন–আন্তরিকভাবেই তা করুন।

দশম পরিচ্ছেদ

আপনি তর্কে জিততে পারবেন না

যুদ্ধের ঠিক পরেই লন্ডন শহরে এক রাতে আমি মহামূল্যবান একটা শিক্ষালাভ করেছিলাম। সে সময় আমি স্যার রস স্মিথের ম্যানেজার ছিলাম। যুদ্ধের সময় স্যার রস প্যালেষ্টাইনে অস্ট্রেলিয়ার একজন দক্ষ বৈমানিক ছিলেন। তারপর যুদ্ধ থেমে যাওয়ার ঠিক পরেই, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকটা মাত্র ত্রিশ দিনে উড়ে এসে তিনি সবাইকে তাজ্জব করে দেন। এরকম কাজ করার কথা আগে প্রায় কেউ ভাবেইনি। ব্যাপারটা দারুণ উত্তেজনা জাগিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া সরকার তাঁকে পঞ্চাশ হাজার ডলার পুরস্কার দেন আর ইংল্যাণ্ডের রাজা তাঁকে নাইট উপাধি দান করেন। বেশ কিছুদিন তিনি ইউনিয়ন জ্যাকের নিচে সবচেয়ে আলোচিত মানুষ হয়ে ওঠেন। তিনি হয়ে ওঠেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চার্লস লিণ্ডবার্গ। আমি এক রাতে স্যার রসের সম্মানে দেওয়া এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলম। নৈশভোজ চলার সময় আমার ঠিক পাশেই যে ভদ্রলোক বসেছিলেন তিনি একটা গল্প শোনালেন আমায়। তাতে একটা উদ্ধৃতি ছিল।

ভদ্রলোক বললেন কথাটা বাইবেলে আছে। তাঁর ভুলই হয়েছিল। এটা আমি ভালো করেই জানতাম, একেবারে নিশ্চিত এতে কোন সন্দেহই ছিল না। অতএব নিজেকে খুব জ্ঞানী গুণী প্রমাণ করার জন্য আমি একটা ব্যাপার করলাম। আমি তার ভুল ধরানোর চেষ্টা করলাম। তিনি নিজের কথাতেই আঁকড়ে রইলেন। কি? শেক্সপীয়ার থেকে? অসম্ভব! অসম্ভব! এটা নিশ্চয়ই বাইবেলের। এটা তার জানা আছে!

ভদ্রলোক আমার ডানদিকে বসেছিলেন। আমার বাঁ পাশে ছিলেন আমার একজন পুরনো বন্ধু, মিঃ ফ্রাঙ্ক গ্যামণ্ড। মিঃ গ্যামও বহু বছর ধরে শেক্সপিয়রকে নিয়ে গবেষণা করে আসছেন। অতএব সেই ভদ্রলোক আর আমি দুজনেই মি. গ্যামন্ডকেই সাক্ষী মানতে রাজি হলাম। মি. গ্যামন্ড সব শুনে যাওয়ার পর টেবিলের তলা দিয়ে আমার পায়ে ধাক্কা মারলেন, তারপর বললেন : 'ডেল, তুমিই ভুল করছ। ভদ্রলোকের কথাই ঠিক। এটা বাইবেলেই আছে।'

সেই রাতে বাড়ি ফেরার সময় আমি গ্যামণ্ডকে বললাম : 'ফ্রাঙ্ক, তুমি জানতে ওই উদ্ধৃতিটা শেক্সপীয়ার থেকে নেওয়া।'

তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, জানতাম বইকি, 'হ্যামলেটের পঞ্চর পর্ব দ্বিতীয় দৃশ্য। কিন্তু প্রিয় ডেল আমরা একটা আনন্দ অনুষ্ঠানের অতিথি। লোকটি যে ভুল বলছে কেন তা প্রমাণ করব? তাতে কি তিনি তোমায় পছন্দ করতেন? তাঁর মুখ রক্ষা করতে দেওয়াই উচিত, তাই না? সে তোমার কোন মতামত চায়নি, তাহলে তাঁর সঙ্গে তর্কের দরকার কি? সব সময় বাঁকা পথ এড়িয়ে চলবে।

'সব সময় বাঁকা পথ এড়িয়ে চলবে।' কথাটা যিনি বলেছিলেন তিনি আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু যে শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তা আজও ভুলিনি।

এরকম একটা শিক্ষা আমার দরকার ছিল কারণ আমি প্রায়ই এরকম তর্ক করতাম। ছেলেবেলায় আমার ভাইয়ের সঙ্গে নানা রকম তর্ক করতাম। যখন কলেজে ভর্তি হলাম, তখন আমার একটা বিষয় ছিল তর্কশাস্ত্র। অতএব তর্ক করতে আমার ভালই লাগত,

তাই বিতর্ক সভাতেও যোগ দিতাম। আমার জন্ম হয় মিসৌরীতে। আমি পরে তর্ক নিয়ে পড়াই। বলতে লজ্জা করছে এ নিয়ে আমার একটা বই লেখার ইচ্ছেও ছিল। তখন থেকেই আমি কথাবার্তা শুনেছি, সমালোচনা করেছি আর হাজার হাজার মানুষের উপর তার প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করেছি। তার ফলশ্রুতিতে আমি এটাই উপলব্ধি করেছি যে তর্ক থেকে সবসেরা যে ফল লাভ করা যায় তা হল সেটা এড়িয়ে চলা। তাই তর্ক ব্যাপারটা বিষধর সাপ বা ভূমিকম্পের মত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

দশ বারের মধ্যে নবারই কোন তর্কের শেষ পরিণতিতে দুপক্ষই আরও জোরের সঙ্গে ভেবে নেয় তাদের কথাটাই ঠিক।

আপনি তর্কে কখনই জিততে পারবেন না। পারবেন না তার কারণ হল আপনি হেরে গেলে তো হেরেই গেলেন কিন্তু আপনি জিতলেও হারবেন। সেটা কিভাবে? আপনি যদি প্রমাণ করেন কারও কথা ষোল আনাই ভুল তাতেই বা কি হবে? আপনার দারুণ ভাল লাগবে। কিন্তু অপর লোকটার কি রকম হবে? তাকে আপনি ছোট প্রমাণিত করেছেন। আপনি তাঁর অহমিকায় আঘাত করেছেন। সে আপনার ওই জয় মেনে নেবে না। তাছাড়া একটা কবিতাতেই বলা আছে–

কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু মেনে নিতে বাধ্য করলেও সে তার মত পাল্টায় না।

পেন মিউচুয়াল বীমা প্রতিষ্ঠান তাদের বিক্রেতাদের জন্য একটা বিশেষ নীতি ঠিক করে দিয়েছে—'কখনও তর্ক করবেন না।'

সত্যিকার বিক্রেতার কাজ কিন্তু তর্ক করা নয়। তর্কের কাছাকাছিও নয়। তর্ক করে মানুষের মন বদলান যায় না।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বেশ কবছর আগে একজন তার্কিক আইরিশ আমার ক্লাসে যোগ দেয়, নাম প্যাট্রিক জে, ওহেয়ার। তার লেখাপড়া তেমন ছিল না বটে তবে তর্ক করতে সে বেশ ভালোবাসতো! একসময় সে শোফারের কাজ করতো, সে আমার কাছে এসেছিল এই জন্য যে, সে কিছুট্রাক বিক্রির চেষ্টা করছিল। কথায় কথায় প্রকাশ পেল যে, সে যাদের কাছে ট্রাক বিক্রির চেষ্টা করছিল তাদের সে প্রায় তর্ক করে ওর শত্রু বানিয়ে ফেলেছিল। কেউ যদি তার ট্রাকের কোন নিন্দে করতো তাহলেও ক্ষেপে গিয়ে তার প্রায় গলা টিপতে বাকি রাখত। সে আমায় পরে বলেছে কোন অফিস ছেড়ে আসার সময় ও বলত : 'ব্যাটাকে আচ্ছা করে কথা শুনিয়ে দিয়েছি, তবে কিছু বিক্রি করতে পারিনি।'

আমার প্রাথমিক সমস্যা অবশ্য প্যাট্রিককে কথা বলানো ছিল না। আমার প্রথম কাজ হল তার কথা বলানো বন্ধ করে তর্ক এড়িয়ে চলার উপদেশ দান।

মিঃ ওহেয়ার এখন নিউ ইয়র্কের হোয়াইট মোটর কোম্পানির একজন সেরা বিক্রেতা। কি করে এটা করলেন তিনি? তাঁর নিজের কথাতেই শুনুন : আমি কোন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে যদি শুনি; কি? সাদা ট্রাক? ওগুলো একটুও ভাল না। বিশ পয়সায় দিলেও নেব না। আমরা অমুক কোম্পানীর লরী কিনব। আমি তার জবাব দিতাম : ভাই একটু শুনুন। ওই ট্রাক সত্যিই ভাল। ওটা কিনলে ভুল করবেন না। ওই কোম্পানীর লোকেরাও চমৎকার।

'ভদ্রলোক প্রায় বোবা হয়ে যেতেন, তাঁর তর্ক করার আর সুযোগ থাকত না। তিনি যাদের ট্রাক সেরা বললেন আমি সেটাই সমর্থন করলাম। আর তর্ক করার সত্যিই কোন অবকাশ রাখিনি। আমি অপরের জিনিসকেই সেরা ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম।

'আগে কিন্তু এরকম ব্যাপার ঘটতই না, আমি ক্ষেপে উঠতাম, আর তর্ক জুড়ে দিতাম। অন্য কোম্পানীর নিন্দাও করতাম।

'পুরনো দিনের কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় কিভাবে সব বিক্রি করতে পারলাম। তর্ক করতে গিয়েই তো কত বছর অপব্যয় করেছি। এখন আমি মুখ বন্ধ রাখি। তাতে কাজ হয়।

জ্ঞানী বুড়ো বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন যেমন বলতেন :

'প্রতিবাদ, তর্ক ইত্যাদি করলে মাঝে মাঝে জয় হয় বটে–সে জয় বিরাট শূন্যতায় ভরা, তাতে অপরের হৃদয় পাওয়া যায় না কখনও।'

অতএব হিসেবটা নিজেই করে দেখুন আপনি কোটা চান : সাধারণভাবে নাটকীয় কোন জয় না মানুষের শুভেচ্ছা? দুটো একসঙ্গে কদাচিতই মেলে।

বোস্টন ট্রান্সকিপ্টে একবার একটি কবিতা ছাপা হয়। কবিতাটির মর্মার্থ এই রকম।

‘এখানে সমাধিস্থ রয়েছেন উইলিয়াম জে, যিনি তাঁর পথ চলার অধিকার বজায় রাখতে গিয়ে মারা যান। তিনি নির্ভুল কাজ করেছিলেন-মৃত্যুর মতই নির্ভুল-তবু তিনি মৃত, যেন ভুলই করেছিলেন।‘

.

আপনি হয়তো ঠিক, একদম ঠিক থাকবেন তর্কের পথে চলতে গিয়ে। তবে অপর ব্যক্তির মন নিয়ে কথা বললে সেটা হয়তো একেবারেই নিরর্থক হবে।

প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের অর্থ সচিব উইলিয়াম জি ম্যাকাড়ু একবার বলেন যে রাজনীতিতে তাঁর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন কোন অজ্ঞকে কোনভাবেই তর্ক করে হারানো যায় না।

‘কোন অজ্ঞকে? আপনি খুব নরম করেই বলেছেন মিঃ ম্যাকাঞু। আমার অভিজ্ঞতা হলো–যে কোন লোককেই–তার বুদ্ধির মান যাই হোক না কেন–তর্ক করে হারানো যায় না।

যেমন ধরুন ফ্রেডারিক এস, পার্সন নামে আয়করের একজন অভিজ্ঞ মানুষ একবার একঘন্টা ধরে সরকারী কোন পরিদর্শকের সঙ্গে তর্ক করছিলেন। প্রায় ন’ হাজার ডলার এতে জড়িত ছিল। মিঃ পার্সন বোঝাতে চাইছিলেন ওই ন’ হাজার ডলার তার দেবার কথা নয়–কারণ এ টাকা তিনি পাননি আর পাবেনও না অতএব সেটা কর হিসেবে ধরা হবে কেন?

‘পাওয়া যাবে না! বাজেকথা। এ টাকা দিতেই হবে!’ পরিদর্শকও তর্ক জুড়লেন।

ভদ্রলোকটি বেশ ঠাণ্ডা মাথার এবং কড়া প্রকৃতিরই লোক ছিলেন; অহঙ্কারী মি. পার্সন ঘটনাটির কথা আমার ক্লাসে বলেছিলেন। তাই যুক্তির ব্যাপার যতই বলি কাজে আসবে না...যতই তর্ক করবো ততই উনি একগুঁয়ে হয়ে উঠবেন। আমি তাই ঠিক করলাম বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে ওর প্রশংসা করব।

আমি তাই বললাম, আমরা তুচ্ছ ব্যাপারেই তর্ক করছি। বরং আপনাকে অনেক জরুরী কাজ করতে হবে। কঠিন কাজও বটে। আমি নিজে করের ব্যাপারে নিয়ে পড়াশোনা করেছি, বইতেও পেয়েছি। অথচ আপনি সরাসরি কাজের থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। মাঝে মাঝে ভাবি আপনার মত কাজ পেলে করতাম, তাতে অনেক শিখতে পারতাম। আন্তরিকতার সঙ্গেই কথাগুলো বললাম।

'পরিদর্শক তাঁর চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। ঝুঁকে পড়ে তাঁর কাজ সম্পর্কে আমায় অনেক কথা শোনালেন। কত রকম জালিয়াতি দেখেছেন তাও জানালেন। আস্তে আস্তে তার গলার স্বর বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে এলো। তিনি এবার তাঁর ছেলেমেয়েদের কথাও বললেন। যাওয়ার সময় তিনি বলে গেলেন আমার সমস্যা নিয়ে ভেবে চিন্তে তাঁর মতামত কদিন পরে জানাবেন।

'তিনি তিনদিন পরে আমাকে এসে জানালেন আমার আয়করের রিটার্ন যেমন দিয়েছি তাই মেনে নিচ্ছেন।'

এই আয়কর পরিদর্শক যা করেছেন সেটা সাধারণ মানুষের দুর্বলতা অনুযায়ীই করেছেন। তিনি চাইছিলেন নিজের গুরুত্ব বোঝাতে। যতক্ষণ মি. পার্সন তর্ক করেছেন

ততক্ষণ তিনিও ছাড়েননি নিজের গুরুত্ব বোঝাতে। কিন্তু যখনই তার গুরুত্ব মেনে নেওয়া হলো, তর্কেরও শেষ হল, আর তিনি সন্তুষ্ট হয়ে সহৃদয়ভাবে কথা বলতে লাগলেন।

সম্রাট নেপোলিয়নের প্রধান ভৃত্য কনস্টান্ট প্রায়ই জোসেফাইনের সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলত। সে তার লেখা 'নেপোলিয়নের' ব্যক্তিগত জীবনীতে লিখে গেছে যে, সে ওই খেলায় দক্ষ হলেও ইচ্ছে করেই জোসেফাইনের কাছে হার স্বীকার করতো। আর তাতে জোসেফাইন আনন্দ পেতেন।

.

আসুন, আমরা কনস্টান্টের কাছ থেকে একটা ধারাবাহিক শিক্ষা নিই। আমাদের খরিদ্দার, প্রেয়সী আর স্বামী এবং স্ত্রীদের কাছে এবার থেকে ছোটোখাটো সমস্ত ব্যাপারে হার স্বীকার করি।

বুদ্ধ বলেছিলেন : 'ঘৃণাকে কখনও ঘৃণা দিয়ে জয় করা যায় না, যায় ভালোবাসা দিয়ে।' এইরকম ভাবে ভুল বোঝাবুঝিও তর্কের মধ্য দিয়ে সমাধান হতে পারে না বরং সেটা হতে পারে কূটনীতি, আলোচনা আর সহানুভূতি দিয়ে অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে।

লিঙ্কন একবার একজন তরুণ সামরিক অফিসারকে তার সহকর্মীর সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক করার জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন। লিঙ্কন বলেছিলেন : 'যে মানুষ নিজের উন্নতির চেষ্টা করতে ইচ্ছুক তার ব্যক্তিগতভাবে কখনও ঝগড়া করার সময় থাকে না। যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বা মাথা গরম করে ফেলে তার পক্ষে উন্নতি করা আর

ও কঠিন। কোন কুকুরের কামড় খাওয়ার চাইতে তাকে পথ ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কারণ কুকুরটাকে মেরে ফেললেও তার কামড় তো আর ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না।

অতএব এক নম্বর নীতি হলো :

তর্কে জেতার সব সেরা উপায় হল তর্ক না করা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শত্রুতা এড়ানোর উপায়

থিয়োডোর রুজভেল্ট যখন হোয়াইট হাউসে ছিলেন, তিনি স্বীকার করেছিলেন যে তিনি যদি শতকরা ৭৫ ভাগ ঠিক হতেন তাহলে আশাতীত কিছু করতে পেরেছেন বলেই ভাবতেন। বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষের কাছে যদি এটাই সত্য হয়, তাহলে আমি বা আপনি কি পারবো আশা রাখি?

আপনি যদি একশবারের মধ্যে ৫৫ বার ভুল না হয়ে ঠিক হতে পারেন তাহলে আপনি ওয়ালস্ট্রীটে গিয়ে রোজ দশ লক্ষ ডলার আয় করতে পারেন, তার সঙ্গে একখানা প্রমোদতরী কিনে মস্ত গায়িকা কোন মেয়েকে বিয়েও করতে পারেন। আর ৫৫ বার ঠিক হওয়া সম্বন্ধে যদি আপনার কোন সন্দেহ থাকে তাহলে অন্য লোকেরা ভুল করেছে কথাটা বলা আপনার সাজে কি?

কোন মানুষের গলার স্বর, এমন কি অঙ্গভঙ্গী দেখেও আপনি বলতে পারবেন সে ভুল করছে কিনা-ব্যাপারটা আপনি আপনার দৃষ্টি দিয়েই বুঝিয়ে দিতে পারেন কিছু বলার দরকার হবে না। তাকে যদি তার ভুল ধরিয়েও দেন তাহলে কি চাইবেন সে আপনার মত মেনে নিক? কখনই না কারণ এ কাজের মধ্য দিয়ে আপনি তাকে সরাসরি তার বুদ্ধি, বিবেচনা, অহমিকা আর আত্মসম্মানের উপর আঘাত করেছেন। এতে সে চাইবে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতে। অথচ এর জন্য সে কিছুতেই নিজের মত পাল্টাবে না। এরপর আপনি তাকে প্লেটো, ইমানুয়েল কান্ট বা আর যারই হোক দর্শন প্রয়োগ করতে

পারেন, কিন্তু তাতে মত বদলাবে না। যেহেতু আপনি তার অনুভূতিকে আঘাত করে বসেছেন।

কখনই এই ভাবে শুরু করতে চাইবেন না, এ ব্যাপারটা আমি আপনাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি, আসুন। এটা অত্যন্ত খারাপ। এটা অনেকটা এই রকম বলা হয় : দেখুন, আমি আপনার চেয়ে চালাক চতুর। আমি আপনাকে কিছু জ্ঞান দিয়ে আপনার মত পাল্টানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এটা কিছুটা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করার মত। এতে বিরোধিতা জাগিয়ে তোলা হয়, আপনার শ্রোতা আপনি কিছু শুরু করার আগেই আপনার সঙ্গে লড়াইতে নামতে চায়।

মানুষের মন বদলানো বেশ কঠিন কাজ। অতএব তাকে আরও কঠিন করে তুলে লাভ কি? নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেনই বা কেন?

আপনি যদি কোন কিছু প্রমাণ করতে চান তাহলে কাউকে সেটা জানতে দেবেন না। এ কাজ এমন গোপনে, কৌশলে করতে হবে কেউ যেন তা বুঝতে না পারে আপনি সেটা করে চলেছেন।

নিচের এই উদ্ধৃতিটা লক্ষ করুন :

মানুষকে এমনভাবে শেখাতে চান, সে যেন না বোঝে আপনি তাকে শেখাতে চাইছেন। লর্ড চেষ্টারফিল্ড তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন :

'অন্য কারও চেয়ে যদি পারো জ্ঞানী হও, তবে সে কথা তাকে বলো না।'

বিশ বছর আগে আমি যা বিশ্বাস করতাম–একমাত্র অঙ্ক ছাড়া আর বোধহয় কিছুই বিশ্বাস করি –তাছাড়া যখন আইনস্টাইনের লেখা পড়ি তখন তাও আবার বিশ্বাস হয় না। আরও বিশ বছর পরে আমি এ বইটায় যা বলেছি সেটাও হয়তো বিশ্বাস করতে চাইব না। আগে যে সব বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম এখন সে সম্বন্ধে ততটা নিশ্চিত আমি নই। সক্রেটিস এথেন্সে তাঁর শিষ্যদের বারবার বলতেন : আমি একটা ব্যাপারই জানি, আর সেটা হলো আমি কিছুই জানি না। যাই হোক আমি সক্রেটিসের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান বলে নিজেকে ভাবি না, আর তাই কাউকে বলতে চাই না, সে ভুল করছে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। তাতে আখেরে কাজ হয়।

কোন মানুষ কোন কথা বললে সেটা যদি আপনার ভুল বলে মনে হয়-হ্যাঁ, প্রকৃতই ভুল কিন্তু–তাহলে এভাবেই সুরু করলে ভালো হয় না কি : হ্যাঁ, এবার শুনুন! আমার অন্যরকম মনে হয়েছিল। তবে আমারও ভুল হতে পারে। কারণ আমার প্রায়ই ভুল হয়। আর আমার ভুল হলেই সে ভুলটা শুধরে নিতে চাই। তাহলে আপনার ব্যাপারটাও একটু দেখা যাক, কি বলেন?

এই ধরনের কথায়, অর্থাৎ আমারও ভুল হতে পারে। আমার প্রায়ই ভুল হয় ব্যাপারটা একটু দেখা যাক কি বলেন? সত্যিকার দারুণ যাদু থাকে এই সব কথায়।

স্বর্গ, মর্ত, পাতাল কোন জায়গাতেই মানুষ আপনার ঐ ধরনের কথায় কোন প্রতিবাদ করতে চাইবে না।

ঠিক এই রকমই করে থাকেন একজন বিজ্ঞানী। আমি একবার বিখ্যাত আবিষ্কারক আর বিজ্ঞানী স্টেফানসনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তিনি প্রায় এগারো বছর কাটিয়েছিলেন মেরু অঞ্চলে, তাছাড়াও তিনি দু'বছর কেবলমাত্র মাংস আর জল ছাড়া কিছুই খাননি। তিনি আমায় তার একটা পরীক্ষার বিষয় বলেছিলেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি তিনি ঐ পরীক্ষায় কি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। আমি কোনদিনই তাঁর উত্তরটা ভুলতে পারবো না। তিনি বলেন : কোন বিজ্ঞানী কখনও কিছু প্রমাণ করতে চান না। তিনি কেবল আসল ব্যাপার খুঁজে বের করার চেষ্টাই করে থাকেন।

আপনিও আপনার চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক পন্থা কাজে লাগাতে চান, তাই না? বেশ, এ ব্যাপারে আপনি যদি বৈজ্ঞানীকভাবে চিন্তা করতে না পারেন তাহলে কিন্তু দোষ আপনারই।

আপনার যে ভুলও হতে পারে এ কথাটা স্বীকার করলে আপনি কখনই কোন ঝামেলায় পড়বেন না। এরকম করলে সব রকম তর্কের অবসান ঘটবে আর অপর ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করে আপনি যেরকম পরিষ্কার আর উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন তাকেও সেই রকমই করে তোলে। এর ফলে সে যে ভুল করতে পারে সেটাই স্বীকার করতে চাইবে।

আপনি যদি জানেন কোন লোক ভুল করছে আর আপনি সে কথাটা তাকে মুখের উপরেই বলে ফেললেন, তাহলে কি হতে পারে? আসুন, আপনাদের একটা নির্দিষ্ট ঘটনার উদাহরণ দিই। মিঃ এস, নিউ ইয়র্কের একজন তরুণ অ্যাটনী, একবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টে খুব গুরুত্বপূর্ণ এক মামলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিষয়টাতে প্রচুর টাকা আর গুরুত্বপূর্ণ এক আইনের বিষয় জড়িত ছিল।

বিতর্ক চলার সময়, সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতি মিঃ এস-কে বিশেষ একটি আইনের ধারা ছ'বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ এ কথাই বললেন।

মিঃ এস-একটু থমকে বিচারপতির দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুখের উপর বলে বসলেন, 'হুজুর এরকম কোন আইনই নেই।'

ব্যাপারটা সম্বন্ধে মি. এস-পরে লেখকের একটা ক্লাসে বলেছিলেন : আমার কথায় সারা কামরায় নিঃস্তব্ধতা নেমে এলো। মনে হচ্ছিল ঘরের তাপমাত্রা যেন শূন্য ডিগ্রীতেই নেমে গেছে; আমার কথাই ঠিক ছিল। বিচারপতি ভুল কলেছিলেন আর আমি সেই কথাটাই তাঁকে বলে ফেলি। এতে কি তিনি বন্ধুভাবাপন্ন হন? না। আমি এখনও বিশ্বাস করি আইনটা আমারই পক্ষে ছিল আর আমি এও জানতাম সেদিন যেভাবে বিতর্কে অংশ নিয়ে কথা বলি তেমন আর কোনদিন পারিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি সে মামলায় জিততে পারিনি। আমি দারুণ একটা ভুল করেছিলাম। একজন শিক্ষিত আর জ্ঞানী বিচারপতির মুখের উপর তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে।

খুব কম সংখ্যক লোকই যুক্তি মেনে চলে। আমাদের বেশির ভাগই একচোখা আর একপেশে মানুষ। আমাদের বেশির ভাগই আগে থেকে একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকি–আর সেটা হয় ঈর্ষা, সন্দেহ, ভীতি, হিংসা এবং অহমিকাবোধ থাকার কারণে। বেশির ভাগ নাগরিকই কিছুতেই তাদের ধর্ম, চুলের ছাঁট, সমাজতন্ত্রবাদ বা ক্লার্ক গেবল সম্বন্ধে ধারণা বদলাতে চান না। অতএব আপনি যদি চান মানুষকে তার ভুল সম্বন্ধে জানিয়ে দেবেন, তাহলে নিচের অংশটা দয়া করে প্রতিদিন সকালে প্রাতরাশের আগে

হাঁটু গেড়ে বসে, পড়ে চলুন। এটা প্রফেসর জেমস হার্ভে রবিনসনের আলোকিত একখানা বইয়েরই অংশ। বইটার নাম দি মাইন্ড ইন দ্য মেকিং।'

'আমরা মাঝে মাঝে কোন রকম বাধা বা বড় রকমের কোন আবেগ ছাড়াই আমাদের মন বদলে ফেলি। কিন্তু আমাদের যদি বলা হয় আমরা ভুল করছি তাহলে আমরা সেই কথায় বেশ আপত্তি প্রকাশ করি আর আমাদের হৃদয়ও বেশ কঠিন হয়ে ওঠে! আমরা আমাদের বিশ্বাস গড়ে ওঠার ব্যাপারে অবিশ্বাস্য রকম অমনোযোগী থাকি অথচ আমরাই আবার এর প্রতি দুরন্ত রকম আকর্ষণ দেখাই কেউ যদি সেটা কেড়ে নিতে চায়। আসলে এটা পরিষ্কার যে এই ধারণাগুলো কোনভাবেই আমাদের একান্ত আপনার নয়, বরং সেটা হলো আমাদের অহং ভাবটা যা বিপদের সামনে পড়ে যায়... আমার এই ছোট্ট কথাটা মানুষের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর এটা উপলব্ধির মধ্যেই রয়েছে প্রাজ্ঞতার পথ। এটাতে একই রকম তীব্রতা থেকে যায় তা আপনি 'আমার' আহার, 'আমার' কুকুর, 'আমার' বাড়ি, 'আমার' বাবা, 'আমার' দেশ, 'আমার' ইশ্বর যাই বলুন না কেন। এছাড়াও আসল রহস্য হলো পৃথিবীর জানা বিষয়ে আমাদের ধারণা বা বিশ্বাস নিয়ে কেউ আপত্তি তুললেই আমরা রেগে যাই বা অসন্তোষ প্রকাশ করি...আমরা সেই সব সত্যি বলে বিশ্বাস করে চলতে চাই, চিরকাল আমরা যা সত্যি ভেবে এসেছি। আর এ বিষয়ে কোন রকম সন্দেহের প্রকাশ ঘটলেই আমরা যত রকমে পারি আমাদের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরতে চাই। এর ফল হলো আমাদের বেশির ভাগ তথাকথিত যুক্তিবোধের মধ্যে কেবল খুঁজে ফিরতে চাই আমাদেরই কথার প্রমাণ।

আমি একবার একজন ঘরসাজানোয় দক্ষ মানুষকে আমার বাড়ি সাজানোর দায়িত্ব দিই। যখন বিল পেলাম আমার চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল।

কদিন পরে আমার একজন বন্ধু এসে সব দেখে গেলেন। কথায় কথায় দামের কথা উঠতেই তিনি আঁৎকে উঠে বললেন : 'বলো কি? এ যে সাংঘাতিক। আমার মনে হচ্ছে লোকটা তোমাকে বেশ ঠকিয়েছে।'

কথাটা সত্যি? হ্যাঁ, তা সত্যি; বন্ধু ঠিকই বলেছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই কথাটা স্বীকার করতে চায় না যেটায় তাদের বুদ্ধি বিবেচনায় ধাক্কা লাগতে পারে। অতএব মানুষ বানাই আমি, নিজে যে ঠিক সেটাই প্রমাণ করার চেষ্টা চালালাম। আমি বললাম সবসেরা জিনিস সবচেয়ে সস্তায় মেলে না। আর

কারও পক্ষেই ভালো রুচিসম্মত জিনিস ফুটপাথের মত সস্তায় কখনও পাওয়া যাবে না। ইত্যাদি।

পরের দিন আর একজন বন্ধু এলেন। তিনি সব জিনিস দেখে বেশ প্রশংসা করতে লাগলেন। মনের খুশিতে টগবগ করে তিনি বলেও ফেললেন এই রকম চমৎকার জিনিস তিনিও তার বাড়ির জন্য কিনবেন ভাবছেন। এবার কিন্তু আমার প্রতিক্রিয়া হলো অন্য রকম। আমি বললাম : 'মানে, সত্যি কথা বললে এ সব খরচ আমার সাধ্যের বাইরে। বড় বেশি খরচ করেছি। এগুলো কিনে ভুলই করেছি।'

আমরা যখন ভুল করি, সেগুলো তো নিজেদের কাছে স্বীকার করতে পারি। আমাদের কাছে কৌশলে আর বেশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কথাটা তুললে হয়তো অন্যের কাছে তা স্বীকারও করতে পারি, আর তা করে আবার নিজেদের সারল্য আর মানসিক উদারতার

জন্য অহমিকাও অনুভব করি। কিন্তু ব্যাপারটা আর তা থাকে না যদি কেউ জোর করে আমাদের এই তিক্ত পাঁচনটা যদি গেলাতে চেষ্টা করে...

গৃহযুদ্ধের সময় আমেরিকার বিখ্যাত সম্পাদক হোরেস গ্রিল লিঙ্কনের নীতির প্রচণ্ড রকম বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ঠাট্টা, তামাশা, আর তর্কের মধ্য দিয়েই তিনি লিঙ্কনকে তাঁর মত মেনে নিতে বাধ্য করতে পারবেন। তিনি এই তিক্ত ধারণা আর প্রচার মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চালিয়ে গিয়েছিলেন। আসলে যে রাতে বুথ লিঙ্কনকে গুলি করে সেদিনও তিনি প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনকে হিংস্রভাবে, ব্যঙ্গাত্মক ব্যক্তিগত আক্রমণ করে লিখেছিলেন।

কিন্তু এই রকম তিক্ততার ফলে কি লিঙ্কন গ্রিলের সঙ্গে একমত হন? মোটেই না, হাস্যাস্পদ করে গালনিন্দে করলে কখনই কাজ হয় না।

মানুষকে নিয়ে চলার ক্ষেত্রে যদি চমৎকার কিছু উপদেশ চান, আর নিজেকে পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের উন্নতি ঘটাতে আগ্রহী হন তাহলে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের আত্মজীবনী অবশ্যই পাঠ করবেন-এ আত্মজীবনী হল আজ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আর আমেরিকার সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ রত্ন।

ফ্রাঙ্কলিন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন কিভাবে তিনি বিরক্তিকর তর্ক করার অভ্যাস ত্যাগ করেন আর নিজেকে কেমন করে আমেরিকার ইতিহাসে অতি ভদ্র, সক্ষম, আর কূটনীতিসম্পন্ন মানুষ করে গড়ে তোলেন।

একদিন বেন ফ্রাঙ্কলিন যে সময় উড়নচণ্ডী যুবক, তখন একজন বহুঁকালের বন্ধুসভার বন্ধু তাঁকে একপাশে টেনে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কড়া ভাষায় কতকগুলো গায়ে বেঁধে এমন সত্যি কথা শুনিয়ে দেন। কথাগুলো অনেকটা এই রকম :

'বেন, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। তোমার মতে মত দেয় না এমন সব লোককে তুমি প্রায় চড় মারতেই বাকি রাখো। তোমার মত এখন তাই আর কারও পছন্দ নয়। কেউ তা নিতে চায় না। তোমার বন্ধুরা এটা বেশ বুঝতে পেরেছে তুমি ওদের কাছাকাছি না থাকলেই তাদের সময় ভাল কাটে। তুমি এত বেশি জান যে কেউ তোমাকে কিছু শেখাতে পারে না। বাস্তবিকই, কেউ আর সেরকম চেষ্টাও করবে না যেহেতু তাতে শুধু গন্ডগোল আর অযথা খেটে মরতে হয়। অতএব, তুমি আর বেশি কিছু শিখতে পারছনা যেটুকু জান তার চেয়ে তো নয়ই। তাছাড়া যা তুমি জান তাও অতি সামান্য।'

বেন ফ্রাঙ্কলিক সম্পর্কে আমি যে চমৎকার জিনিসটা জানি তা হলো তিনি কি সুন্দর ভাবেই না এই তিরস্কার গ্রহণ করেন। এটা বোঝার মত তার যথেষ্ট বয়স হয়েছিল যে ব্যাপারটা সত্যিই, তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে এভাবে বলার অর্থ তিনি ব্যর্থ হবেন আর সামাজিক ভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। তাই তিনি সময়মত নিজেকে সংশোধন করে নিলেন। তারপর থেকেই তিনি তাঁর সেই উদ্ধত স্বভাব বদলে ফেলেন।

বেন ফ্রাঙ্কলিন লিখেছিলেন, 'আমি নিয়ম করে ফেললাম অন্যের বিরক্তি ঘটিয়ে কোন রকম সরাসরি তর্কে জড়িয়ে পড়ব না আর নিজের মতামত জাহির করতেও চাইব না। তাছাড়াও আমি ঠিক করলাম কথাবার্তায় এমন কোন কথা বলবো না যাতে নিজের মতামত জানানো হয়। যেমন, 'নিশ্চয়ই' 'নিঃসন্দেহে' ইত্যাদি। এর বদলে ঠিক করলাম

ব্যবহার করবো 'আমার মনে হয়', 'আমার ধারণা, 'আমি ভাবছি' এই সব। অন্য কেউ যদি কিছু বলে উঠতে চাইতো আমি সরাসরি তাঁর কথায় বাধা না দিয়ে বা তাঁর কথা অস্বীকার না করে বলতাম তাঁর কথা হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে সঠিক হতেও পারে, তবে এ ব্যাপারে মনে হয় যেন অন্য কিছু হতে পারে, ইত্যাদি। আমি এরপর থেকেই এরকম কাজে তফাত বুঝতে পারলাম–আর বেশ সহজ ভাবেই সব ঘটে চলল। যেরকম বিনম্রতায় আমি আমার মতামত জানাতে শুরু করলাম তাতে কোন বাধা না পেয়েই তা গৃহীত হতে লাগল। আমার ভুল হলেও কম আশ্চর্য হতাম আর বেশ সহজেই অন্যেরা ভুল করলেও তাদের স্বমতে আনতে বেগ পেতে হতো না।

'এই রকম রীতিনীতি আমি এমন স্বাভাবিক ভাবেই আয়ত্ত করে ফেললাম যে সেটা বেশ সহজেই হয়ে এলো। গত পঞ্চাশ বছরেও কেউ কোন ঝগড়া হতে পারে এমন কথা আমার মুখ থেকে শোনেনি। আর আমার এই অভ্যাসের জন্যই (আমার সততা নিয়েও) মনে হয় আমি জনগণের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলাম যে পুরাতন বদল করে নতুন কিছু করতেও পারতাম। যদিও বক্তা হিসেবে আমি মোটেই ভাল ছিলাম না। নিজের কথা বা বক্তব্য তেমন করে বোঝাতেও পারতাম না তবুও আমি সাধারণভাবে সাফল্য অর্জন করেছিলাম।'

বেন ফ্রাঙ্কলিনের এমন কৌশল ব্যবসায় ক্ষেত্রে কেমন কাজে লাগে? দুটো উদাহরণ দেওয়া যাক।

নিউ ইয়র্কের ১১৪ লিবার্টি স্ট্রিটের এফ জে. ম্যাহনি তেল ব্যবসা সংক্রান্ত যন্ত্রাদি বিক্রি করে থাকেন। তিনি লং আইল্যাণ্ডের একজন বড় মক্কেলের জন্য কাজের বায়না

ধরেছিলেন। কাজটির জন্য একটা খসড়াও দেওয়া হয় আর সেটা গৃহীত হলে কাজ করাও আরম্ভ হয়। তারপরেই একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার ঘটে যায়। ক্রেতা ভদ্রলোক তার বন্ধুদের সঙ্গে কাজটা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলে তিনি মারাত্মক ভুল করেছেন। তার উপর ভুল কিছু জিনিস চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা নাকি ছোট, এটা নাকি সেরকম, এরকম এই সব তাঁকে নানারকম বোঝায়। বন্ধুদের কথায় ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। তিনি মি. ম্যাহনিকে ফোন করে জানিয়ে দেন যে, যা বায়না দিয়েছেন তিনি সে জিনিস নিতে পারবেন না।

'আমি সব ব্যাপারটা সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে দেখতে পেলাম আমরা যা করছি সেটাই ঠিক। মিঃ ম্যাহনি আমায় জানিয়েছিলেন। তাছাড়াও আমি জানতাম ওঁর বন্ধুরা এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না বা বোঝেন না, তবে আমি বুঝলাম একথা তাঁকে বললে ফল মারাত্মক হবে। আমি লং আইল্যাণ্ডে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর অফিসে ঢুকতেই ভদ্রলোক প্রায় লাফিয়ে উঠে দ্রুত কথা বলতে বলতে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তিনি এমন উত্তেজিত যে প্রায় ঘুসি পাকাতেও চাইছিলেন। তিনি আমায় ঢের বকাবকি করে কথাটা শেষ করলেন এই বলে : বলুন এব্যাপারে কি করতে চাইছেন?

আমি তাঁকে বেশ শান্তস্বরেই বললাম, তিনি যা চাইবেন তাই করবো। আপনি এর দাম দিচ্ছেন, অতএব পছন্দসই জিনিস চাইবার অধিকার আপনার আছে। তা যাই হোক কাউকে দায়িত্ব নিতে হবেই। আপনি যদি মনে করেন আপনিই ঠিক তাহলে আপনার ব্লুপ্রিন্ট দিন যদিও আমরা ইতিমধ্যে ২০০০ হাজার ডলার খরচ করেছি, তাহলেও কাজটা বাতিল করবো। এ দুহাজার আমরা আপনাকে খুশি করার জন্যই ব্যয় করতে রাজি। তবে আপনাকে একটু সাবধান করে দিতে চাই আপনার কথা মতো জিনিস বানানো

হলে সে দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে, আর আমাদের পরিকল্পনা মত কাজ করতে দিলে দায়িত্ব নেব আমরাই।

ভদ্রলোক ততক্ষণে শান্ত হয়ে এসেছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত বললেন, ঠিক আছে, কাজ করে যান। তবে পছন্দ না হলে ঈশ্বর আপনাদের সাহায্য করুন।

'ঠিকই হয়েছিল সব কিছু, ভদ্রলোক আমাদের আরও দুদফা কাজ এ বছরেই দেবেন কথা দিয়েছেন।'

'ভদ্রলোক আমায় যখন অপমান করেন এবং ঘুসি উঁচিয়ে আসেন আর বলেন আমার কাজ বুঝি না তখন আমার পক্ষে তর্ক না করে আত্মসম্বরণ করা কঠিনই ছিল। তবে সেটা করে ভালোই করি, ওতে কাজও হয়। আমি যদি বলতাম তিনি ভুল করছেন তাহলে একটা তর্ক শুরু হত। হয়তো মামলাও হত, সৃষ্টি হত তিক্ততা, বহু টাকা খরচ হত, আমরা হারাতাম ভাল এক খরিদ্দার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, কেউ ভুল করছে না বলাই ভাল।

আর একটা উদাহরণ-মনে রাখবেন যে সব কথা বলছি তার সবই হাজার হাজার মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতারই ফসল। আর. ভি. ক্রাউলে নিউ ইয়র্কের বিরাট একটা কাঠের কোম্পানীর সেলসম্যান। তাকে একজন দক্ষ কাঠ পরিদর্শকের সঙ্গে কাজ করতে হয়, তার ভুল হচ্ছে বলতেও হয়। তিনি নিজে তর্কেও জেতেন, তবে তাতে কোন লাভ হয়নি। কারণ এই কাঠ পরিদর্শকরা, মিঃ ক্রাউলে বলেছেন, 'অনেকটা বেসবল খেলার বিচারকের মত। তারা কোন ধারণা করলে তা আর বদলায় না।

মিঃ ক্রাউলে দেখলেন তর্কে তিনি জিতলেও তার প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই এবার তিনি তাঁর কাজের কৌশল পাল্টাবেন ঠিক করলেন। আর তর্ক করবেন না। ফল কি হল? তাঁর নিজের মুখেই শুনুন :

এক সকালে আমার অফিসে টেলিফোন বেজে উঠল। ওপাশ থেকে শোনা গেল বেশ উত্তেজিত, অসন্তুষ্ট কণ্ঠস্বর। তিনি বললেন, আমরা যে তার কারখানায় একগাড়ি কাঠ পাঠিয়েছি সেগুলো একদম বাজে। তাঁর প্রতিষ্ঠান ট্রাক থেকে মাল নামানো বন্ধ করে দিয়েছে। আর আমরা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব কাঠ তার চাতাল থেকে সরিয়ে নিই।' ট্রাকের মাল একচতুর্থাংশ নামানো হতে তাদের কাঠ পরিদর্শক জানান যে কাঠের মান শতকরা ৫৫ ভাগ নিচে। এ অবস্থায় তারা তা নিতে অস্বীকার করছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে রওয়ানা হলাম আর রাস্তায় যেতে যেতে ঠিক করে নিলাম কিভাবে সব সামাল দেব। সাধারণ অবস্থায় পড়লে আমি কাঠ বাছাই করার নিয়ম উল্লেখ করতাম আর ওই কাঠ পরিদর্শককে অবশ্যই বোঝাতে চাইতাম কাঠ ঠিক আছে এবং তার মান ঠিক, এটা তারই ভুল হচ্ছে। তিনি ভুল নিয়ম প্রয়োগ করছেন। অবশ্য আমি ঠিক করলাম এই শিক্ষায় যে নিয়ম শিখেছি তাই কাজে লাগাব।

কারখানার কাছে যখন পৌঁছালাম, তখন সেই ভদ্রলোক আর কাঠ পরিদর্শন বেশ বদমেজাজেই তৈরি হয়ে আছেন, লড়াই করতে তারা প্রস্তুত। আমরা এবার যে গাড়ি থেকে কাঠ নামানো হচ্ছিল সেখানে গেলাম। আমি তাঁদের অনুরোধ করলাম সব কাঠ নামাতে দেওয়া হোক যাতে ব্যাপারটা বুঝতে পারি। পরিদর্শককে আমি এও বললাম তিনি বাতিল কাঠগুলো এক জায়গায় আর ভালোগুলো অন্য জায়গায় রাখুন।

'বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ করেই বুঝলাম পরিদর্শক ভদ্রলোক বড় বেশি রকম কড়া, আর বাছাই করার নিয়ম তিনি মানছেন না। এই কাঠগুলো ছিল বিশেষ জাতের সাদা পাইন কাঠ-আমি এও বুঝলাম পরিদর্শক শক্ত কাঠ সম্পর্কে বেশ শিক্ষা পেয়েছেন বটে তবে সাদা পাইন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। সাদা কাঠে আমার অভিজ্ঞতা দারুণ এটা আমার বিষয়–তা বলে কি তিনি যেভাবে সব বাছাই করছিলেন তাতে আপত্তি করলাম? মোটেই না। আমি শুধু সব দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে দু-চারটে প্রশ্ন করতে লাগলাম 'কোন কাঠ কেন খারাপ-একবারের জন্যেও আমি বলিনি পরিদর্শক মশাই ভুল করছেন। আমি কেবল বোঝাতে চাইলাম আমার জানার উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে পাঠানোর সময় যাতে তাদের পছন্দসই কাঠ পাঠাতে পারি।'

বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ পথে আর সহযোগিতার ভঙ্গীতেই আমি বারবার বললাম, তাদের কাজে লাগবে না এমন কাঠ তারা অবশ্যই সরিয়ে নেবেন। কথাবার্তার মাঝখানে ভদ্রলোককে বেশ মোলায়েম করে তুলোম আর আমাদের মধ্যেকার তিক্তভাব অনেকটাই কেটে গেল। আমার সতর্ক কয়েকটা উক্তিতে ভদ্রলোক বুঝলেন বাতিল কাঠগুলোর কিছু হয়তো সত্যিই ঠিক আছে আর আসলে তাদের দরকার আরও দামী কিছু। আমি সর্তক ছিলাম যাতে তিনি না ভাবেন আমি এ নিয়ে কোন কথা তুলছি।

আস্তে আস্তে তার সমস্ত ভাবভঙ্গীই বদলে গেল। তিনি শেষ অবধি আমার কাছে স্বীকার করলেন সাদা পাইন কাঠ সম্বন্ধে তার তেমন অভিজ্ঞতা নেই। গাড়ি থেকে তা নামানোর সময় তিনি আমায় সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি তখন ব্যাখ্যা করলাম এ কাঠ কেন পাঠানো হয়েছে, অবশ্য তাঁর পছন্দ না হলে ফেরত নেব। ভদ্রলোকের শেষ পর্যন্ত

এমন অবস্থা হলো যে যতবার কাঠ বাতিলের সারিতে রাখা হচ্ছিল, তিনি নিজেকে দোষী ভাবছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝেছিলেন ভুলটা তাঁদেরই হয়েছে, যেরকম ধরনের কাঠ দরকার ছিল সে ধরনের কাঠের অর্ডার তাঁরা দেন নি।

অবশেষে যা দাঁড়ালো, আমি বিদায় নেবার পর পরিদর্শক গাড়ি বোঝাই সব কাঠ আবার যাচাই করলেন আর সবটাই নিয়ে নিলেন এবং আমরাও পুরো টাকার চেক পেয়ে গেলাম।

'এই একটা ব্যাপারেই সামান্য একটু কৌশলে কাজ হয়ে গেল। যেহেতু আমি কোনভাবেই অন্যজনকে বলিনি তিনি ভুল করছেন, আর এতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের দেড়শ ডলার নগদে লাভ হলো। অবশ্যই টাকার বিনিময়ে আমাদের যে সুনাম নষ্ট হতো তার মূল্যায়ন সম্ভব হয় না।'

একটা কথা এবার বলতে চাই, এ পরিচ্ছেদে নতুন কিছু আমি বলছি না। উনিশ শতক আগে যীশু বলেছিলেন : 'তোমার শত্রুর সঙ্গে চট করে একমত হও।

অন্য কথায় বলতে গেলে আপনার মক্কেল, স্বামী বা শত্রুর সঙ্গে তর্ক করবেন না। কখনও বলবেন তার ভুল হচ্ছে, তাঁরকে চটতে দেবেন না। বরং একটু কূটনীতি কাজে লাগান।

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ২,২০০ বছর আগে মিশরের বৃদ্ধ রাজা আখখাঁটি তার ছেলেকে কিছু সুন্দর উপদেশ দিয়েছিলেন-যে উপদেশ আজকের দিনে অত্যন্ত প্রয়োজন। চার হাজার

বছর আগে বৃদ্ধ রাজা আখখাঁটি মদ পান করার ফাঁকে তাকে ছেলেকে বলেছিলেন : কৌশলী হও। এতে তোমার সুবিধা হবে।

অতএব, অন্যকে স্বমতে আনতে হলে দু নম্বর নিয়ম হলো :

'অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। কখনও তাকে বলবেন না সে ভুল করছে।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভুল করে থাকলে তা স্বীকার করুন

আসি বৃহত্তর নিউইয়র্কের প্রায় মাঝখানেই থাকি, তা সত্ত্বেও আমার বাড়ির এক মিনিট হাঁটা পথের দূরত্ব একফালি চমকার জঙ্গল আছে। বসন্তকালে সেখানে চমৎকার জামগাছে ফল ধরে, কাঠবিড়ালীরা এখানে বাসা বেঁধে বাচ্চাদের নিয়ে খেলা করে। এখানে জন্মায় বিরাট ঘোড়ার মাথার সমান উঁচু দীর্ঘ ঘাস। এই সুন্দর অকলঙ্কিত একখণ্ড বনের নাম ফরেষ্ট পার্ক–আর এটা সত্যিই একটা জঙ্গল। কলম্বাস যেদিন বিকেলে আমেরিকা আবিষ্কার করেন তখন এটা যেমন ছিল আজও বোধ হয় তাই রয়ে গেছে। আমি ওই জঙ্গলে আমার ছোট্ট বুলডগ রেক্সকে নিয়ে বেড়াতে যাই। রেক্স অত্যন্ত নিরীহ হাউণ্ড কুকুর। বেড়াতে গিয়ে কারও সঙ্গে দেখা হয় না বলেই রেক্সকে আমি শিকল বেঁধে রাখি না।

একদিন পার্কে দেখা হয়ে গেল ঘোড়সওয়ার এক পুলিসের সঙ্গে, পুলিসটি তার কর্তৃত্ব দেখাতে তৎপর হয়ে উঠলো।

‘এভাবে কুকুরের শিকল খুলে নিয়ে পার্কে বেড়াচ্ছেন কেন?’ সে আমায় বেশ ধমক দিয়েই বললো। জানেন না এটা বেআইনী?

হ্যাঁ, তা জানি’, আমি স্বরেই বললাম। তবে ও কারও ক্ষতি করবে না, তাই–।’

'আপনি ভাবেননি! আঁ! আপনি কি ভাবেন তা নিয়ে আইন মাথা ঘামায় না। কুকুরটা কোন কাঠবিড়ালীকে মেরে ফেলতে পারে বা কোন বাচ্চাকে কামড়াতে পারে। যাক, এবারের মত আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। ভবিষ্যতে কোনদিন আপনার কুকুরকে শিকল ভোলা দেখলে আপনাকে জজের কাছে আপনার কথা বোঝোতে হবে।'

আমি ভীরু গলায় হুকুম তামিল করবো জানালাম।

তামিল করেছিলাম বটে–তবে মাত্র কয়েকবার। কিন্তু রেক্স শিকল পছন্দ করতো না, আর আমিও তাই। অতএব, আগের মত শিকল খুলেই রেক্সকে নিয়ে বেড়াতে লাগলাম। প্রথম প্রথম ভালোই কাটল। তারপর একদিন ফাঁদে পড়ে গেলাম। একদিন বিকেলে একটা পাহাড়ের কোলে আইন রক্ষক ভদ্রলোকের মুখোমুখি হয়ে পড়লাম। সে ঘোড়ার পিঠেই ছিল। রেক্স খোলা অবস্থায় সোজা সেই অফিসারের সামনে।

আমি তৈরি ছিলাম। জানতাম কি ঘটবে। অতএব পুলিশকে আর কথা আরম্ভ করার সুযোগ দিলাম, আমিই তা শুরু করলাম। আমি বললাম : 'অফিসার, আপনি আমায় হাতে হাতেই ধরেছেন। আমি দোষী। আমার কোন অজুহাতই নেই, কোন ওজরও নেই। আপনি আমায় গত সপ্তাহে সাবধান করেছিলেন যে রেক্সকে যেন শিকল দিয়ে বেঁধে রাখি। না হলে জরিমানা করবেন।'

পুলিশ কর্তাটি নরম গলায় বললেন, 'ঠিক আছে। আমি বুঝতে পারছি এই রকম ছোট্ট কোন কুকুর ছেড়ে রাখার লোভ সামলানো যায় না, যখন বিশেষ করে কেউ থাকে না।'

'হ্যাঁ, লোভ বলতে পারেন, আমি জবাব দিলাম। তবে এটা আইনের নিয়মে।'

‘যাকগে, এরকম কুকুর কারও ক্ষতি করবে না’, পুলিশটি জানালেন।

‘না’ তবে সে কাঠবিড়ালী মারতে পারে, আমি বললাম।

তিনি বললেন বুঝেছি, ‘আপনি ব্যাপারটায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন, ‘কি করবেন আমি বলে দিচ্ছি। ওকে পাহাড়ের কাছে ছুটোছুটি করতে দিন আমি যাতে না দেখি–তাহলে সব ভুলে যাব।’

পুলিশটি মানুষ হওয়াতেই একটু আত্মগরিমা দেখাতে চাইছিলেন, তাই আমি যখন নিজেকে দোষী বলতে লাগলাম তখনই তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্যেই দয়া প্রদর্শন করলেন।

কিন্তু ধরুন আমি যদি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাইতাম-তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াত? পুলিশের সঙ্গে আপনারা কখনও তর্ক করেছেন?

তাই তার সঙ্গে তর্ক করার পথে না গিয়ে আমি স্বীকার করলাম তিনিই সম্পূর্ণ ঠিক আর আমি সম্পূর্ণ ভুল করছি। আমি স্বীকারের কাজটা বেশ দ্রুত আর আন্তরিকতার সঙ্গেই করি। আমি ওঁর দিক আর উনি আমার দিকটা নিতেই ব্যাপারটা চমৎকার ভাবেই মিটে গেল। লর্ড চেষ্টারফিল্ডও বোধহয় তত মহত্ত্ব দেখাতে পারতেন না, অথচ একসপ্তাহ আগে তিনিই আমায় আইনের ভয় দেখিয়ে ছিলেন।

এমন অবস্থায় অপর ব্যক্তি বলার আগেই নিজেই দোষ স্বীকার করা ভাল নয় কি? অপরের মুখ থেকে খারাপ কথা শোনার আগে আত্মসমালোচনার কথা নিজে কানে শোনা ভাল তাই না?

অন্যে আপনার সম্বন্ধে যেসব খারাপ কথা ভাবছে বা বলতে চাইছে সেগুলোই নিজে বলে ফেলুন-আর সেটা বলে ফেলুন অন্যে তা বলার আগেই–আর এইভাবেই তার পালের হাওয়া কেড়ে নিন। এমন করলে একশ বারে নিরানব্বই বারই দেখবেন সে বেশ মহত্ব দেখিয়ে ক্ষমা করার পর্যায়ে চলে আসবে, ঠিক পুলিশটি যেমন আমার আর রেক্সের ক্ষেত্রে করেন।

ফার্দিনান্দ ওয়ারেন নামে একজন কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট একবার বদমেজাজী একজন ক্রেতাকে এই কৌশলে বশ করেন।

নিজের কাহিনী বলতে গিয়ে তিনি জানান যে বিজ্ঞাপনের আর প্রচারের কাজে ছবি আঁকার সময় অত্যন্ত সতর্ক আর ঠিক থাকতে হয়।

তিনি বলেন : 'কিছু শিল্প সম্পাদক চান তাদের কাজ সঙ্গে সঙ্গেই করে দেওয়া হোক। এরকম করতে গিয়ে অনেক সময়েই ভুল হয়। একজন এরকম শিল্প সম্পাদককে আমি জানতাম যিনি ছোটখোটো ভুল ধরে আনন্দ পেতেন। প্রায়ই আমি তার অফিস থেকে অতি রেগে বেরিয়ে আসতাম, সেটা সমালোচনার জন্য নয়, বরং তার আক্রমণের পদ্ধতির জন্যেই। সম্প্রতি ওই ভদ্রলোককে আমি খুব দ্রুত কিছু কাজ করে দিই। তিনি হঠাৎ আমায় টেলিফোন করে তার অফিসে যেতে বললেন। তিনি জানালেন কিছু ভুল

হয়েছে। আমি পৌঁছতেই ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই দেখলাম আর ভয়ও পেলাম। ভদ্রলোক প্রায় ক্ষিপ্ত অবস্থায় আমার উপর একহাত নিতে তৈরি। বেশ গরম হয়েই তিনি বললেন আমি এই করেছি, তাই করেছি। এতদিন যা শিখেছিলাম সেই আত্মসমালোচনা করারই সুযোগ আমার এসে গেল। অতএব আমি বললাম : আপনি যা বলছেন তা সত্য হলে আমারই ভুল হয়েছে, অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। বহুঁকাল ধরেই আপনার জন্য ছবি আঁকছি, আমার জানা উচিত ছিল; আমি অত্যন্ত লজ্জিত।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার পক্ষ সমর্থন করতে আরম্ভ করলেন। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। তবে ভুলটা এমন কিছু মারাত্মক নয়। এ হলো শুধু।

‘আমি তাঁকে বাধা দিলাম, যেকোন ভুলেই বাজে খরচ আসবে, তাছাড়া এ অতি বিরক্তিকর।’

‘তিনি কিছু আবার বলতে যেতেই বাধা দিলাম। আমার খুবই ভাল লাগছিল। জীবনে এই প্রথম আমি নিজের সমালোচনা করছিলাম এ আমার ভালোই লাগছিল।‘

‘আমার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল, আমি বলে চলোম। আপনি আমায় প্রচুর কাজ দেন, আপনি সেরা জিনিসই চাইবেন। তাই সব আবার আমি নতুন করেই এঁকে দেব।’

‘না! না!’ তিনি বলে উঠলেন। ‘তোমায় আবার একাজ করতে দিতে পারি না, তিনি আমার কাজের প্রশংসা করে বললেন, সামান্য একটু অদল বদল করলেই চলবে। আমার সামান্য ভুলে কোন অর্থ ক্ষতি হয়নি। সামান্য ব্যাপার–এতে চিন্তার কিছু নেই।’

নিজেকে সমালোচনা করতেই ভদ্রলোকের সব রাগ জল হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি আমায় মধ্যাহ্নভোজে নিয়ে গেলেন। আমি বিদায় নেবার আগে আমাকে তিনি একটা চেক আর কমিশনও দিলেন।

বোকারাই কেবল নিজের ভুল সমর্থন করতে চায় না–বেশির ভাগ বোকারাই তাই করে। কিন্তু নিজের ভুল মেনে নিতে মহত্বই প্রকাশ পায় আর তাতে কাজও হয়। একটা উদাহরণ রাখছি। ইতিহাসে রবার্ট লী'য়ের সম্বন্ধে রয়েছে যে তিনি যে ভাবে গেটিসবার্গ আক্রমণের ব্যর্থতা নিজের কাঁধে নেন সেকথার তুলনা নেই, তাতে তিনি অতি মহৎ হয়েই আছেন। এ ব্যর্থতা আসে পিকেটের আক্রমণে।

পশ্চিমী দুনিয়ায় পিকেটের আক্রমণ হয়ে আছে সবচেয়ে দর্শনীয় আর আশ্চর্যজনক কোন আক্রমণ। পিকেট নিজে ছিলেন অত্যন্ত রূপবান। তাঁর মাথার পাশে ঢল নামতে থোকা থোকা চুল, প্রায় কাঁধ অবধি নামতো সে চুল। ইতালি আক্রমণের সময় নেপোলিয়ন যেরকম করতেন পিকেটও তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে রোজই প্রেমপত্র লিখতেন। সেনাবাহিনীর প্রত্যেকেই বিনা প্রতিবাদে মেনে চলতো তাঁর আদেশ।

পিকেটের সেনাবাহিনী শত্রুব্যূহ আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে চলতেই আচমকা শত্রুপক্ষ লুকনো জায়গা থেকে ওই সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। পিকেটের পাঁচ হাজার সেনার প্রায় পাঁচভাগের চার ভাগই তাতে ধ্বংস হয়ে যায়। সামান্য ভুলে আর অসতর্কতার ফলেই এমন মারাত্মক ব্যাপার ঘটে যায়।

পিকেটের এই আক্রমণ ইতিহাসে সোনার অক্ষরেই লেখা আছে-বীরত্বপূর্ণ যে সংগ্রামের তুলনা নেই। লী ব্যর্থ হলেন এইভাবেই। উত্তরে এগুনোর পথ ছিল না–দক্ষিণের অবস্থাও তাই।

লী নিদারুণ শোকাহত আর দুঃখিত হলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রেসিডেন্ট জেফারসন ডেভিসের কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাতে লিখেছিলেন তার জায়গায় একজন তরুণ আর যোগ্য ব্যক্তিকেই যেন নিয়োগ করা হয়। লী যদি পিকেটের ব্যর্থতার জন্য কাউকে দোষারোপ করতে চাইতেন তাহলে সেরকম সুযোগ তিনি প্রচুর পেতেন। তার নিচের কিছু সেনাপতিরাই ব্যর্থ হন। ঘোড়সওয়ার বাহিনী পদাতিক বাহিনীকে সাহায্য করতে সময়মত আসেনি। এতেই ভুল মারাত্মক হয়ে ওঠে।

কিন্তু লী ছিলেন মহৎ, তিনি অপরকে দোষারোপ করেননি। পিকেটের হতাবশিষ্ট, রক্তাক্ত বাহিনী ফিরে আসতেই লী স্বয়ং তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, এ দোষ আমার, আমার নিজের দোষেই এযুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয়েছে।'

ইতিহাসে খুব কম সেনাপতিরই এমন স্বীকারোক্তি করার সাহস দেখা গেছে।

এলবার্ট হাভার্ড এমন ধরনের একজন লেখক ছিলেন যে একটা জাতিকেই প্রায় কাঁপিয়ে তুলতেন তাঁর লেখায়। তাঁর লেখার খোঁচায় অনেকের মধ্যেই অসন্তোষ জাগতো। কিন্তু হাভার্ড মানুষের সঙ্গে তাঁর চমৎকার ব্যবহারের গুণে শত্রুকেও বন্ধু করে তুলতেন।

যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি : একবার এক ক্রুদ্ধ পাঠক জানান যে তিনি হাভার্ডের মতের সঙ্গে একমত নন। তিনি হাভার্ডকে নানা বিশেষণে ভূষিত করেন। হাভার্ড কিন্তু এর জবাব দিলেন এইভাবে :

‘চিন্তা করে দেখলাম, আমার নিজের মত লেখাটার সঙ্গে মেলে না। আগে যা সব লিখেছি আজ সেগুলো আমার অনেকক্ষেত্রেই পছন্দ হয় না। আমি আনন্দিত যে আপনি লেখাটি নিয়ে ভেবেছেন। ভবিষ্যতে এদিকে এলে একবার আমার এখানে যদি আসেন তাহলে লেখাটি নিয়ে আলোচনাও করা যাবে। দূর থেকেই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি।
আপনার বিশ্বস্ত....।
এরকম ব্যবহার যিনি করতে পারেন তাকে কিই বা বলবেন?

যখন আমাদের কথা ঠিক হয় তখন অপরজনকে কৌশলী পথে নিজের মতের অনুসারেই করতে হবে–আর আমাদের যখন ভুল হবে–সেটা আশ্চর্যজনকভাবে প্রায়ই হয়–তখন আসুন নিজেদের ভুল দ্রুত স্বীকার করে ফেলি। এই কৌশলে যে কেবল দ্রুত, ফল দেবে তাই নয় বিশ্বাস করুন এতে খুব মজাও পাবেন আর সেটা আত্মসমর্থনের চেয়েও ভালো।

প্রাচীন সেই প্রবাদটা মনে রাখবেন : ‘লড়াই করে যথেষ্ট পাবেন না, বরং নরম হলে আশাতীতই পেতে পারবেন।‘

অতএব যদি অপরকে নিজের মতে আনতে চান তাহলে ৩নং নিয়মটা মনে রাখবেন :

‘যদি আপনি ভুল করেন, তাড়াতাড়ি বেশ আন্তরিকভাবেই স্বীকার করুন।‘

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শুভবুদ্ধির পথ ধরে

আপনার কখনও রাগ হলে অন্যকে দুচার কথা শুনিয়ে দেন আর তাতেই আপনার মনের ভার লাঘব হয়ে যায়। কিন্তু যাকে শোনালেন তার মনের ভাবটা কেমন হয়? সে কি আপনার মত আনন্দ পাবে? আপনার ওই কলহপ্রিয়তা, ক্ষিপ্তভঙ্গী কি তাকে আপনার মতবাদ মেনে নিতে সাহায্য করবে?

'আপনি যদি আমার দিতে ঘুসি পাকিয়ে আসেন', উড্রো উইলসন একবার বলেছিলেন, তাহলে কথা দিতে পারি আমাকেও দুগুণ তৈরি দেখতে পাবেন। কিন্তু এর বদলে আপনি যদি এসে বলেন, আসুন, বসে আলোচনা করা যাক, আর আমাদের মতবিরোধ হলে, আসুন জানার চেষ্টা করি আমাদের মতবিরোধ কেন। এতে আমরা দেখতে পাবো আমাদের মধ্যে যে মতবিরোধ আছে তা খুবই কম। দেখা যাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা একমত। শুধু আমাদের যদি একটু ধৈর্য আর ইচ্ছে থাকে তাহলে একমত হতে অসুবিধা নেই।

উড্রো উইলসনের এই বক্তব্যের সঙ্গে জন, ডি, রকফেলার জুনিয়রের চেয়ে আর বেশি কেউ একমত হননি। সেটা **১৯১৫** সাল, রকফেলার ছিলেন কলোরাডোর সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ! আমেরিকার শিল্পজগতের ইতিহাসে সবচেয়ে রক্তাক্ত এক ধর্মঘট দুবছর ধরে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। কলোরাডোর কলহপ্রিয় শ্রমিকরা কলোরাডো লৌহ প্রতিষ্ঠানের কাছে অতিরিক্ত মজুরি দাবি করে চলেছিল। রকফেলার ওই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা

করতেন। বহু সম্পত্তি এতে ধ্বংস হয়, সৈন্যবাহিনীকেও ডাকতে হয়। প্রচুর রক্তপাত ঘটে, ধর্মঘটীদের দেহ গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায়।

এই রকম সময়ে, আকাশ বাতাস যখন ঘৃণায় আচ্ছন্ন রকফেলার ধর্মঘটিদের নিজের মতে আনতে চাইছিলেন। আর তিনি তা পেরেও ছিলেন। কিভাবে? সেই কাহিনীই এখানে বলছি। কয়েক সপ্তাহ বন্ধুত্ব করে রকফেলার ধর্মঘটিদের প্রতিনিধিদের কাছে বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতাকে অনেক অর্থেই একটা অপূর্ব সৃষ্টি বলা যেতে পারে। এতে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায়। এতে রকফেলারের চারপাশে যে ঘৃণার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল সেই ভাবটি সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। এর ফলে তার কিছু আবার স্তাবকও জুটে গেল। এতে এমন সুন্দর বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সব বলা হয়েছিল যে, ধর্মঘটিরা যে মজুরি বৃদ্ধির মধ্যে ওই রক্তাক্ত পথে লড়াই করেছিল সে সম্পর্কে উচ্চবাচ্য না করেই কাজে যোগদান করল।

নিচে সেই অপূর্ব বক্তৃতার গোড়াটি উদ্ধৃত করছি। লক্ষ করবেন কীভাবে এটা ক্রমশ বন্ধুত্বের আলো ছড়াতে শুরু করেছিল।

মনে রাখবেন রকফেলার যাদের সামনে কথা বলেছিলেন সেইসব মানুষ কয়েকদিন আগে তাঁকে একটা টক আপেল গাছে গলায় ফাঁস দিয়ে মারার কথা বলেছিল। তা সত্তেও রকফেলার যা ব্যবহার করেন তার চেয়ে ভাল কিছু আর আশা করা যায় না–তিনি যেন একদল স্বেচ্ছাসেবক ডাক্তারের সভায় কথা বলছেন। তাঁর বক্তৃতায় পাওয়া যায় এমন সব কথা, যেমন–এখানে আসতে পেরে আমি গর্বিত বোধ করছি। আপনাদের বাড়িতে গিয়ে, আপনাদের স্ত্রী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচিতি হয়ে, আমি এখানে আজ

অপরিচিত অবস্থায় আসি নি, আমি এসেছি বন্ধু হিসেবে পারস্পরিক বন্ধুত্ব, সাধারণ স্বার্থ আর আপনাদের দয়াতেই আমি এখানে এসেছি।

'এ আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন', রকফেলার শুরু করেন এইভাবে। জীবনে এই প্রথম এই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের প্রতিনিধি, অফিসার আর সুপারিন্টেন্ডেন্টদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেলাম। আমি আপনাদের কথা দিতে পারি আমি এখানে এসে আজ গর্বিত আর যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন একথা আমি মনে রাখব। এই সভা যদি মাত্র দু'সপ্তাহ আগে অনুষ্ঠিত হতো তাহলে আমি এখানে থাকলে মাত্র কয়েকজনকেই বোধহয় চিনতে পারতাম। দক্ষিণের কয়লাখনি অঞ্চলের সমস্ত শিবিরগুলি গত সপ্তাহে ভ্রমণ করার সুযোগ পাওয়ায় একমাত্র যারা ছিল না তারা ছাড়া, ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করে আমরা এখানে অপরিচিত অবস্থায় আসিনি, এসেছি বন্ধুভাবে। আর এই পারস্পরিক বন্ধুত্বের মধ্যেই আমি খুশি যে আমাদের সব রকম সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করতে পারব।

যেহেতু এটি প্রতিষ্ঠানের অফিসার এবং কর্মচারি প্রতিনিধিদের সভা, অতএব আপনাদের অনুগ্রহেই আমি এখানে এসেছি, যেহেতু আমি এর কোনটি হওয়ার মত সৌভাগ্যবান হতে পারিনি। তা সত্ত্বেও আমি অনুভব করি আমি আপনাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবেই জড়িত, যেহেতু বলতে গেলে আমি স্টকের মালিক আর অংশীদারদের পক্ষে এসেছি।

শত্রুদের বন্ধু করে তোলার জন্য এই কৌশলটা কি চমৎকার কোন উদাহরণ নয়? ধরুন রকফেলার যদি অন্য কোন পথ নিতেন? ধরুন তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়ে তাদের মারাত্মক বাস্তব ঘটনাগুলো তাদের সামনে মেলে ধরতেন? ধরা যাক তিনি তার

কথাবার্তায় তাদের ইঙ্গিত করতেন তাদের ভুল হচ্ছে। এটাও ধরুন তর্কশাস্ত্র অনুযায়ী তিনি প্রমাণও করতে পারলেন তাদের ভুল হয়েছে, তাহলে কি ঘটতো? এতে জন্মাত আরও ক্রোধ, আরও ঘৃণা আরও বিরোধিতা।

আপনার প্রতি যদি কোন মানুষের ভালো ধারণা থাকে, তাহলে কখনই আপনি তাকে নিজের মত কোন তর্কশাস্ত্রের সাহায্যেই আনতে পারবেন না। ধমকদানকারী বাবা-মা, হুকুমকারী মালিক আর স্বামী বা ঘ্যানঘ্যানে স্ত্রীদের বোঝা দরকার যে মানুষ কখনই তাদের মন বদলাতে চায় না। তাদের কোনভাবেই জোর করে আপনার বা আমার মতের বশবর্তী করা যাবে না। কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ নম্র ব্যবহার করলে তাদের হয়তো কিছুটা নমনীয় করতে পারা যাবে।

ঠিক এই কথাটাই প্রায় একশ বছর আগে বলেছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন :

‘এটা একটা পুরনো প্রবাদ যে, এক গ্যালন দুর্গন্ধ পদার্থে যত মাছি এসে বসে তার চেয়ে ঢের বেশি বসে এক ফোঁটা মধুর উপর। অতএব মানুষের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি। আপনি যদি কোন মানুষকে আপনার মতের বশবর্তী করতে চান তাহলে প্রথমেই তাকে বুঝিয়ে দিন আপনি তার প্রকত বন্ধু। এর মধ্যেকার এক ফোঁটা মধুই তার হৃদয় আকর্ষণ করবে। আর এটাই তার হৃদয়ে পৌঁছবার একমাত্র পথ।

ব্যবসায়ীরা আজ বুঝতে পারছেন ধর্মঘটীদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করলে আখেরে কাজ দেয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে, হোয়াইট মোটরকার কোম্পানির আড়াই হাজার কর্মচারি যখন মাইনে বাড়ানোর দাবীতে ধর্মঘট করে, সেই কোম্পানির প্রেসিডেন্ট রবার্ট

এফ, ব্ল্যাক কখনই তাদের সম্পর্কে কোন নিন্দাবাদ করেননি বা ভীতি প্রদর্শন বা কমিউনিষ্ট আখ্যাও দেননি। বরং তিনি ধর্মঘটীদের প্রশংসাই করেন। তিনি ক্লীভল্যাণ্ডের খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন প্রচার করে জানান, কি শান্তিপূর্ণ পথেই না তারা তাদের কাজের যন্ত্র নামিয়ে রেখেছে। ধর্মঘটী পাহারাদারদের একটু আয়েসী হতে দেখে তিনি তাদের কয়েক ডজন বেসবল ব্যাট আর দস্তানা কিনে দিয়ে ফাঁকা এক মাঠে তাদের খেলতে আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্ট ব্ল্যাকের ওই বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের ফলে যা হয় তাই হয়েছিল–তাতে অনেকেই তাঁর বন্ধু হয়ে পড়ে। এরপরেই ধর্মঘটীরা ঝাঁটা, বুরুশ এনে কারখানা সাফাই করতে শুরু করলো। একবার ব্যাপারটা ভাবুন! ধর্মঘটীরা বেশি মাইনে আর ইউনিয়নের স্বীকৃতি দাবী করেও কারখানা সাফাই শুরু করেছে। আমেরিকার শ্রমিক ধর্মঘটের ইতিহাসে এমন ব্যাপার আর কোনদিনই শোনা যায়নি। এক সপ্তাহের মধ্যেই মিটমাট হয়ে সব ঝামেলা দূর হলো–কোনরকম মনোমালিন্য বা বিদ্বেষ ছাড়াই এটা হয়।

ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার, যিনি দেবতার মত সুপুরুষ ছিলেন আর জিহোভার মতই কথা বলতেন, তিনি ছিলেন একজন অতি বিখ্যাত আর সফল আইনবিদ। তা সত্ত্বেও তিনি সওয়াল করতেন এই রকম বন্ধুত্বপূর্ণ পথে : 'এটা জুরীদের বিচার করে দেখতে হবে, অথবা 'ভদ্রমহোদয়েরা এই ব্যাপারটি ভেবে দেখলে বোধহয় ভাল হয়, বা এই ব্যাপারগুলি আশাকরি আপনাদের খেয়াল থাকবে', বা আপনাদের মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানের জন্যে নিশ্চয়ই এই ঘটনাগুলির গুরুত্ব অনুধাবন করবেন। কোনরকম জোর বা চাপ দিয়ে নয়। নিজের মতামত কোনবারেই তিনি অপরের উপর চাপিয়ে দিতে চাননি।

ওয়েবস্টার কাজে লাগান তাঁর শান্ত, বন্ধুত্বপূর্ণ ভঙ্গীকেই, আর তাই তাঁকে খ্যাতিমান হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

আপনাকে কখনও হয়তো কোন ধর্মঘট মীমাংসার জন্য বা কোন জুরীকে কিছু বোঝানোর জন্য যেতে হবে না, তবে আপনি হয়তো আপনার বাড়িভাড়া কমাতে চাইতে পারেন। তাতে কি এই বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার কাজে আসবে? আসুন সেটাই একবার দেখা যাক।

ও. এল. ঐব একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি তাঁর ভাড়া কমাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বেশ ভালোমতই জানা ছিল তাঁর বাড়িওয়ালাটি বেশ পোড় খাওয়া মানুষ। মিঃ ঐব লিখেছিলেন যে কথা তিনি আমার প্লানে বলেন, আমি তাঁকে লিখেছিলাম যে আমার লীজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার এ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দেব। আসল সত্যটা হল আমি ছাড়তে ইচ্ছুক ছিলাম না। ভাড়া যদি কমানো যায়। আমি থেকে যেতেই চাইছিলাম। তবে অবস্থাটা নিরাশব্যঞ্জকই ছিল। বাকি ভাড়াটিয়ারা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। প্রত্যেকেই আমায় জানায় যে ওই মালিকের সঙ্গে কথা বলাই শক্ত। কিন্তু আমি নিজেকে বললাম : 'আমি মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের কৌশল শিখেছি, ব্যাপারটা ওঁরই উপর কাজে লাগাতে চেষ্টা করব। দেখতে হবে ফল কি হয়।

তিনি আর তার সেক্রেটারি আমার চিঠি পেয়েই দেখা করতে এলেন। আমি তাদের চার্লি শোয়াবের কায়দাতেই দরজার সামনে অভ্যর্থনা জানালাম। বলতে গেলে তাদের অভ্যর্থনার জোয়ারে ভাসিয়ে দিলাম। আমি একবারও বললাম না ভাড়া বড় বেশি। আমি শুরু করলাম তাঁর বাড়িটা কত আরামের এই কথা বলেই। বিশ্বাস করুন আমি সহৃদয়তার সঙ্গে আন্তরিক প্রশংসা করলাম, বাড়িটা তিনি যেভাবে রেখেছেন তার

প্রশংসাও করলাম। আমি বললাম আরও একবছর আমার থাকার ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমার সামর্থ্য নেই।

'কোন ভাড়াটের কাছ থেকে এমন অভ্যর্থনা পাবেন তিনি মোটেও আশা করেন নি। একজন চৌদ্দটা চিঠি লিখেছিল। তার কয়েকটা আবার রীতিমত অপমানজনক। আর একজন লিখেছিলেন লীজ ছেড়ে দেবেন তিনি যদি না উপরের তলায় ভাড়াটিয়ার নাক ডাকা বন্ধ না করতে পারেন। আপনার মত ভদ্র ভাড়াটে পাওয়া অত্যন্ত আনন্দের' ভদ্রলোক বললেন। এরপর আমি না চাইতেই তিনি আমার ভাড়া কিছুটা কমিয়ে দিলেন। আমি আরও চাইছিলাম, তাই একটা টাকার অঙ্ক বলতেই তিনি বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নিলেন।

তিনি বিদায় নেবার সময় হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ঘর কি রকম সাজালে ভালো হয়?

আমি যদি অন্য ভাড়াটেদের কৌশলে ভাড়া কমাবার চেষ্টা করতাম, তাহলে আমি নিশ্চিত যে অন্যরা যেমন ব্যর্থ হয়েছেন আমিও তাই হতাম। আমার নির্দিষ্ট ওই বন্ধুত্বপূর্ণ, সহানুভূতিসম্পন্ন, প্রশংসাময় কথার জন্যেই জয়ী হলাম।

আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এবার একজন মহিলার ব্যাপার। তিনি লঙ আইল্যাণ্ডের গার্ডেন সিটির নামী সামাজিক এক মহিলা, নাম মিসেস ডরোথী ডে।

মিসেস ডে লিখেছিলেন, 'আমি সম্প্রতি কিছু বন্ধুকে এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করি। কাজটা আমার পক্ষে খুবই জরুরী ছিল। আমি সব কিছু ভালভাবে মিটুক তাই

চাইছিলাম। তাই নামকরা হোটেলের প্রধান পাঁচক এমিলকেই আমায় সাহায্য করার জন্য লাগাতাম। কিন্তু এবার সে আমায় ডুবিয়ে দিল। এমিলকে কোথাও পেলাম না। ভোজটা মোটেই ভালো হলো না। সে শুধু একজন পরিবেশনকারীকে পাঠিয়েছিল কাজের জন্য। লোকটার প্রথম শ্রেণীর কাজে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। সে আমার প্রধান মানী অতিথিকে সবার শেষে পরিবেশন করেছিল। একবার সে বেশ অখাদ্য খাবার মস্ত এক ডিসে পরিবেশন করলো তাঁকে। মাংসটাও বেশ শক্ত আর আলুগুলোও আঠালো। যাচ্ছেতাই ব্যাপার, আমি রেগে আগুন হয়ে গেলাম। প্রাণপণ চেষ্টায় কোন রকমে হাসিমুখে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলাম। কিন্তু মনে মনে বলতে লাগলাম, এমিলকে একবার পাই। মনের সুখে তাকে গায়ের ঝাল ঝাড়বো'।

ব্যাপারটা ঘটে বুধবার। পরের রাতেই মানবিক সম্পর্ক নিয়ে একটা বক্তৃতা শুনলাম। শুনতে শুনতে বুঝতে পারলাম এমিলকে গালাগাল দিয়ে কিছুই আসে যাবে না। এতে কেবল সে গম্ভীর হয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবে। এর ফলে ভবিষ্যতে তার কাছ থেকে আমি আর কোনরকম সাহায্য পাব না। আমি ব্যাপারটা তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে চাইলাম। সে খাবার কেনেনি বা রান্নাও করেনি। তার কিছু পরিবেশনকারী বোকা হওয়ার জন্য সে দায়ী নয়। সম্ভবত আমি একটু তাড়াহুড়ো করেই সব ভেবে বসেছিলাম। তাই তার সমালোচনা করার বদলে আমি বন্ধুত্বের স্বরেই কথা বলতে শুরু করলাম। আমি ঠিক করলাম ওর প্রশংসা করেই শুরু করবো। এইরকম ভঙ্গীতে চমৎকার কাজ হল। পরের দিন এমিলের সঙ্গে দেখা হল আমার। এমিল মনে মনে বেশ রেগে লড়াই করার জন্যেই তৈরি ছিল। আমি বললাম, 'দেখ, এমিল, তুমি হচ্ছে নিউ ইয়র্কের সবার সেরা পাঁচক। অবশ্য, আমি বুঝতে পারছি খাবার তুমি কেনোনি বা নিজে রান্নাও করোনি।

বুধবার যা ঘটেছে তার জন্য তুমি কোনভাবেই দায়ী নও। আমি চাই তুমি ভবিষ্যতে আমায় সাহায্য করবে।‘

সব মেঘ কেটে গেল। হাসলো এমিল, তারপর বললো সঠিক বলেছেন, মাদাম। গণ্ডগোলটা হয় রান্নাঘরে। এটা আমার দোষ নয়।

অতএব আমি বললাম, আমি অন্য এক পার্টির ব্যবস্থা করেছি, এমিল আমার ইচ্ছা তুমিই আমায় সাহায্য করো। আমি তোমার পরামর্শ চাই। তোমার কি মনে হয় ওই রান্নাঘরে আবার রান্না করতে দেব?’

‘ওহ্ নিশ্চয়ই, মাদাম, অবশ্যই। এরকম ভুল আর হবে না।’

পরের সপ্তাহে আমি আবার একটা মধ্যাহ্নভোজ দিই। এমিল আর আমি মেনু ঠিক করি। আমি আগের ভুলের একবারও উল্লেখ করিনি।

আমরা যখন উপস্থিত হলাম, দেখলাম খাবার টেবিলে দু ডজন চমৎকার লাল আমেরিকান গোলাপ ফুল রাখা আছে। সারাক্ষণই হাজির রইল এমিল। কুইন মেরী অথবা কাল-মহারাণীকে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করলেও সে বোধহয় এর চেয়ে বেশি যত্ন করতে পারত না। খাবারগুলো যেমন সুস্বাদু আর তেমনই গরম ছিল। পরিবেশনও চমৎকার। একজনের বদলে চারজন পরিবেশন করছিল। শেষ কালে এমিল নিজে আইসক্রীম পরিবেশন করল।

বিদায় নেবার সময় আমার নানা অতিথি বললেন, আপনি কি ওই পাঁচককে বশ করেছেন? এমন চমৎকার পরিবেশন আর যহ তিনি আগে কখনও দেখেন নি।

.

তিনি ঠিকই বলেছিলেন। আমি তাকে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার আর আন্তরিক প্রশংসা দিয়েই বশ করি।

অনেকদিন আগে আমি যখন খালি পায়ে গ্রামের স্কুলে যাওয়ার সময় মিসৌরীর উত্তর পশ্চিমের কোন জঙ্গল পার হতাম তখন সূর্য আর বাতাসের একটা নীতিগল্প পড়েছিলাম। তারা ঝগড়া করছিল দুজনের মধ্যে কার শক্তি বেশি তাই নিয়ে। বাতাস বলল, আমি প্রমাণ করতে পারি আমারই জোর বেশি। ওই কোট গায়ে বুড়ো লোকটিকে দেখছ। আমি বাজী রাখতে পারি তোমার চেয়ে তাড়াতাড়িই আমি ওর গায়ের কোট খোলাতে পারি।

সূর্য তখন মেঘের আড়ালে সরে গেল আর বাতাস এমন প্রচণ্ড বেগে বইতে লাগল যেন প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। কিন্তু বাতাস যতই জোরে বইতে শুরু করল বুড়ো লোকটি তার কোট ততই চেপে রাখতে চাইল।

শেষ পর্যন্ত বাতাস হতাশ হয়েই হাল ছেড়ে দিল। সূর্য তখন মেঘের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসে দয়ার্দ্র ভঙ্গিতে লোকিটর দিকে তাকিয়ে হাসলো। লোকটি তার কপাল মুছে নিয়ে গায়ের কোট খুলে ফেলল। সূর্য তখন বাতাসকে বলল তা আর দয়ার্দুভাবই ক্রোধ আর শক্তির চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী।

এই নীতিগল্প পড়ার সময় আমি ছেলেমানুষ থাকলেও এর সত্যতা বহুদূরের বোস্টন শহরে প্রমাণিত হয়ে চলেছিল। সংস্কৃতি আর শিক্ষার প্রাচীন যে জায়গাটা আমি স্বপ্নেও কোনদিন দেখব বলে ভাবিনি। এটা বোস্টনে হাতে কলমে দেখাচ্ছিলেন ড. এ. এইচ. বি। তিনি ছিলেন নামকরা একজন চিকিৎসক, ত্রিশ বছর পরে তিনি আমার ছাত্র হয়েছিলেন। এখানে ড. বি-এর বলা কাহিনী শোনাচ্ছি।

বোস্টনে সে সময় সংবাদপত্রে নানা ধরনের বাজে ডাক্তারী বিজ্ঞাপন প্রচুর পরিমাণে ছাপা হত। এইসব বিজ্ঞাপনে মানুষের নানা গোপন রোগ সারানোর কথা ফলাও করে লিখত আর তাদের আহ্বান জানাত। তারা পুরুষত্ব হারাবার ভয় দেখিয়ে আতঙ্কিত করত। তাদের চিকিৎসার পদ্ধতিই ছিল রোগীকে ভীত করে তোলা আর আসলে কোন রকম চিকিৎসাই না করা। এর ফলে বহু লোক মারাও যায়, কিন্তু এজন্য শাস্তি তেমন দেওয়া যায়নি। বেশির ভাগই সামান্য জরিমানা দিয়ে বা রাজনৈতিক প্রভাব খাঁটিয়ে ছাড়া পেয়ে যায়।

অবস্থাটা এমনই গুরুতর পর্যায়ে নেমে আসে যে বোস্টনের সৎ লোকজন একসঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। গির্জায় পাদ্রীরা বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন, খবরের কাগজের বিরুদ্ধেও বলে ঈশ্বরকে কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। নাগরিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী, মহিলা সমিতি, গির্জা, তরুণদের ক্লাব–সবাই এর বিরুদ্ধে কোন আইন প্রণয়ন সম্ভব হলো না, রাজনৈতিক চাপের ফলে। ডঃ বি-তখন ছিলেন বোস্টনের সৎ নাগরিক সমিতির চেয়ারম্যান। তাঁর সমিতি সব রকম চেষ্টাই করেছিল। এটা ব্যর্থ হয়। ওইসব ডাক্তার অপরাধীদের বিরুদ্ধে সব লড়াই-ই হতাশ বলেই মনে হতে থাকে।

তখন এক রাতে, প্রায় মাঝরাতের পর ডঃ বি–এমন কিছু করতে চাইলেন যা বোস্টনে আগে কেউ কখনও ভাবেনি। তিনি দয়ালুভাব, সহানুভূতি, আর প্রশংসা দিয়ে কাজ করতে চেষ্টা করলেন। তিনি চেষ্টা করলেন যাতে প্রকাশকরা ওই বিজ্ঞাপন প্রকাশ স্থগিত রাখতে চায়। তিনি 'দি বোস্টন হেরাল্ডে'র সম্পাদককে লিখলেন, কাগজটা তিনি কত ভালবাসেন। তিনি বরাবর এটাই পড়ে এসেছেন, খবরের অংশগুলি পরিচ্ছন্ন, উত্তেজনার ব্যাপারে থাকে না, সম্পাদকীয় তো চমৎকার। কাগজটি পরিবারে পক্ষে আদর্শ। ডঃ বি-জানান যে তাঁর মতে কাগজটি নিউ ইংল্যাণ্ড আর এমন কি আমেরিকার মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। তিনি লেখেন, 'আমার এক বন্ধুর একটি অল্প বয়সের মেয়ে আছে। সে সেদিন একটা বিজ্ঞাপন জোরে জোরে পড়ে তার কিছু অর্থ জানতে চায়! সত্যিই আমার বন্ধুটি একটু বিহ্বল হয়ে পড়েন, কি বলবেন বুঝতে পারেন না। আপনাদের কাগজ বোস্টনের সেরা পরিবারেই যায়। আমার একজন বন্ধুর পরিবারেই যদি এইরকম ঘটে তাহলে আরও কত বাড়িতে যে ঘটছে কে জানে? আপনার যদি কোন অল্পবয়সী মেয়ে থাকে তাহলে কি চাইবেন সে ওই পড় ক? আর পড়ে সে ওই রকম প্রশ্ন করলে কি উত্তর দেবেন?

আমি দুঃখিত যে আপনাদের এমন সুন্দর কাগজ-সবদিক দিয়েই যা আদর্শ–তাতে দেওয়া এমন বিজ্ঞাপন দেখে সবাই আতঙ্কিত। এটাও কি সম্ভব নয় আমার মত আরও পাঠক একই ভয় পাচ্ছেন?'

দুদিন পরে বোস্টন হেরাল্ডের প্রকাশক ডঃ বি কে একটা চিঠি লিখেছিলেন। ডঃ বি–চিঠিখানা আমার ক্লাসে যোগদান করে আমাকে দেন। ডঃ বি-সেটা প্রায় ত্রিশ বছর

রেখেছিলেন। সেটা এই কাহিনী লেখার সময় আমার সামনেই রয়েছে। এই চিঠির তারিখ হলো ১৩ই অক্টোবর ১৯০৪।

এ. বি. এইচ–, এম. ডি.
বোস্টন, মাস।
প্রিয় মহাশয়,

আপনার এ মাসের ১১ তারিখের চিঠির জন্যে আমি অত্যন্ত বাধিত। আপনি সম্পাদককে চিঠিটি লিখলেও আমিই জবাব দিচ্ছি। এই কাগজের তত্ত্বাবধানে থাকার পর থেকেই একটি সিদ্ধান্ত নেবার কথা আমাকে চিন্তা করতে হচ্ছিল।

সোমবার থেকে দি বোস্টন হেরাল্ডে সবরকম আপত্তিকর বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। কোন রকম বাজে ডাক্তারি বিজ্ঞাপন আর কোন ভাবেই প্রকাশ করা হবে না। যে সব বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে তা সংশোধন ও পরীক্ষা করেই ছাপা হবে।

আবার আপনাকে আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ জানাই। এ চিঠি আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছে।

আপনার বিশ্বস্ত,
ড. এ. ন্যাসকেল
প্রকাশক।

.

ঈশপ ছিলেন একজন গ্রীক ক্রীতদাস। তিনি ক্রোসাসের রাজসভায় থেকে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৬০০ বছর আগে অমর কিছু নীতি গল্প লিখেছিলেন। তা সত্ত্বেও যে সত্য তিনি মানব চরিত্র সম্পর্কে লিখে গেছেন তা আজ এথেন্সের ২৫ শতক পরেও বোস্টন বা বার্মিংহামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সূর্য ঢের বেশি তাড়াতাড়ি আপনার কোট খুলে নিতে পারে–তেমনই আবার দয়ার্দ্রতা, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার বা প্রশংসা ও অন্যান্য যে কোন উপায়ের চেয়ে ঢের দ্রুত কাজ করে মানুষের মন পরিবর্তন করতে পারে।

লিঙ্কন কি বলেছিলেন মনে রাখবেন : ‘এক ফোঁটা মধু এক গ্যালন তেতো জিনিসের চেয়ে বেশি মাছিকে আকর্ষণ করে।’

যখন মানুষকে নিজের মতে আনতে চাইবেন তখন চার নম্বর নীতিটি ভুলবেন না :

‘বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার দিয়েই শুরু করবেন।‘

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সক্রেটিসের রহস্য

মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় যে সব ব্যাপারে আপনার মতের মিল হবে না কখনই সেইরকম কিছু দিয়ে শুরু করবেন না। প্রথমেই যে বিষয়ে আপনার মতের মিল হয় তা দিয়েই আরম্ভ করে বার বার সেটাই বলতে থাকুন বারবার জানান মোটামুটি সব ব্যাপারই আপনাদের মত একুই, শুধু উপায় সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে।

অন্য লোকটিকে গোড়াতেই ‘হ্যাঁ’ বলতে দিন। যতদূর সম্ভব তাকে ‘না’ বলতে দেবেন না।

এ ব্যাপারে অধ্যাপক ওভারস্ট্রীট তার বই ‘ইনফ্লুয়েন্সিং হিউম্যান বিহেভিয়ার’-এ বলেছেন যে, ‘না’ কথাটা একবার বললে তাকে কাটানো কঠিন কাজ। কোন লোক না বললে তার সব আত্ম অহমিকাই তাকে ওটাই আঁকড়ে থাকতে বলে। সে হয়তো পরে বুঝতে পারে ‘না’ বলাটা ঠিক হয়নি। তা সত্ত্বেও তার অহমিকাই তাকে তার মত বদলাতে দেয় না। একবার কিছু বললে সে সেটাই আঁকড়ে থাকতে চায়। তাই এটা অত্যন্ত জরুরী যে আমরা কাউকে সায় দেয়াতে পারলেই ভাল।

যারা দক্ষ বক্তা তারা গোড়াতেই বার কয়েক ‘হ্যাঁ’ বলাতে পারেন। তিনি এতে তাঁর শ্রোতাদের মানসিক দিক থেকে স্বমতে আনার পথেই নিয়ে আসেন। এটা অনেকটা

বিলিয়ার্ড বলের মত। বলটাকে জোরে ধাক্কা মারুন। সেটা একদিকে ধাক্কা খেয়ে সহজেই বিপরীত দিকে চলে যায়।

এতে মনস্তাত্বিক ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যায়। কোন লোক যখন 'না' বলে, সে ওই ছোট্ট কথাটার চেয়ে অনেক বেশি কিছুই করে। তার সমস্ত শারীরিক যন্ত্রই, স্নায়ু, পেশী–সব কিছুই বাতিল করতে তৈরী থাকে। সাধারণতঃ ক্ষুদ্র হলেও শারীরিক যেসব পরিবর্তন হয় তার কিছু প্রকাশ প্রত্যক্ষও করা যায়। শরীরের সমস্ত রকম অনুভূতিই বাধা দিতে যেন তৈরি হয়ে যায়। অন্যদিকে কেউ 'হ্যাঁ' বললে ওই বাধা দেবার ব্যাপারটার অস্তিত্বই থাকে না। সমস্তই শরীরের কোষগুলো গ্রহণ করার জন্য এগুতে চায়। তাই গোড়াতেই 'হ্যাঁ' বললে আমরা সহজেই অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও সফল হতে পারি।

এই ব্যাপারটা–অর্থাৎ এই হ্যাঁ বলা কৌশল খুবই সহজ ব্যাপার। অথচ এটাকে কতটাই বা অবজ্ঞা করা হয়। এতে যেন মনে হয় মানুষ গোড়াতেই যেন অন্যকে ক্রুদ্ধ করে নিজের গুরুত্ব প্রমান করার প্রয়াসী। বিপ্লবীদের সঙ্গে রক্ষণশীলদের কথাবর্তায় গোড়াতেই তারা একে অন্যকে চটিয়ে দেয়। এতে কি ভালো কাজ সমাধা হতে পারে? যদি অবশ্য কিছুটা আনন্দ উপভোগের জন্য করতে চান তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু সে যদি এটা করে কিছু করতে চায় তাহলে তাকে মনস্তাত্বিক দিক থেকে একেবারে মূর্খই বলতে হয়!

কোন ছাত্র, ক্রেতা, শিশু, স্বামী বা স্ত্রীকে গোড়াতেই 'না' বলতে দিন, দেখবেন হাজার ধৈর্য বা অধ্যবসায়তেও তাকে আর নিজের মতাবলম্বী করতে পারবেন না।

এই 'হ্যাঁ হ্যাঁ বলার কৌশলে নিউইয়র্কের গ্রীনউইচ সেভিংস ব্যাঙ্কের জেমস এভারসন একজন বিখ্যাত মক্কেলকে হারাতে হারাতে আবার স্বমতে এনেছিলেন।

ঐ ভদ্রলোক ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে এসেছিলেন। মিঃ এভারসন লিখেছিলেন, আমি তাকে একটা ফরম ভর্তি করতে দিয়েছিলাম। কোন কোন প্রশ্নের তিনি আনন্দেই উত্তর লিখলেন, তবে কয়েকটার উত্তর তিনি কিছুতেই দিতে রাজি হলেন না।

মানবিক সম্পর্ক নিয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করার আগে, আমি হয়তো বলতাম যে তিনি যদি ব্যাঙ্ককে এইসব জবাব না দেন তাহলে তার অ্যাকাউন্ট খুলতে আমরা অপারগ। আমি বলতে লজ্জা পাচ্ছি অতীতে এই কাজই আমি করেছি। স্বভাবতই ওই রকম শেষ কথা বলে আমি বেশ আনন্দ পেতাম। আমি তাদের দেখাতাম আসল কর্তা কে আর ব্যাঙ্কের নিয়ম বদলানো যাবে না। কিন্তু ওই ধরনের মনোভাবকে নিশ্চয়ই যে আমাদের সাহায্য করতে চায় সে গ্রহণ করবে না।

'আমি আজ সকালে ঠিক করলাম একটু বুদ্ধিমানের মত কাজ করব। আমি স্থির করলাম ব্যাঙ্ক কি চায় সে সম্পর্কে কথা না বলে আমাদের মক্কেল কি চান তাই নিয়ে কথা বলব। আর সবার উপরে আমি তাকে 'হ্যাঁ' বলাতেই চাইবো একদম গোড়া থেকেই। অতএব আমি তার সঙ্গে একমত হলাম। আমি তাকে জানালাম যে খবর তিনি দিতে অনিচ্ছুক সেগুলো তেমন প্রয়োজন নেই।

যাইহোক আমি বললাম, ধরা যাক আপনার মৃত্যুর পর এই ব্যাঙ্কে টাকা রয়ে গেল। আপনি কি চাইবেন না সে টাকা ব্যাঙ্ক আপনার উত্তরাধিকারীকে দিক?

'হ্যাঁ, তা অবশ্যই চাইব', তিনি বললেন।

'তা বলে কি চাইবেন না। আপনি তার নামটা আমাদের জানাতে, যাতে আমরা দ্রুত কাজ করতে পারি?'

'আবার তিনি বললেন 'হ্যাঁ'।

'তরুণ লোকটির মনোভাব একেবারেই বদলে গেল যখনই তিনি বুঝতে পারলেন খবরগুলো আমরা আমাদের জন্যে চাইছিনা বরং তারই জন্য চাই। ব্যাঙ্ক ত্যাগ করে যাওয়ার সময় শুধু যে সমস্ত খবরই দিলেন তাই না তিনি একটা ট্রাষ্ট অ্যাকউন্টও খুললেন তার মাকে উত্তরাধিকারী করে। আর তার মার সম্বন্ধে স্বইচ্ছাতেই সব খবর দিয়ে দিলেন।

আমি বললাম তাকে হা' বলাতে পেরে একেবারে গোড়াতেই তিনি সব বিরোধিতা ভুলে গেলেন আর এর পরিসমাপ্তি সুখকরই হলো।

'আর একটা প্রতিষ্ঠান একজন মক্কেলকে তাদের পণ্য বিক্রী করতে চাইছিলেন', বলেছেন ওয়েটিংহাউসের একজন সেলসম্যান জোশেফ অ্যালিসন। আমার পূর্বসূরী দশ বছর চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেন নি। আমার হাতে যখন ওই এলাকার দায়িত্ব এলো, আমি তিন বছর চেষ্টা চালালাম কিন্তু কোন অর্ডার পেলাম না। শেষ পর্যন্ত তের বছরের চেষ্টায় আমরা তাঁকে কয়েকটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র বিক্রি করতে পারলাম। এটা যদি হতে পারে তাহলে আরও কয়েক শ নিশ্চয়ই এবার বিক্রি করতে পারব ভাবলাম।'

তাই পরের সপ্তাহে যখন গেলাম বেশ উচ্চ ধারণাই আমার ছিল। অবশ্য এ ধারণাটা আর রইলো না যে মুহূর্তে তাঁদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার আমাকে অভ্যর্থনা করে বললেন : 'অ্যালিসন, তোমাদের বাকি বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশগুলো আমরা নিতে পারবো না। আমি প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম।

'কেন? আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম। কেন?'

'কারণ তোমাদের মোটরগুলো অত্যন্ত গরম হয়ে যায়। আমি হাত রাখতে পারি না।'

'আমি জানতাম এক্ষেত্রে তর্ক করে কোন লাভ হবে না। এভাবে আগেও চেষ্টা করে দেখেছি, এত কোন কাজ হয় না। অতএব আমি ঠিক করলাম 'হ্যাঁ হ্যাঁ' বলে দেখবো।

'বেশ, মিঃ স্মিথ', আমি বললাম। আমি আপনার কথা শতকরা একশ ভাগই মেনে নিচ্ছি। ওই মোটরগুলো যদি সত্যিই গরম হয়ে ওঠে কখনই তা কেনা উচিত নয়। আপনি নিশ্চয়ই সেই সব মোটর কিনবেন যেগুলো মোটর তৈরির কানুন অনুযায়ী যে মান নির্দিষ্ট করে বানানো হয়, তাই না?

তিনি স্বীকার করলেন। আর প্রথম হ্যাঁ বললেন।

'বৈদ্যুতিক মোটর তৈরি সমিতির নিয়ম হলো তাপমাত্রার উপর কোন মোটর ৭২ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। ঠিক কি না?

'হ্যাঁ', তিনি স্বীকার করলেন। সেটা ঠিক। তবে তোমাদের মোটর আরও গরম হয়ে যায়।

আমি তার সঙ্গে কোন রকম তর্ক করলাম না। আমি শুধু শুনতে চাইলাম আপনাদের কারখানার ঘর কি রকম গরম?

'ওহ, তিনি বললেন, প্রায় ৭৫ ডিগ্রী ফারেনহাট।'

বেশ, আমি বললাম, ঘরের তাপমাত্রা যদি ৭৫ ডিগ্রী হয় আর তার সঙ্গে যদি আরও ৭২ ডিগ্রী যোগ করেন তাহলে মোট দাঁড়ায় ১৪৭ ডিগ্রী ফারেনহাইট। তাহলে ধরুন ১৪৭ ডিগ্রীতে যদি হাত রাখেন তা হলে হাতে প্রচণ্ড গরম লাগবে না?'

আবার তাকে 'হ্যাঁ', বলতে হলো।

বেশ, আমি জানালাম, 'মোটরগুলোয় হাত না দিলেই ভালো হয় না কি?'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তেমার কথাই ঠিক', তিনি স্বীকার করলেন। আমরা এরপর বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলার পর তিনি সেক্রেটারিকে ডেকে প্রায় আরও ৩৫০০০ হাজার ডলারের অর্ডার ওই মাসের জন্য দিলেন।

'বহু লক্ষ টাকার ব্যবসা নষ্ট করার পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তর্ক করে কোন ফল লাভ হয়। আসল প্রয়োজন হলো হ্যাঁ বলানো!'

সক্রেটিস ছিলেন এথেন্সের একজন তার্কিক মানুষ। চল্লিশ বছরের টাক মাথা মানুষ হয়েও তিনি উনিশ বছরের একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। তা সত্ত্বেও তিনি যা করে গেছেন ইতিহাসে কম মানুষই তা পেরেছেন। তিনিই মানুষের চিন্তাধারায় একটা

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেন, আর আজ তাঁর মৃত্যুর তেইশ শতাব্দী পরেও তাকে সম্মান জানানো হয় মানবের চিন্তাধারার চরম বিপ্লববাদী পরিবর্তনকারী জ্ঞানী বলে।

তাঁর কৌশলটা কেমন ছিল? তিনি কি সবাইকে বলতেন তারা ভুল করছে? ওহ্ না, সক্রেটিস এরকম করার মানুষ ছিলেন না। তিনি ঢের বেশি কৌশলী ছিলেন। তাঁর পুরো কৌশলের নাম সক্রেটিসের পদ্ধতি। এর মূলে ছিল মানুষকে প্রথমেই 'হ্যাঁ', 'হ্যাঁ' বলিয়ে নেওয়া। তিনি এমন প্রশ্ন করতেন যাতে তার বিরোধীকে 'হ্যাঁ', হ্যাঁ', বলতে হতো। এরপর ক্রমাগত তিনি তাকে সব স্বীকার করিয়ে নিতেন। বিরোধীরা হা' বলতে বলতে এমন অবস্থায় আসত যে তারা দেখতে ক'মিনিট আগে তারা যার বিরোধিতা করছিল এখন তাকেই সমর্থন করছে।

এরপর কাউকে সে ভুল করছে আখ্যা দেওয়ার আগে তখন খালি সক্রেটিসের কথাটা মনে রাখা দরকার। চীনাদের বেশ প্রাচীন একটা প্রবাদ আছে : 'যে শান্তভাবে চলে সে ঢের দূর যায়। পাঁচ হাজার বছরের অভিজ্ঞতাই তাদের এ জ্ঞান দিতে পেরেছে।

অতএব যদি মানুষকে স্বমতে আনতে চান তাহলে পাঁচ নম্বর নিয়ম হলো :

'অপর ব্যক্তিকে গোড়াতেই 'হ্যাঁ' বলিয়ে নিন।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অভিযোগের সাবধানতা

বেশির ভাগ মানুষই অন্যদের স্বমতে আনতে গিয়ে বড় বেশি রকম কথা বলেন। বিশেষ করে সেলসম্যানরা এই দোষে দোষী। অন্যদের কথা বলতে দিন। নিজের ব্যাপার আপনার চেয়ে অবশ্যই তিনি ভালো জানেন। অতএব তাকে প্রশ্ন করুন। তাকে কিছু বলতে দিন।

আপনার সঙ্গে তাঁর মতের মিল না হলে আপনি হয়তো বাধা দিতে চাইবেন। কিন্তু তা করবেন না। এটা মারাত্মক। তিনি আপনার কথায় কানই দেবেন না যতক্ষণ না তিনি নিজের কথাটা বলতে পারছেন। অতএব ধৈর্য ধরে শুনে যান আর মন ভোলা রাখুন। একটু আন্তরিকতা রাখাও চাই। অপরকে তাঁর মনোভাব খুলে বলতে সুযোগ দিন।

ব্যবসার ক্ষেত্রে এই কৌশল কাজে আসবে? দেখা যাক। এখানে এমন একজনের কথা উল্লেখ করছি যাকে এটা জোর করেই করান হয়।

কয়েক বছর আগে আমেরিকার অন্যতম এক মোটর গাড়ি তৈরির প্রতিষ্ঠানের মোটর গাড়ি সাজানোর কিছু মালমশলার দরকার হয়। তিনটি বড় প্রতিষ্ঠান-এর জন্য কিছু কাপড়ের নমুনা তৈরি করেন। এগুলো সবই মোটর কোম্পানীর পদস্থ কর্মীরা পরীক্ষা করেন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে এবার জানানো হয় তারা যেন নির্দিষ্ট কোন দিনে ওই জিনিসের অর্ডার পাওয়ার জন্য আবেদন করে।

এক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জি. বি. আর, প্রচণ্ড রকম গলা ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে এসে পৌঁছলেন। মোটর প্রতিষ্ঠানের পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে দেখা করার সময় আসতেই, মি. আর-আমার ক্লাসে বলেছিলেন, 'আমার কথা বলার শক্তি ছিল না, গলার স্বর বন্ধ। ফিসফিসও করতে পারছিলাম না। আমাকে যে কামরায় নিয়ে যাওয়া হল সেখানে টেকসটাইল ইঞ্জিনিয়ার, পারচেজিং এজেন্ট, সেলসের প্রধান আর কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি হলাম। আমি উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে কথা বলতে চাইলেও একটু শব্দ ছাড়া কিছুই করতে পারলাম না।

'তাঁরা সবাই আমার সামনে একটা টেবিলের ওপাশে উপবিষ্ট ছিলেন তাই আমি এটা কাগজে লিখে দিলাম : ভদ্র মহোদয়গণ আমার কথা বলার শক্তি নেই। আমি বাকশক্তিহীন।'

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আমিই আপনার হয়ে কথা বলছি।' তিনি আমার নমুনাগুলো দেখিয়ে সেগুলোর প্রশংসা করলেন। বেশ চমৎকার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তিনি আমার জিনিসের গুণাগুণ বুঝিয়ে দিলেন। আর প্রেসিডেন্ট যেহেতু আমার হয়ে কথা বলছিলেন তাই আমার পক্ষ নিলেন। আমি কেবল একটু হেসে মাথা নাড়তে থাকলাম। আর কিছু করিনি।

ওই আশ্চর্য সভার পর আমাকেও সরবরাহের দায়িত্ব দান করা হলো, যার অর্থ আমাকে প্রায় ১,৬০০,০০০ ডলারের কাপড় অর্ডার দেয়া হল, আমার জীবনের সব চেয়ে বড় অর্ডার।

‘আমি জানতাম আমার গলার স্বর বন্ধ না হয়ে গেলে ওই অর্ডার আমি পেতাম না যেহেতু আমার কতগুলো ভুল ধারণা ছিলো। আমি আচমকা আবিষ্কার করলাম দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে কি রকম কাজ হতে পারে অপরকে যদি শুধু কথা বলতে দেওয়া হয়।’

ফিলাডেলফিয়া ইলেকট্রিক কোম্পানীর যোশেফ এস, ওয়েব ঠিক এই আবিষ্কার করেন। মিঃ ওয়েব পেনসিলভানিয়ার ওলন্দাজ কৃষকদের গ্রামে ভ্রমণ করছিলেন।

‘এরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে না কেন?’ মিঃ ওয়েব জেলার প্রতিনিধিকে ভ্রমণের সময় প্রশ্ন করলেন।

‘এরা অদ্ভুত মানুষ। ওদের কিছুই বিক্রি করতে পারবেন না, বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন জেলার প্রতিনিধি। তাছাড়া ওরা আবার কোম্পানীর উপর চটে আছে। আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু সব বৃথা।

তা হতে পারে ভাবলেন মিঃ ওয়েব। তবুও তিনি একবার চেষ্টা করবেন ঠিক করে খামারবাড়ির দরজায় ধাক্কা মারলেন। দরজাটা একটু ফাঁক হলো, আর বৃদ্ধা মিসেস ড্রাকেব্রড মুখ বের করলেন।

‘তিনি যেই আমাদের প্রতিনিধিকে দেখতে পেলেন অমনি দরজাটা বন্ধ করে দিলেন মিঃ ওয়েব

see ঘটনার কথা আমাদের এইভাবেই বলেন। আমি আবার ধাক্কা মারলাম। অনেকক্ষণ পরে তিনি আবার দরজা খুলে আমাদের কোম্পানী আর আমাদের তিনি কি ভাবেন সেটাই বললেন।

'মিসেস ড্রাকেড', আমি বললাম, আমি দুঃখিত যে আমরা ঝামেলায় সৃষ্টি করছি। তবে এবার আমি বিদ্যুৎ বেচতে আসিনি। আমি কটা ডিম চাইছিলাম।'

তিনি দরজাটা আর একটু ফাঁক করে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন।

'আমি আপনার চমৎকার কটা ডমিনিক জাতের মুরগী দেখলাম, আমি বললাম। তাই কয়েক ডজন টাটকা ডিম কিনতে চাই।'

দরজা আরও একটু খুলল। আপনি কি করে জানলেন এগুলো ডমিনিক জাতের?' ভদ্রমহিলার আগ্রহ জেগে উঠলো।

আমি জবাব দিলাম আমি নিজে যে মুরগি পালন করি, আমাকে স্বীকার করতেই হবে এমন চমৎকার ডমিনিক মুরগী আর দেখিনি।

তাহলে নিজের ডিম ব্যবহার করেন না কেন? ভদ্রমহিলার তবুও সন্দেহ গেল না।

কারণ আমার লেগহর্ণগুলো সাদা ডিম পাড়ে। আর আপনার অবশ্যই জানা আছে সাদা ডিমের চেয়ে লাল ডিম কেক তৈরির পক্ষে ভালো। আমার স্ত্রী আবার চমৎকার কেক বানান।

ইতিমধ্যে মিসেস ড্রাকেড বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন, বেশ ভালো মন নিয়েই। ইতিমধ্যে আমি চারিদিকে তাকিয়ে চমৎকার একটা ডেয়ারী দেখতে পেলাম।

'আমার কিন্তু মনে হয়', আমি এবার বললাম, আমি বাজি ধরতে পারি আপনি আপনার স্বামীর ডেয়ারীর চেয়ে এই মুরগীর থেকে ঢের বেশি রোজগার করেন।

ব্যাস্! আর বলতে হলো না। নিশ্চয়ই তিনি বেশি আয় করেন এবং আমাকে সেটা বলতেও চাইলেন। তবে দুঃখের কথা তার স্বামীর মোটা মাথায় তা ঢোকে না।

তিনি আমাদের তার মুরগীর খোঁয়াড়ে নিয়ে গেলেন। পরীক্ষা করে দেখতে পেলাম মহিলা নানা ধরনের সব ব্যবস্থা গড়েছেন। আমি সে সব দেখে খুব প্রশংসা করতে লাগলাম বেশ আন্তরিকভাবে। আমি কিছু খাবার আর তাপের উপদেশও দিলাম এবং মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম কিছু বিষয়। অচিরেই বেশ আলাপ জমে উঠলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মন্তব্য করলেন, তার কিছু প্রতিবেশী বিদ্যুতের আলো মুরগীর খাঁচায় ব্যবহার করে বেশ সুফল পেয়েছেন। তিনি আমার কাছে আন্তরিকভাবে জানতে চাইলেন এটা তিনি ব্যবহার করবেন কিনা ...।

দু সপ্তাহ পরে মিসেস ড্রাকেডের মুরগির খোঁয়াড়ে মুরগিগুলো আনন্দে কঁকর কে করে চলেছিলো। আমিও অর্ডার পাই আর তিনিও বেশ ডিম পেতে থাকেন। প্রত্যেকেই সুখী, প্রত্যেকেরই লাভ হয়েছে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

কিন্তু কাহিনীটির উদ্দেশ্য হলো–ভদ্রমহিলাকে কিছুতেই বিদ্যুৎ বিক্রি করতে পারতাম না যদি প্রথমে আমি তাকে বিদ্যুৎ বিক্রি করার কথা বলতাম। তাকে তাই তাঁর কথাই বলতে দিই।

এ ধরনের মানুষকে কিছুতেই বিক্রি করা যায় না! তাদের কিনতে দিতে হবে। সম্প্রতি নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনে অর্থনৈতিক পাতায় একটা বড় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। তাতে একজন অসামান্য যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক চাওয়া হয়। চর্লি, টি কুবেলিশ ওই বিজ্ঞাপনের উত্তর একটা বক্স নম্বরে পাঠান। কদিন পরে তাকে একটা চিঠিতে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। তিনি যাওয়ার আগে ওয়াল স্ট্রীটে খোঁজ নিয়ে জেনে নেন ভদ্রলোকের সম্বন্ধে সব কিছু। সাক্ষাৎকারের সময় কুবেলিশ বললেন, আপনার মত এরকম বিরাট সুনামের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে পারলে সৌভাগ্যবান বলে মনে করবো। আমি শুনেছি আঠাশ বছর আগে আপনি মাত্র একটা ডেস্ক আর একজন স্টেনোগ্রাফার নিয়ে শুরু করেছিলেন। এটা সত্যি?

প্রায় প্রত্যেক মানুষই অতীতের স্মৃতিচারণ করতে ভালোবাসেন। ভালোবাসেন তার আগের লড়াইয়ের কথা ভাবতে। এই লোকটিও এর চেয়ে আলাদা ছিলেন না। তিনি অনেকক্ষণ ধরে জানালেন তিনি মাত্র সাড়ে চারশ ডলার আর একটা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। তিনি জানালেন তিনি কেমন করে হতাশা আর অপমানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন আর টানা ষোল ঘন্টা ধরে কাজ করেছেন। কাজ করেছেন রবিবারেও। তিনি বললেন কীভাবে তিনি ওয়াল স্ট্রীটের সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষ হন। এ ধরনের রেকর্ডের জন্য তিনি গর্বিত। এতে তার অধিকার আছে।

শেষ পর্যন্ত তিনি মি. কুবেলিশকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করলেন, তারপর একজন ভাইস প্রেসিডেন্টকে ডেকে বললেন : আমার মনে হয় এমন একজনকেই আমরা খুঁজছিলাম।'

মিঃ কুবেলিশ বেশ সহজভাবেই তার ভবিষ্যৎ নিয়োগকর্তার সম্পর্কে সব বিষয় জেনে নিয়েছিলেন আর তাঁর সমস্যা সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি অপর জনকেই সব কথা বলতে দেন—আর বেশ চমৎকার ধারণাও সৃষ্টি করেছিলেন।

আসল সত্য হলো আমাদের বন্ধুরাও নিজের সম্পর্কে অহঙ্কার করতে ভালবাসে। আমার কোন অহঙ্কার তারা শুনতে চায় না।

একজন ফরাসী দার্শনিক লা রোশফুঁকো বলেছিলেন : আপনি যদি শত্রু চান তাহলে গুণে বন্ধুদের অতিক্রম করুন। আর যদি বন্ধু চান তাহলে তাদের আপনাকে অতিক্রম করতে দিন।

কথাটা সত্যি কেন? কারণ আমাদের বন্ধুরা যখন আমাদের অতিক্রম করে থাকেন তখন তাঁদের গুরুত্ব অনুভব করতে দিই, আর আমরা যখন অতিক্রম করি তখন তাদের একটা হীনমণ্যতা চেপে ধরে, সঙ্গে ঈর্ষা।

জার্মানদের একটা প্রবাদ আছে। সেটা হলো এই রকম : 'অন্য লোকদের বিপদে আমরা যে আনন্দ পাই তা হলো আসল আনন্দ।' বা অন্যভাবে বললে : অন্যের বিপদেই আমরা আসল আনন্দ পাই।

হ্যাঁ, আপনাদের কোন কোন বন্ধু আপনাদের ঝামেলায় যত বেশি আনন্দ পান আপনাদের সুখে তত পান না।

অতএব, আমাদের জয়কে কম করেই দেখাই আসুন। আমরা নম্র হই আসুন। তাতে সব সময়েই কাজ হবে। আর্ভিন কবের আসল কৌশলটা জানা ছিল। একজন আইনজ্ঞ কবকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় বলেন : আমি শুনেছি আপনি আমেরিকার একজন বিখ্যাত লেখক, মি. কব। এটা সত্যি?

'আমার যোগ্যতার চেয়ে আমি আশাতীত পেয়েছি, কব জবাব দেন।

আমাদের নম্র হওয়া উচিত, কারণ আমার বা আপনার তেমন দর নেই। আগামী এক শতকের মধ্যেই আমাদের সবাই একেবারে ভুলে যাবে। নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করার ক্ষেত্রে আমাদের জীবন বড়ই ক্ষণস্থায়ী। তাই অন্যকে কথা বলতে দিন। ভেবে দেখুন সত্যিই বড় করে বলার মত আমাদের কিছু আছে কি? আপনার সঙ্গে একজন মূর্খের পার্থক্য কতটা জানেন? বেশি নয়, থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডে এক নিকেল মাপের আয়োডিন। কোন চিকিৎসক আপনার থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড থেকে ওই আয়োডিন বের করে নিলে আপনি একজন বোকা লোক হয়ে যাবেন। এই সামান্য আয়োডিনই সব বদলে নিতে পারে। তাই গর্ব করে লাভ কি বলুন?

অতএব, অপরকে স্বমতে আনতে চাইলে ৬ নম্বর নিয়ম হল :

'অপর ব্যক্তিকেই বেশি কথা বলতে দিন।'

www.bengaliebook.com

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সহযোগিতা পাওয়ার উপায়

আপনি নিজে যা আবিষ্কার করেন তার উপর আপনার বেশি বিশ্বাস আছে না অন্যে যা আপনাকে জানায় তার উপর? তাই যদি হয় তাহলে অন্যের উপরে নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়া কেন? স্পষ্ট না বলে অন্যকে আভাস দেওয়াই ভালো-তাতে অন্যকে সিদ্ধান্তটা নিজেকেই আবিষ্কার দেওয়া হয়।

যেমন উদাহরণ দিচ্ছি : ফিলাডেলফিয়ার মি. অ্যাডলফ সেলঞ্জ, যিনি আমার পাঠগ্রহণ করেন। আচমকা তার মোটর গাড়ি অদ্যুৎসাহী সেলসম্যানদের মধ্যে একটু উৎসাহ জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তিনি সেলসের একটা সভা ডেকে তাদের কাছ থেকে জানতে চান তারা তার কাছে কি চান। তাঁরা কথা বলতে আরম্ভ করতেই তিনি তাঁদের বক্তব্য ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে থাকেন। তিনি তারপর বললেন : 'আপনারা আমার কাছে যেসব গুণ চান তাই পাবেন। এবার আমাকে বলতে দিন আমি আপনাদের কাছে। কি আশা করি।' উত্তর বেশ দ্রুতই এল : বশ্যতা, সততা, কর্মচেষ্টার সাধুতা, দলগত কাজ, সারাদিন আট ঘন্টা কাজ। একজন নিজে থেকেই চৌদ্দ ঘন্টা কাজ করার প্রস্তাব দেয়। সভা এবার নতুন উদ্যম, নতুন আশা নিয়ে এলো আর মি. সেলঞ্জ আমাদের জানান বিক্রি এরপর দারুণ বেড়ে যায়।

মিঃ সেলঞ্জ জানান তার কর্মীরা তার সঙ্গে একটা নৈতিক দেয়া নেয়ার ব্যবস্থা করে। তারা যতদিন তার মতে চলেছে তাতে কাজ হয়নি। পরে তাদের মতামত নিতেই সব বদলে যায়। তাদের ইচ্ছেটা। মেনে নিতেই ব্যবস্থা বদলে যায়।

কোন মানুষই ভাবতে চায় না তাকে কিছু বিক্রি করা হয়েছে বা তাকে কিছু করতে বলা হয়েছে। আমরা ভাবতে ভালোবাসি আমরা নিজেরাই কিনতে চাই বা আমাদের নিজের মতলবেই কাজ করতে চাই। আমরা নিজেদের ইচ্ছা বা চাহিদা সম্বন্ধে নিজেরাই আলোচনা করতে চাই।

যেমন ধরুন ইউনিয়ন ওয়েসনের ব্যাপারটা ধরুন। এই সত্যটা আবিষ্কার করার আগে তিনি লক্ষ লক্ষ ডলার লোকসান দেন। মিঃ ওয়েসন কাপড় তৈরির প্রতিষ্ঠানের নকশার জন্যে ছবি আঁকতেন। মি. ওয়েসন তিন বছর ধরে প্রতি সপ্তাহেই ওই প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করেছেন কিন্তু তিনি কিছুই কেনেননি। তিনি বারবার মিঃ ওয়েসনের ছবি দেখে জানান, না, ওতে কাজ হবে না।

দেড়শ বারের মত ব্যর্থ হবার পর ওয়েসন বুঝতে পারলেন তাঁর নিজের মাথাতেই বোধ হয় গলদ রয়ে গেছে। এরপর একদিন সন্ধ্যায় তিনি মানবিক ব্যবহার নিয়ে ভাবতে বসলেন যাতে নতুন কোন ভাবনার ফল হয়।

এবার তিনি একটা নতুন পথে এগুবেন ঠিক করলেন। তিনি শিল্পীদের আঁকা অসমাপ্ত কিছু নকশা নিয়ে ক্রেতার অফিসে হাজির হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি বললেন :

'আমাকে একটু সাহায্য করবেন আশা করি। এখানে কতকগুলো অসমাপ্ত নকশা আছে : এগুলো কিভাবে শেষ করলে আপনাদের পছন্দ হবে একটু বলবেন?

ক্রেতা বেশ কিছুক্ষণ ছবিগুলো লক্ষ্য করে বললেন : 'এগুলো কদিনের জন্য আমার কাছে রেখে যান ওয়েসন। পরে দেখা করবেন।'

ওয়েসন তিনদিন পরে দেখা করতেই সেগুলো পরামর্শসহ ফেরত পেলেন। তারপর ক্রেতার ধারণা অনুযায়ী সব শেষ করলেন। ফল কি হলো? সব কটিই গৃহীত হল।

এ হলো ন'মাস আগেকার কথা। এরপর থেকে ক্রেতা শ'য়ে শ'য়ে নকশার বায়না দেন, সবই তার প্রয়োজন আর ধারণা অনুযায়ী করানীট ফল হলো ওয়েসন কমিশন হিসাবে পান সোল শ'র বেশি ডলার। ওয়েসন বলেন : এখন বুঝতে পারছি বারবার কেন ব্যর্থ হই। আমি তাকে আমার মতাটাই দিতে চেয়েছিলাম। এখন ঠিক বিপরীতটাই করি। তাকে তার মতটাই এবার দিতে দিয়েছি। ফলে তাঁর এখন ধারণা হলো নকশাটা তাঁরই করা। আর সত্যিই তাই। তাঁকে কিছু আর বিক্রি করতে হয় নাই। তিনি এখন কেনেন।

থিয়োডোর রুজভেল্ট যখন নিউইয়র্কের গভর্ণর ছিলেন তখন তিনি একটা অদ্ভুত কাজ করেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক কর্তাদের সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্ক রেখে চলতেন অথচ তাঁরা তাঁর দারুণ বিরোধিতা করতেন। এবার শুনুন কিভাবে তিনি তা করতেন। যখনই কোন উঁচু পদ পূরণ করার দরকার হতো তিনি বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের আহ্বান করতেন। প্রথমে তারা হয়তো কারও নাম প্রস্তাব করতেন। রুজভেল্ট বলেছেন, আমি

তাদের বলতাম এই ব্যক্তিকে নিয়োগ করলে রাজনীতি ভালো হবে না। জনসাধারণ এটা ভালো বলে মেনে নেবে না।

এরপর তাঁরা হয়তো আর কোন নাম প্রস্তাব করতেন। আর তাঁর বিরুদ্ধে তেমন কিছু না থাকলেও প্রেসিডেন্ট তাদের জানাতেন তিনিও তেমন জনগণের পক্ষে গ্রহণীয় হবেন না, তাই আর কারো নাম বসালে ভালো হতে পারে।

তাঁদের তৃতীয় প্রস্তাবের পর চতুর্থবারেই তাদের প্রস্তাবিত নামটিই গ্রহণ করতাম। এমন লোককে আমিও গ্রহণ করতাম। তাদের সহায়তার জন্য ধন্যবদা দিয়ে লোকটিই চাকরি দিতাম আর আমি তাদেরই এর জন্য কৃতিত্বটুকু গ্রহণ করতে দিতাম ... 'আমি তাদের বলতাম তাদের খুশী করার জন্যই এটা করেছি আর এবার তাদের উচিত আমায় খুশি করা।'

তাঁরা তা করেছেন। তারা এটা করেন প্রেসিডেন্টকে তার সিভিল সার্ভিস বিল আর কর সম্বন্ধীয় বিল পাশ করতে।

মনে রাখবেন রুজভেল্ট অন্যের সঙ্গে বহু পরামর্শ করতেন আর তাদের পরামর্শকে সম্মান দিতেন। রুজভেল্ট যখন কোন জরুরী চাকরি দেবার কাজ করতেন তখন বিরোধীদের ভাবতে দিতেন তাঁরাই আসলে চাকরিটা দিয়েছেন।

.

লঙ আইল্যান্ডের একজন গাড়ির দালাল একজন স্কচ দম্পতির কাছে একটা ব্যবহৃত গাড়ি বিক্রি করতে একই কৌশল কাজে লাগান। এই দালাল গাড়ির পর গাড়ি ভদ্রলোককে দেখান। কিন্তু প্রতিটিতেই তিনি ত্রুটি ধরতে লাগলেন। এটার এই দোষ আছে, ওটার ওই, কখনও বা দাম বড় বেশি। এই সময় তিনি আমার কাছে আসেন সাহায্য চেয়ে।

আমরা তাকে উপদেশ দিলাম গাড়িটা লোকটির কাছে বিক্রি করার চেষ্টা না করে তাকে 'কিনতে' দিন। তিনি কি করবেন না বলে 'লোকটিকে' বলতে দিন আপনারা কি করবেন। তাকে বুঝতে দিতে হবে তার কথাই থাকছে। এটা শুনতে ভালোই। অতএব এর পরের বার দালাল ভদ্রলোক আর একটা গাড়ি কিনতে এলে এই কৌশল কাজে লাগাতে চাইলেন। দালাল তাই ফোন করে 'স্যাণ্ডি' নামের সেই লোককে জানালেন তিনি যদি এসে তাঁকে একটু উপদেশ দেন বড় উপকার হয়।

'স্যাণ্ডি' এসে পৌঁছতেই দালাল বললেন, 'স্যাণ্ডি' আপনি অত্যন্ত ধুরন্ধর ক্রেতা। গাড়ির দাম সম্বন্ধে আপনার ধারণা দারুণ। এই গাড়িটা একটু দেখে বলবেন এটা বিক্রি করতে গেলে কত দাম হওয়া উচিত?

'স্যাণ্ডির' মুখে একগাল হাসি জাগলো। শেষ পর্যন্ত তার ক্ষমতা সম্বন্ধে আগ্রহ জাগছে আর দাম দেওয়া হচ্ছে। তিনি গাড়িটা চালিয়ে কুইন কুলেভার্ড থেকে ঘুরে এলেন। তারপর বললেন, গাড়িটা তিনশয় বিক্রি করলে যথেষ্ট লাভ হয়েছে ভাবতে পারেন।'

‘এ দামে দিলে আপনি গাড়িটা কিনবেন?’ দালাল জানতে চাইলেন। তিনশ! নিশ্চয়ই। এটাই তো তিনি চান। অতএব বিক্রির কাজ সমাধা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

ঠিক সেই একই মানসিকতা ব্যবহার করেছিলেন এক রঞ্জন-রশ্মি প্রস্তুতকারক তার জিনিস ব্রুকলীনের সবচেয়ে বড় হাসপাতালে বিক্রি করার জন্য। এই হাসপাতালটি আমেরিকায় সবচেয়ে ভালো রঞ্জন-রশ্মি বিভাগ করতে চেয়েছিল। ডঃ এল–যিনি রঞ্জন-রশি বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি সেলসম্যানদের অত্যাচারে পাগল হতে চলেছিলেন। তারা সবাই নিজেদের জিনিসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল।

একজন প্রস্তুতকারক ছিল বেশ কৌশলী। সে মানব চরিত্র সম্বন্ধে বেশ ভালো রকম ওয়াকিবহাল ছিল। সে এই রকম একটা চিঠি লিখেছিল :

‘আমাদের কারখানা সম্প্রতি এক নতুন ধরনের এক্স-রে যন্ত্র বানিয়েছে। এই মেশিনের প্রথম চালান সবে মাত্র আমাদের অফিসে এসে পৌঁচেছে। সেগুলি সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়। আমরা সেটা জানি বলেই যন্ত্রগুলোর উন্নতি সাধন করতে চাই। আমরা অত্যন্ত বাধিত হব যদি আপনারা সময় করে এগুলো একটু পরীক্ষা করে আপনদের মতামত জানান যাতে আমরা আরও বেশি করে আপনাদের সেবা করতে পারি। আপনারা অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন জেনেই সময় জানালে আমাদের গাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারি।‘

‘ওই চিঠিটা পেয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে যাই,’ ডঃ এল–ঘটনার কথা আমার ক্লাসে বর্ণনা করার সময় বলেন। আমি আশ্চর্য আর নিজেকে সম্মানিত বোধ করি। কোন রঞ্জন-রশ্মি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান আগে কখনও আমার মতামত চায়নি। এত নিজেকে বেশ

গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল। ওই সপ্তাহের প্রতিটি রাতে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও একটা ডিনার বাতিল করে দিলাম ওই যন্ত্রটা দেখার জন্য। যতই সেটা দেখলাম ততই আবিষ্কার করলাম যন্ত্রটা আমার দারুণ ভালো লেগেছে।

কেউ ওটা আমায় বিক্রির চেষ্টা করেনি। দেখলাম হাসপাতালের জন্য যন্ত্রটা কেনা সম্পূর্ণ আমারই মর্জি। যন্ত্রটার চমৎকার গুণাগুণের জন্যই আমি ওটার অর্ডার দিয়ে বসানোর ব্যবস্থা করলাম।

উড্রো উইলসন যখন প্রেসিডেন্ট হিসেবে হোয়াইট হাউসে আসীন তখন কর্ণেল এডোয়ার্ড এম. হাউস জাতীয় আর আন্তর্জাতিক ব্যাপারে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। উইলসন কর্ণেল হাউসের উপর গোপন পরামর্শের জন্য দারুণ নির্ভর করতেন যা তিনি তাঁর ক্যাবিনেটের অন্যান্য সদস্যদের উপর করতেন না।

কর্ণেল প্রেসিডেন্টের উপর প্রভাব ফেলার জন্য কি পথ ধরেছিলেন? সৌভাগ্যবশতঃ আমি সেটা জানতে পেরেছি। যেহেতু হাউস নিজেই সেকথা আর্থার ডি. হাউডেন স্মিথকে বলেন আর স্মিথ সেটা হাউসের নাম করে দি স্যাটারডে ইভনিং পোস্টে একটা প্রবন্ধ লেখেন।

হাউস যা বলেছিলেন তা এই রকম।

.

'আমি প্রেসিডেন্টকে ভালো করে জানার পর বুঝলাম তাকে নিজের মতে আনার সবার সেরা উপায় হলো তার মনে কোন একটা ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়া আর সেটা কথায় কথায় হালকা ভাবেই দিতে হবে। এমনভাবে তা করতে হবে যাতে তার মনে সেটা ভাববার সুযোগ থাকে। প্রথমবার একটা দুর্ঘটনার মধ্য দিয়েই সেটা ঘটে গেল। আমি হোয়াইট হাউসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে একটা পরামর্শ দিতে সেটা তিনি বাতিল করে দিলেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন পরে ডিনার টেবিলে আশ্চর্য হয়ে দেখলাম তিনি সেটা বেমালুম নিজের বলে চালিয়ে দিলেন।

হাউস কি বাধা দিয়ে বলেছিলেন, কখনও না, এটা আপনার কথা নয়, এটা আমার? ওহ্ না। হাউস সে রকম করার মানুষ নন। তিনি ঢের বেশি কৌশলী। তিনি প্রশংসার জন্য লালায়িত ছিলেন না, তিনি চাইতেন ফল। তাই তিনি উইলসনকে ভাবতে দিলেন মতলবটা তাঁরই। অবশ্য হাউস আরও বেশি কিছু করলেন। তিনি সকলের সামনে উইলসনকে ধারণাটার জন্য দারুণ প্রশংসা করলেন।

মনে রাখি আসুন যে আগামীকালই যার সঙ্গে কাজ করতে যাবো সেও ঠিক উড্রো উইলসনের মতই মানুষ। অতএব আসুন কর্ণেল হাউসের মতই কৌশলকে কাজে লাগাই।

নিউ ব্রানসউইকের একজন লোক ক'বছর আগে এই কৌশলটা আমার উপর কাজে লাগায় আর আমার সমর্থনও লাভ করে। আমি তখন নিউ ব্রানসউইকে মাছ ধরতে আর নৌকাবিহার করার মতলব করছিলাম। তাই ট্যুরিষ্ট ব্যুরোর খবর চেয়ে পাঠালাম। আমার নাম ঠিকানা ওদের তালিকায় ওঠার ফলে প্রায় কদিনের মধ্যে শ'য়ে শ'য়ে কাগজ চিঠি

এবং নানা রকম শিবিরে থাকার ব্যবস্থার খবর আসতে লাগল। আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম, কোন্‌টা পছন্দ করব বুঝতে পারলাম না। এবার এক শিবিরের মালিক ভারি বুদ্ধির একটা কাজ করল। সে আমায় একটা চিঠি দিয়ে নিউ ইয়র্কের কিছু লোকের নাম, ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর পাঠিয়ে বলল তাদের সে সেবা করেছে। সেটা কেমন আমিই জেনে নিতে পারি।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম ওই তালিকার একজন আমার পরিচিত। আমি তাঁকে টেলিফোন করলাম আর তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানতে পেরে শিবিরে ফোন করে আমার খাওয়ার দিন জানিয়ে দিলাম।

অন্যেরা তাদের জিনিস আমাকে বিক্রির চেষ্টা করছিল, কিন্তু একজন আমাকে নিজেকেই বিক্রি করতেই দিল। জয় হল তারই।
পঁচিশ শতাব্দী আগে একজন চেনা জ্ঞানী ব্যক্তি লাওৎসে যা বলেছিলেন তা এই বইয়ের পাঠকদের জানা থাকলে খারাপ হবে না :

নদী আর সাগর শত শত পাহাড়ী নদীর উৎসর্গ লাভ করে যেহেতু তারা সমুদ্রের নিচেই অবস্থান করে। আর সেই কারণেই তারা পাহাড়ী নদীর উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। তাই জ্ঞানী মহান মানুষেরা সাধারণ মানুষের উপরে থাকার জন্যই তাদের পিছনেই থাকেন। তাই তারা সাধারণের উপর কর্তৃত্ব করলেও তারা তাদের ভার বুঝতে পারে না। তাই তাদের স্থান আগে হলেও কেউ আঘাত পায় না।’
অতএব অপরকে যদি নিজের মতে আনতে চান, তাহলে ৭ নম্বর নিয়ম হল :
অপর ব্যক্তিকে ভাবতে দিন মতলবটা তারই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অবাক করার কিছু নিয়ম

মনে রাখবেন অপর ব্যক্তি হয়তো সম্পূর্ণ ভুল করতে পারে। তবে সে তা মনে করে না। এজন্য তাকে দোষ দেবেন না। যে কোন বোকাই এটা করতে পারে। তাকে শুধু বোঝার চেষ্টা করুন। একমাত্র বুদ্ধিমান, সহনশক্তিসম্পন্ন, আলাদা ধরনের মানুষই এটা চেষ্টা করে থাকেন।

অন্য ব্যক্তি যে–এরকমভাবে কাজ করে তার একটা কারণ আছে। সেই গোপন কারণটা খুঁজে বের করুন–তা হলেই তার এরকম ব্যবহারের কারণ বা হয়তো তার ব্যক্তিত্বের কথাটাই বুঝতে পারবেন।

দয়া করে সতোর মধ্য দিয়ে তার জায়গায় নিজেকে রাখুন।

আপনি যদি নিজেকে বলেন, 'আমি যদি ওর জায়গায় থাকতাম তাহলে আমার অনুভূতি কেমন হতো বা কিভাবে চলতাম?' এরকম করতে পারলে আপনি প্রচুর বিরক্তি আর সময় বাঁচাতে পারবেন। কারণ কারণটা খুঁজে পাওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়ায় তার ফলের জন্য আমরা ততটা বিরক্ত হব না। আর তাছাড়াও এতে আপনি মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা প্রচুর বাড়াতে পারবেন।

কেনেথ এম. গুড তার হাউ টু টান পিপল ইনটু গোল্ড’ বইতে লিখেছেন, ‘এক মিনিট অপেক্ষা করে দেখুন আপনার নিজের কাজে আপনার উৎসাহ কতটা আছে। তুলনা করে দেখুন অন্য কোন ব্যাপারে আপনার উৎসাহ কতটা কম। এবার বুঝে দেখুন পৃথিবীতে অন্য যে কোন লোকই ঠিক এইরকমভাবে। তারপর লিঙ্কন আর রুজভেল্টের সঙ্গে আপনি আয়ত্ত করতে পারবেন যে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার নির্ভর করে অপর লোকটির দৃষ্টিকোণ বুঝে নেবার আন্তরিকতার উপরেই।‘

বেশ কয়েক বছর ধরে আমি অবসর কাটাতে চেয়েছি আমার বাড়ির কাছাকাছি একটা পার্কে বেড়িয়ে আর ঘোড়ায় চড়ে। আগেকার কালের সেই গলদের মতই আমি একটা ওক গাছকে দারুণ ভালোবাসতাম, বলা যায় পুজো করতাম। তাই প্রত্যেক বছরে অপ্রয়োজনীয় আগুন লেগে ছোট ছোট গাছ পুড়ে যেতে দেখে আমি খুব কষ্ট পেতাম। এই আগুন অবশ্যই অসাবধানী ধূমপানকারীদের জন্য লাগতো না। এটা লাগতো ছোট ছোট ছেলেরা গাছের তলায় আগুন লাগিয়ে ডিম ভেজে খাওয়ার জন্যে। মাঝে মাঝে এই আগুন বিরাট আকার ধারণ করতো যে ফায়ার ব্রিগেডকে ডাকতে হতো মোকাবিলা করতে।

পার্কের একটা কোণে বোর্ডে অবশ্য লেখা ছিল যে, কেউ কোন আগুন জ্বাললে জরিমানা বা কারাদণ্ড হতে পারে। কিন্তু নোটিশটা পার্কের এমন জায়গায় টাঙানো ছিল যে ছেলেরা কেউই সেটা দেখতে পেত না। একজন ঘোড়সওয়ার পুলিশই পার্কে এসব তত্বাবধান করত। কিন্তু সে তার কর্তব্য তেমনভাবে গুরুত্ব সহকারে করত না আর আগুনও যথারীতি জ্বলতে থাকত প্রতি ঋতুতেই। একবার আমি আগুন লক্ষ্য করে পুলিশটির কাছে ছুটে গিয়ে তাকে আগুনের কতা বলে দমকলে খবর দেবার কথা বললাম।

পুলিশটি অম্লানবদনে উত্তর দিল আগুন লাগলে খবর দেয়া তার কাজ নয়! আমি প্রায় মরিয়া হয়ে উঠলাম আর এরপর যখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতাম ছেলেদের আগুন জ্বালতে দেখলেই তাদের তাড়া করতাম। আমি লজ্জিত ও গোড়ায় ছেলেদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা আমি দেখিনি। আমি স্বনিয়োজিত আইন রক্ষক হয়েই কাজ করতে চাইতাম। আগুন জ্বলতে দেখলে আমার মন এমনই খারাপ হয়ে উঠতো যে ঠিক করার বদলে ভুলই করে বসতাম। আমি কর্তৃত্ব ব্যঞ্জকস্বরে ছেলেদের সতর্ক করে বলতাম যে ঠিক করার বদলে ভুলই করে বসতাম। আমি কর্তৃত্ব ব্যঞ্জকস্বরে ছেলেদের সতর্ক করে বলতাম যে এজন্য তাদের জরিমানা আর জেলও হতে পারে। তাদের গ্রেপ্তারের ভয়ও দেখাতাম। আমি কেবল নিজের মনকেই হাল্কা করতে চাইতাম, তাদের মন বিচার করতাম না।

ফলাফল কি হলো? ছেলেরা কথা শুনতো–বেশ অসন্তুষ্ট হয়েই মেনে নিত। আমি পাহাড়ে ঘোড়ায় চড়ে উঠে গেলে আমার ধারণা তারা আবার আগুন জ্বারাতো আর বোধহয় সারা পার্কটাই পুড়িয়ে ছাই করতে চাইতো।

সময় কেটে চললে আমি আশা করলাম মানবিক সম্পর্ক নিয়ে আমার নতুন কিছু জ্ঞান সঞ্চয় হয়েছে। একটু কৌশলীও হই, আর অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু দেখতে অভ্যস্ত হলাম। এর ফলে হুকুম দেবার বদলে জ্বলন্ত আগুন দেখে এগিয়ে গিয়ে অনেকটা এইভাবে শুরু করতাম :

কি ছেলেরা, সময় ভালো কাটছে? আর কি রান্না হচ্ছে?... আমার ছেলে বয়েসে আমরাও আগুন ধরাতাম–এখনও অবশ্য ভালোবাসি। কিন্তু তোমরা বোধহয় জানো না বাগানে

আগুন জ্বালানো খুবই বিপজ্জনক। আমি অবশ্য জানি, তোমরা কোন অনিষ্ট করতে চাও না। তবে অন্য ছেলেরা সেরকম সাবধানী নয়। ওরা তোমাদের আগুন জ্বালাতে দেখে আগুন জ্বালায় অথচ খাওয়ার পর নিভিয়ে যেতে ভুলে যায় আর সেটা শুকনো পাতায় লেগে সব গাছ পুড়িয়ে ফেলে। তবে আমি কোন হুকুম করে তোমাদের আনন্দ মাটি করতে আসিনি। আমি চাই তোমরা আনন্দ করো। তবে দেখ, তোমরা শুকনো পাতাগুলো এখনই আগুনের কাছ থেকে সরিয়ে নাও-আর যাওয়ার সময় ধুলোয় আগুনটা চাপা দিতে ভুল না। করবে তো এটা? এরপর যখন আনন্দ করতে চাইবে পাহাড়ের উপর যেখানে বালি আছে সেকানে ধরালে কেমন হয়? তাতে কোন ক্ষতিও হবে না ...। এখানে আগুন জ্বালালে জেলও হতে পারে। তোমাদের ধন্যবাদ। আচ্ছা, এবার আসি। তোমরা স্ফুর্তি কর।

এ ধরনের কথায় কত তফাৎ ঘটে যায়। এর ফলে ছেলেরা সহযোগিতা করতে চায়। কোন বিরক্তি বা অসহিষ্ণুতা তাদের মধ্যে থাকে না। তাদের হুকুম করে বন্ধ করতে হয় না। কারণ তারা তাদের মুখ রক্ষা করতে পেরেছে। এতে তাদের মন ভালো থাকে, আমিও সেরকম থাকি কারণ আমি তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা দেখতে চেয়ে অবস্থাটা সামাল দিয়েছি।

.

এর পরের বার কাউকে ওই আগুন নেভানোর কথা বলার বা অন্য কাজ করানোর আগে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা একটু চোখ বন্ধ করে দেখে নিন। এটা করলেই ভালো নয় কি? নিজেকে প্রশ্ন করুন : ‘লোকটি একাজ করতে চায় কেন?’ এটা সত্যি যে এতে

সময় লাগবে। তবে তাতে নতুন বন্ধু পাবেন আর ঝগড়া রেষারেষির বদলে ভালো ফলও লাভ হবে। এতে জুতোর তলাও ক্ষয় হবে কম।

হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের ডীন, ডনহ্যাস বলেছিলেন : কারও অফিসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার আগে অফিসের সামনের রাস্তায় দুঘন্টা পায়চারী করতে চাই, কিন্তু কোনো পরিষ্কার ধারণা না নিয়ে ঢুকতে চাই না। যেমন আমি কি বলবো তারই বা উত্তর কি হবে। যার কাছে যাবো তার দৃষ্টিভঙ্গী জেনে রাখাই শ্রেয়।

কথাটা এতই দামী যে বারবার সেটা মনে রাখা দরকার।

এই বইটি পড়ার পর যদি সর্বদা সবকিছু অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার অভ্যাস জন্মায় তাহলে এটা নিঃসন্দেহ যে আপনার জীবনে এটা হয়ে উঠবে একটা দি দর্শন আর সুন্দর কোন অভিজ্ঞতা।

তাই অন্যের বিরক্তি না জাগিয়ে মানুষকে যদি পরিবর্তন করতে চান তাহলে ৮ নম্বর নিয়ম হল : 'আন্তরিকভাবে অপরের দৃষ্টিকোণ থেকেই সব কিছু দেখার চেষ্টা করুন।'

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

যা সবাই আশা করে

আপনি কি এমন মন্ত্র জানতে চান না যাতে সব রকম তর্কাতর্কি বন্ধ হয়, শত্রুতা দূর হয়ে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে; আর অপর ব্যক্তি বেশ মনোযোগ দিয়ে আপনার সব কথা শোনে?

হ্যাঁ বলছেন তো? বেশ তাহলে ঠিক আছে। এবার এইভাবে শুরু করুন : 'আপনার এরকম মনোভাবের জন্য আপনাকে কণামাত্রও দোষারোপ করছি না! আপনার জায়গায় আমি থাকলে একই রকম ভাবতাম।'

এ ধরনের উত্তর পেলে সবচেয়ে খিটখিটে বা খুঁতখুঁতে মানুষও বশ মানবে। আপনি যদি শতকরা একশ ভাগ আন্তরিকতা নিয়ে এটা বলেন যে তার জায়গায় থাকলে আপনার মনোভাবও একই রকম হতো সেটা সম্পূর্ণ সত্যিই হতো। বুঝিয়ে বলি ব্যাপারটা। অল ক্যাপোনের কথাটাই ধরুন। অল ক্যাপোনের মতই যদি আপনার শরীর, মেজাজ আর মন হতো, আর ধরুন তারই মতো পারিপার্শ্বিকতা আর অভিজ্ঞতাও আপনি পেয়েছেন। তাহলে আপনি ঠিক তারই মত হয়ে যেতেন–তারই মত সেখানে থাকতেন কারণ এই সব জিনিসই তাকে অল ক্যাপোন করে তুলতে পারে।

আপনি যে কোন ঝুমঝুমি বা র‍্যাটল সাপ নন তার একমাত্র কারণ হলো আপনার বাবা মা ঝুমঝুমি সাপ নন।

আপনি যা তার জন্য খুব বেশি কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না। আর মনে রাখবেন, যে লোক বিবেচনাহীন হয়ে আপনার কাছে আসতে পারে তার জন্যেও তার দোষ বেশি নয়। এমন কোন বেচারির জন্য দুঃখ বোধ করাই উচিত। তাকে সহৃদয়তা দেখানো দরকার। জন বি গাও রাস্তা দিয়ে কোন মাতালকে টলমলে অবস্থায় দেখলে বলতেন : ‘ওই দেখুন এক মাতাল, ইশ্বরের অসীম করুণাতেই আমি ওই রকম হইনি।‘

আগামীকালই যেসব লোকের মুখোমুখি হবেন তারা চারভাগের তিনভাগেই করুণা আর সমবেদনার প্রত্যাশী। তাদের যদি সেটা দেন তাহলে তারা আপনাকে ভালোবাসবে। আমি একবার লিটল উইমেনের লেখিকা লুইস মে অ্যালকট সম্পর্কে বেতারে একটা ভাষণ দিয়েছিলাম। স্বভাবতই আমি জানতাম তিনি ম্যাসাচুসেটসের কনকর্ডে বাস করা কালীন তার বিখ্যাত বইটি লেখেন। কিন্তু কি বলছি না ভেবেই বলে ফেলেছিলাম, আমি তার আদি বাড়ি নিউ হ্যাঁম্পশায়ারের কনকর্ডে গিয়েছিলাম। নিউ হ্যাঁম্পশায়ার কথাটা যদি একবার মাত্র বলতাম তাহলে মনে করার কারণ থাকত না। কিন্তু আমার দূর্ভাগ্য, আমি দুবারই সেটা বলেছিলাম। এরপরেই রাশি রাশি চিঠি আর টেলিগ্রাফ আসতে লাগলো। তার মধ্যে দারুণ জ্বালা ধরানো বাক্যবাণও ছিল। এসব পেয়ে আমার মাথা প্রায় ভন ভন করতে লাগল, যেন হাজারো মৌমাছির দংশন জ্বালা। কেউ কেউ আবার ব্যঙ্গ করেছে, কেউ বা অপমান।

একজন মহিলা যিনি কনকর্ডে ম্যাসাচুসেটসে জন্মেছিলেন, তখন তিনি ফিলাডেলফিয়ায় থাকতেন, আমার উপর তার মনের সব রাগ উজাড় করে দিয়েছিলেন। আমি যদি মিস অ্যালকটকে নিউ গিনির নরখাদিকা বলতাম তাহলেও বোধহয় তাঁর তত রাগ হতো না।

তাঁর চিঠিটা পড়তে পড়তে তাই ভেবেছিলাম ভাগ্যিস এমন মহিলা আমার স্ত্রী নন। আমার ইচ্ছে হয়েছিল মহিলাকে লিখে জানাবো যে ভূগোলের জ্ঞান আমার না থাকতে পারে, তবে তার সাধারণ ভদ্রতাবোধটুকুও নেই। এই ভাবেই শুরু করব ভেবেছিলাম। তারপর জামার হাতা গুটিয়ে তার সম্পর্কে কি ভেবেছি সেটা লিখব স্থির করলাম। তবে সেটা করিনি, আমি নিজেকে সংযত করলাম। আমি বুঝলাম, যে কোন মাথা গরম বোকাই এমন করতে পারে–আর বেশির ভাগ বোকাই তা করবে।

আমি তাই বোকাঁদের উপরে থাকব মনস্থ করলাম। তাই মহিলার শত্রুতা বোধকে দূর করে তার সাথে বন্ধুত্ব অর্জন করব ঠিক করলাম। এটা একটা চ্যালেঞ্জের মতই, একরম খেলতে আমার খুবই ভাল লাগে। নিজেকে তাই বললাম : 'তার জায়গায় থাকলে আমিও বোধহয় একই আচরণ করতাম। তাই তার মনোভাবের সঙ্গে একাত্ম হতে চাইলাম। এরপর যখন ফিলাডেলফিয়ার গেলাম আমি তাকে টেলিফোনে ডাকলাম। কথাবার্তাটা আমাদের মধ্যে অনেকটা এই রকম হয় :

আমি : মিসেস অমুক, আপনি আমাকে কয়েক সপ্তাহ আগে একটা চিঠি লিখেছিলেন। তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

তিনি (একটু কাটা কাটা মার্জিত কণ্ঠস্বর) : কার সঙ্গে কথা বলছি জানতে পারি কি?

আমি : আমি আপনার অপরিচিত। আমার নাম ডেল কার্নেগী। কয়েক রবিবার আগে রেডিওতে আমার অ্যালকট সম্পর্কে একটা কথিকা আপনি শুনেছেন। আমি তখন বোকার মতই বলেছিলাম তিনি নিউ হ্যাঁম্পশায়ারের কনকর্ডে বাস করতেন। এটা খুবই

বোকার মত বলেছিলাম। তাই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাই। আপনি যে সময় করে আমায় লিখেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

তিনিঃ আমি দুঃখিত মিঃ কার্নেগী, আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়ায় আমি ওই চিঠি লিখেছিলাম; আমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত।

আমি : না! না! আমি ক্ষমা চাইবেন না, আমারই সেটা করা উচিত। যে কোন স্কুলের ছেলেও এমন ভুল করতো না আমি যা করেছি। পরের রবিবারে আমি রেডিওতে ভুলটা সংশোধন করেছি আর এখন আপনার কাছে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাই।

তিনিঃ আমি ম্যাসাচুস্টেসের কনকর্ডে জন্মেছিলাম। সেখানে আমাদের পরিবার প্রায় দুশ বছরের বাসিন্দা, আমাদের রাজ্য নিয়ে আমরা গর্বিত। মিস অ্যালকট নিউ হ্যাম্পশায়ারে জন্মেছিলেন বলায় আমার খুবই রাগ হয়। কিন্তু এই চিঠির জন্য অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করছি।

আমি : আমি আপনাকে জানাতে চাই আপনি আমার দশভাগের এক ভাগও দুঃখিত নন। আমার ভুলে ম্যাসাচুস্টেসের ক্ষতি হয়নি, হয়েছে আমারই। আপনাদের মত শিক্ষিত মহিলারা কদাচিতই বেতারের কথিকা শুনে চিঠি লেখার সময় পান। আশাকরি ভবিষ্যতে এরকম বেতার কথিকায় আমার ভুল হলে সংশোধন করে দেবেন।

তিনি; আপনি যেভাবে আমার সমালোচনা গ্রহণ করেছেন তার জন্য আমি খুবই খুশি। আপনি লোক হিসেবে নিশ্চয়ই চমৎকার। আপনাকে আমি আরও ভালভাবে জানতে চাই।

অতএব তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে আর তাঁর দৃষ্টিকোণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমি তাঁকে মার্জনা প্রার্থী আর আমার সঙ্গে একাত্ম করতে সক্ষম হই। আমি এজন্য খুশি হই যে আমি অপমানের বদলে সদাশয়তা প্রদর্শন করেছি। আমাকে তার পছন্দ মত করে তোলায় আমি অপরিসীম আনন্দ পেয়েছিলাম, আর সেটা তাকে গোল্লায় যেতে বললে পেতাম না।

হোয়াইট হাউসে যারা অধিষ্ঠান করেন তাদের অনবরত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে সমস্যায় বিব্রত থাকতে হয়। প্রেসিডেন্ট ট্যাফটও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে লিখেছিলেন সহানুভূতির রাসায়নিক মূল্য কতটা হতে পারে, বিশেষত কড়া বিদ্রূপ মনোভাবের জ্বালা দূর করতে। ট্যাফট তাঁর লেখা 'এথিকস ইন সার্ভিস' বইটিতে বেশ মজাদার একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন যাতে দেখা যায় তিনি কিভাবে এক হতাশ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী মায়ের বিরক্তি দূর করেন।

ট্যাফট লিখেছিলেন, 'ওয়াশিংটনের এক মহিলা, যার স্বামীর কিছু রাজনৈতিক প্রভাব ছিল, আমার কাছে প্রায় ৬ সপ্তাহ ধরে এসে তাঁর ছেলেকে বিশেষ কোন পদে নিয়োগ করার অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। মহিলাটি বেশ কিছু সেনেটর আর কংগ্রেস সদস্যের সমর্থনও ভালোমত যোগাড় করে চাপ সৃষ্টি করছিলেন। কিন্তু পদটার জন্য কিছু প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল আর তাই ওই দপ্তরের প্রধানের কথা মত আমি অন্য একজনকে ওই পদে নিয়োগ করি। এরপর ওই মায়ের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম, তাতে লেখা আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ। কারণ সামান্য একটু অনুরোধ রক্ষা করে আমি এক মাকে খুশি করলাম না, যা আমি পারতাম। তিনি আরো অভিযোগ কররেন তিনি আমার হয়ে ভোট সংগ্রহ করতে প্রচুর খেটেছেন আর আমি এইভাবে তার প্রতিদান দিলাম!

‘এ ধরনের কোন চিঠি পেলে প্রথমেই আপনার যা মনে হবে তা হলো ওই রকম চিঠির লেখককে বেশ কড়া ভাষায় জবাব দেওয়া, বিশেষতঃ এরকম অনধিকার চর্চার জন্য। আপনি হয়তো চিঠিটা লিখেও ফেলবেন। কিন্তু আপনি বুদ্ধিমান হলে সেটা আপাততঃ ড্রয়ারে রেখে দেবেন। তারপর দুদিন পরে যখন আবার বের করবেন তখন আর পাঠাতে চাইবেন না। ঠিক এই পথই আমিও নিয়েছিলাম। এরপর আমি মাথা ঠাণ্ডা করে এ অবস্থায় যা লেখা উচিত সেই ভাবেই ভদ্রমহিলাকে লিখে জানালাম যে পদটি পূরণে আমার ব্যক্তিগত কোন হাত ছিল না যেহেতু এর জন্য প্রযুক্তি জ্ঞান দরকার। তাই দপ্তরের প্রস্তাবই আমাকে গ্রহণ করতে হয়। আমি আরও জানালাম আমি আশা করি তার ছেলে যে কাজ করছেন তাতেই উন্নতি করবেন। এতে মহিলা কিছুটা ধাতস্থ হন আর চিঠিতে আমাকে জানান যে ওই চিঠি লেখার জন্য তিনি দুঃখিত।

‘ব্যাপারটার ওখানেই সমাপ্তি ঘটেনি। এর কিছুদিন পরে আমি আবার একটা চিঠি পেলাম এবার মহিলার স্বামীর কাছ থেকে। অবশ্য হাতের লেখাটা আগের মতই ছিল। তাতে ভদ্রলোক লিখেছেন, হতাশায় ভেঙে পড়ে স্নায়বিক রোগে তাঁর স্ত্রী শয্যাশায়ী আর সম্ভবতঃ তাঁর পাকস্থলীতে ক্যান্সার হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্যের কারণেই ওই চাকরিতে প্রথমজনকে বাতিল করে তার ছেলেকে দেয়া যায় কিনা? আমাকে আবার একটা চিঠি লিখতে হলো, এবার তার স্বামীকে। আমি লিখলাম যে আশাকরি রোগটা ওইরকম মারাত্মক হবে না আর তাঁর স্ত্রীর কঠিন রোগের জন্য আমি সমব্যাথী। আমি জানালাম প্রথম নামটি বাতিল করা সম্ভব নয়।

‘ওই চিঠি লেখার দুদিনের মধ্যে হোয়াইট হাউসে একটা সঙ্গীতের আসর বসানো হয় প্রথম যে দুজন মিসেস ট্যাফট আর আমাকে সম্ভাষণ জানালো তারা ওই স্বামী-স্ত্রী। যদিও স্ত্রীর নাকি সাংঘাতিক রোগ!’

এস. হুরক হলেন আমেরিকার এক নম্বর সঙ্গীত সংগঠনকারী। প্রায় বিশ বছর ধরে তিনি শিল্পীদের নিয়ে কাজ করছেন–তাঁদের মধ্যে ছিলেন এইসব বিখ্যাত শিল্পীরা, যেমন চ্যালিয়াপিন, ইসাডোরা ডানকান আর পাভলোভা। মিঃ হুরক আমায় বলেন যে খেয়ালী শিল্পীদের নিয়ে চলতে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা হলো,এই সব শিল্পীদের জন্য দরকার সহানুভূতি–একমাত্র সহানুভূতি দেখিয়েই এই সব খেয়ালীদের এড়ানো যায়।

তিন বছর যাবৎ তিনি ছিলেন ফিওডোর চ্যালিয়াপিনের সঙ্গীত সংগঠক। চ্যালিয়াপিন ছিলেন খ্যাতিমান শিল্পী, তাঁর মত কেউই গান গেয়ে মাতিয়ে তুলতে পারেনি। তবু চ্যালিয়াপিন ছিলেন সব সময় একটা সমস্যা। ঠিক যেন একেবারে কোন দুষ্টু ছেলে। চ্যালিযানপিন কেমন ছিলেন সেটা মিঃ হুক নিজেই বলেন : ‘সব দিক দিয়েই সে অতি জঘন্য।’

উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। চ্যালিয়াপিন হয়তো যেদিন গাইবার কথা সেদিন দুপুরের দিকে মিঃ হুরকের কাছে ফোন করে বললেন, ‘আমার দারুণ শরীর খারাপ। আমার গলা ফুলে ঢোল। আজ রাতে গান গাওয়া অসম্ভব।’

মিঃ হুরক কি তা শুনে তর্ক জুড়ে দিতেন? মোটেই না। তিনি জানতেন এভাবে কখনও এই সব শিল্পীদের দিয়ে কাজ করানো যায় না। বরং তিনি বেশ সহানুভূতি নিয়ে

হোটেলে ছুটে গিয়ে বলতেন : 'কি দুঃখের কথা! বেচারি! অবশ্যই আপনার পক্ষে গান গাওয়া সম্ভব নয়। আমি এখনই অনুষ্ঠান বাতিল করছি। এতে অবশ্য আপনার কয়েক হাজার ডলার ক্ষতি হবে, তা যাক, আপনার খ্যাতির পক্ষে তা কিছুই না।'

চ্যালিয়াপিন তাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন : 'একবার বিকেলের দিকে এসো দেখা যাক কেমন থাকি।'

পাঁচটার সময় মিঃ হুরক আবার হোটেলে ছুটলেন সেই সহানুভূতি নিয়ে। আবার তিনি অনুষ্ঠান বাতিল করতে চাইলেন। আবারও চ্যালিয়াপিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আরও পরে একবার এসো। তখন হয়তো ভালো হয়ে যেতে পারি।

সাড়ে সাতটায় সময় চ্যালিয়াপিন গান গাইতে রাজী হলেন তবে একটা শর্তে, মিঃ হুরককে ঘোষণা করতে হবে তাঁর গলা আজ ভালো নেই। মিঃ হুরক মিথ্যে করে বলতেন তাই করবেন। কারণ তিনি জানতেন এছাড়া তাকে স্টেজে নামানো যাবে না।

ডঃ আর্থার আই. গেটস তাঁর এডুকেশনাল সাইকোলজিতে বলেছেন : সারা পৃথিবীর মানুষই সহানুভূতির কাঙাল। শিশু আগ্রহ নিয়ে তার আঘাত দেখাতে চায় বা ইচ্ছে করে কাটাকুটি করে বাবা মার সহানুভূতি আকর্ষণ করে। বয়স্করাও তাই করে ... তাদের আঘাত, দুর্ঘটনা বা রোগের কথা বাড়িয়েই বলতে চায়। উদ্দেশ্য সহানুভূতি আকর্ষণ। নিজেকে করুণা করা প্রায় সব মানুষের মধ্যেই আছে।

অতএব যদি অপরকে স্বমতে আনতে চান ৯ নম্বর নিয়ম হল :

অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করুন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সকলের পছন্দসই আবেদন

আমি আমেরিকার মিসৌরীতে জেসি জেমসের খামারের কাছে মানুষ হয়েছিলাম। কিয়ারশীতে জেসি জেমসের খামার ঘুরেও আমি দেখেছি। সেখানে জেসি জেমসের ছেলে এখনও বাস করেন।

তার স্ত্রী আমাকে অনেক কাহিনী শুনিয়ে বলেছেন জেসি কেমন করে ট্রেন লুট করতেন আর ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে সেইসব টাকা পয়সা আশে পাশের চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন যাতে তারা বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারে।

জেসি জেমস নিজেকে একজন আদর্শবাদী বলে ভাবতেন, ঠিক যেমন ডাচ শুলজ, 'দুই বন্দুক' ক্রাউলে আর অল ক্যাপোন দুই প্রজন্ম পরে ভেবেছে। আসল কথাটা হলো আপনি যাকেই দেখুন–এমন কি আয়নায় যাকে দেখবেন তারই নিজের সম্পর্কে বেশ একটা উঁচু ধারণা আছে। সে নিজের সম্পর্কে ভাবতে চায় সে চমৎকার আর নিঃস্বার্থ।

জে, পিয়েরপন্ট মর্গ্যান তাঁর এক বিশ্লেষণে বলেছিলেন যে কোন মানুষের কাজ করার পিছনে দুটো কারণ কাজ করে। একটা যা শুনতে ভালো আর একটা আসল।

লোকটি কিন্তু আসল কারণটাই ভাবে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেই আদর্শবাদী হওয়ায় যেটা বা যে উদ্দেশ্য শুনতে ভালো লাগে সেটাই ভাবতে

চাই। অতএব মানুষকে পরিবর্তিত করতে হলে মহত্তর উদ্দেশ্যের কাছেই আবেদন রাখতে হবে।

ব্যবসায় কাজ করা কি অতি বেশি রকম আদর্শবাদী কাজ বলে মনে হয়? দেখা যাক। পেনসিলভানিয়ার গ্লেনডেনের ফ্যারেল-মিচেল কোম্পানীর হ্যামিলটন জে. মিচেলের কথাই ধরুন। মিঃ ফ্যারেলের একজন অসন্তুষ্ট ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে দেবার ভয় দেখাচ্ছিলেন। ভাড়াটের মেয়াদ এখনও চার মাস ছিল, ভাড়া ছিল মাসে পঞ্চান্ন ডলার। তা সত্ত্বেও তিনি নোটিশ দেন শর্ত থাকা সত্ত্বেও। এই সব ভাড়াটে আমার বাড়িতে সারা শীতকালেই বাস করেছে-এই সময়টা বছরের সবচেয়ে খরচ সাপেক্ষ, মিঃ ঘটনাটা এইভাবেই আমার ক্লাসে বর্ণনা করেন। আমি তাই জানতাম আগামী শীতের আগে আর ভাড়া দিতে পারবো না। আমি বুঝলাম দুশ কুড়ি ডলার জলে যেতে বসেছে–বিশ্বাস করুন আমি অন্ধকার দেখলাম।

সাধারণত এমন হলে আমি ওই ভাড়াটেকে উপদেশ দিতাম লীজের চুক্তি আর শর্ত আবার পড়তে। আমি তাকে জানাতাম তিনি চলে গেলে তাকে পুরো টাকাই দিতে হবে– আর আমি আদায় করার চেষ্টা করব।

যাই হোক কোন রকম গোলমাল না করে আমি অন্য পথ ধরবো ঠিক করলাম। আমি এখনও বিশ্বাস করি না আপনি চলে যেতে চান। এই ভাড়া খাটানোর ব্যাপারে আমার বহু বছরের অভিজ্ঞতায় আমি মানব চরিত্র বেশ বুঝতে শিখেছি আর আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছি আপনি এক কথার মানুষ। আসলে, আমি এতই নিশ্চিত যে বাজি ধরতেও আমি রাজি।

এখন আমার প্রস্তাব হলো, আপনার মতটা কটা দিন চাপা রেখে আর একবার ভাবুন। এরপর আপনি যদি আজ থেকে মাসের প্রথমে যখন ভাড়া নেওয়া হয় তখন আসেন আর আমায় বলেন আপনি চলে যেতে চান তাহলে ধরে নেব আপনার মতটাই ঠিক। আপনি চলে যেতে চান। তাহলে বুঝবো আপনার কথাটাই ঠিক আর আমার ধারণা ভুল। তবে আমি এখনও বিশ্বাস করি যে আপনি এক কথার মানুষ আর চুক্তি মেনে চলবেন। তাছাড়া চুক্তি অনুসারে আমরা হয় মানুষ না হয় বাদরবেছে নেবার ব্যাপারটা আমাদেরই।

যাই হোক নতুন মাস পড়লে ঐ ভদ্রলোক স্বয়ং এসে তার ভাড়া দিয়ে গেলেন। তিনি আর তার স্ত্রী, দুজনে আলোচনা করে থেকে যাওয়াই ঠিক করেন। তারা ঠিক করেন সম্মানের কাজ হলো লীজের চুক্তিটা মেনে চলা।

প্রয়াত লর্ড নর্থক্লিফ জীবিতকালে একবার সংবাদপত্রে তাঁর একটা ছবি প্রকাশ হলো। যেটা তিনি চাননি। তিনি সম্পাদককে একটা চিঠি লেখেন। তাতে তিনি কি লিখেছিলেন : দয়া করে আমার ঐ ছবি আর ছাপবেন না, আমার ওটা পছন্দ নয়। না, তিনি মানুষের মহত্ত্বের আর মাকে ভালবাসার নীতির কাছে আবেদন রেখেছিলেন, তিনি লেখেন : দয়া করে আমার এই ছবি আর ছাপবেন না, ওটা আমার মায়ের পছন্দ নয়।

জন ডি, রকফেলার (ছোট) যখন তার ছেলেমেয়েদের ছবি কাগজে ছাপতে দেয়া পছন্দ করতেন না তখন তিনি হৃদয়ের কাছে আবেদন রাখতেন। তিনি কখনই বলতেন না, আমি চাই না ওদের ছবি ছাপা হোক।' তিনি যা চাইতেন তা হলো ছেলেমেয়েদের যাতে ক্ষতি না হয়। তিনি বলেছিলেন : আপনারা তো জানেন, ছেলেরা কেমন। আপনাদের

নিজেদেরও তো ছেলেমেয়ে আছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তাদের বেশি প্রচার করা ক্ষতিকর।

সাইরাস এইচ কে, কার্টিস মেইনের যে দরিদ্র ছেলেটি তার উল্কাগতি জীবনে লক্ষ লক্ষ টাকা করেছিলেন ‘দি স্যাটারডে ইভনিং পোস্ট’ আর ‘লেডিজ হোম জার্নালের মালিক হয়ে–তিনিও গোড়ায় যখন শুরু করেন তখন অন্যান্য কাগজের মত লেখার জন্য টাকা দিতে পারতেন না। শুধু টাকার জন্য বড় বড় লেখকদের দিয়ে তিনি লেখাতে পারতেন না। তাই তিনি তাদের হৃদয়ের কাছেই আবেদন রাখতেন। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি–তিনি অমর সাহিত্যিক লিটল উইমেনের লেখিকা লুইশা মে অ্যালক্ট যখন তাঁর খ্যাতির মধ্যগগনে তাঁকে দিয়েও লেখাতে পেরেছিলেন। তিনি সেটা করতে পেরেছিলেন, অ্যালক্টের পছন্দ মত প্রিয় দাঁতব্য প্রতিষ্ঠানে একশ ডলার দান করে।

ঠিক এখানেই সন্দিহান মানুষেরা বলতে পারেন : ‘ওহ্ এধরনের কথা নর্থক্লিফ বা রকফেলার মত অর্থবান বা ভাবপ্রবণ উন্নাসিকের পক্ষে ঠিক আছে। তবে যে সব কাঠখোট্টা শক্ত মানুষের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করতে হয় তাদের কাছে এর কদর কতটা সেটাই দেখার বিষয়।’

আপনি হয়তো ঠিক। এ ব্যাপারে এটা চলবে না–আর সবক্ষেত্রেই যে কাজ হবে তাও ঠিক নয়। তবে এখন যে ফল পাচ্ছেন তাতে যদি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে বদলাবার চেষ্টা করবেন কেন? আর যদি সন্তুষ্ট না হন তাহলে পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কী?

যাই হোক, আমার একজন প্রাক্তন ছাত্র জেমস এল, টমাসের বলা সত্য কাহিনী পড়তে ভালোই লাগবে।

গল্পটা এর রকম।

কোন মোটর গাড়ি কোম্পানির ছয়জন ক্রেতা গাড়ি সাফাই বা সারানোর টাকা দিতে অস্বীকার করে। কেউই পুরো বিল ভুল তা বলেনি, তবে তারা প্রত্যেকেই দাবি জানায় কোন একটা দাবি ভুল। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রত্যেকে প্রতিটি অংশে সই করেছিল, তাই কোম্পানী জানতো বিল ঠিকই ছিল–আর তারা তাই বলে দেয়। এটাই ছিল প্রথম ভুল।

কোম্পানির টাকা আদায়কারী দপ্তর পাওনা টাকা আদায় করতে এই পথ নেয়। আপনার কি ধারণা তারা সফল হয়?

১। তারা প্রত্যেক খরিদ্দারের কাছে সোজাসুজি গিয়ে জানায় তারা টাকা আদায় করতে এসেছে, সেটা অনেক দিন বাকি পড়ে আছে।

২। তারা পরিষ্কার করে জানায় কোম্পানী সম্পূর্ণ ঠিক আর ক্রেতা অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণ ভুল।

৩। তারা আরও জানালো, কোম্পানী গাড়ির ব্যাপারে যা জানার তার চেয়ে অনেক বেশি জানে। তাহলে তর্কাতর্কির ব্যাপার কোথায়?

৪। ফলাফল : তারা তর্ক করতে শুরু করে।

এই পথের কোনটায় কি ক্রেতা খুশি হলো আর পাওনাও মিটে যায়? সেটা নিজেই বুঝতে পারবেন।

আসলে এর ফলে অবস্থাটা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে কোম্পানি প্রায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার মনস্থ করে। ঠিক তখনই ব্যাপারটা কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজারের নজরে আসে। ম্যানেজার ওই ব্যাপারে খোঁজ নেন। তিনি জানতে পারলেন ক্রেতারা সবাই অতীতে তাদের পাওয়া ঠিক মতই মিটিয়ে দিয়েছেন। অতএব কোথাও কোন ভুল হয়েছে–আর সে ভুল আদায় পদ্ধতির মধ্যে আছে। অতএব তিনি জেমস এল. টমাসকে ডেকে টাকাটা আদায়ের দায়িত্ব দিলেন।

মিঃ টমাস নিচের পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

১। প্রত্যেক ক্রেতার কাছে প্রথম যাওয়ার পর মি. টমাস বলেছেন, আমার মনে ছিল এ বিলটা অনেকদিনের পাওনা–আর আমাদের কথাই সম্পূর্ণ ঠিক। তবে আমি সে সম্পর্কে একটা কথাও বলিনি। আমি জানালাম আমি জানতে এসেছি কোম্পানি কি করেছে আর কি করেনি।

২। আমি আরও পরিষ্কার করে বললাম ক্রেতার মতামত আর বক্তব্য না শুনে আমি কোন মতামত দেব না। আমি আরও জানালাম কোম্পানী কোন দাবীই নির্ভুল এ কথা বলতে চায় না।

৩। আমি জানালাম তিনি গাড়ি সম্বন্ধে আমার চেয়েও অভিজ্ঞ।

৪। আমি তাকে কথা বলতে দিলাম আর সহানুভূতির সঙ্গে শুনলাম তিনি যা চান।

৫। এরপর ক্রেতা যখন কিছু যুক্তি মানার অবস্থায় এলেন তখন আমি সব ব্যাপারটি তার সামনে রাখলাম আর জানালাম ব্যাপারটা ঠিক মত চালনা করা হয়নি। আমি প্রথমে বললাম, আপনাকে আমি জানাতে চাই যে আমাদের লোক আপনার বিরক্তি উৎপাদন করেছে। তাই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনার কথা শুনে আমি আনন্দিত। আমি আপনার কাছে ওই বিল সম্বন্ধে একটা নিবেদন রাখতে চাই। আমি অনুরোধ করতে চাই এটা দেখে যদি মনে করেন ঠিক দিয়ে দেবেন। আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

'তিনি কি বিল ঠিক করে দেন? অবশ্যই। অন্য সব ক্রেতারা কি টাকাটা দিয়ে দেন? হ্যাঁ ছ'জনের মধ্যে পাঁচ জনই ১৫০ থেকে ৪০০ ডলার দিয়ে দেন। একজন কিছুই দেবেন না সাফ বলেছেন। আসল কথাটা হলো দুবছরে আমরা তাদের আবার নতুন গাড়ি বিক্রি করি।'

'অভিজ্ঞতা আমায় শিখিয়েছে, মিঃ টমাস বলেছেন যে, যখন ক্রেতাদের সম্বন্ধে কোন কিছু জানা যায় সেখানে ধরে নিতে হবে সে সৎ, সত্যবাদী আর দাম মিটিয়ে দিতে উদগ্রীব।

অতএব আপনি যদি অপরকে আপনার মতে আনতে চান তাহলে দশ নম্বর নিয়ম হলো :

'অপরের মহত্বের প্রতি আবেদন রাখুন।'

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চলচ্চিত্র এটা করে, রেডিও যা করে আপনিও করেন না কেন

কয়েক বছর আগে দি ফিলাডেলফিয়া ইভনিং বুলেটিনের বিরুদ্ধে একটা অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক নিন্দার গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। বেশ ঈর্ষামূলক গুজব ছড়ানো হচ্ছিল। বিজ্ঞাপনদাতাদের বলা হচ্ছিল যে ঐ কাগজে বড় বেশি রকম বিজ্ঞাপন থাকে আর খবর খুবই কম থাকে। এ কাগজ তাই আর পাঠকদের কাছে পছন্দ নয়। দ্রুত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। তাই এই গুজব বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু কীভাবে?

এটা এইভাবে করা হয়।

বুলেটিন দৈনিক কাগজ থেকে সব পড়ার বিষয়বস্তু নিয়ে একসঙ্গে করে একটা বই হিসেবে বের করে। বইটির নাম দেয়া হয় একদিন'। তাতে ছিলো ৩০৭ পাতা-এর দাম হতে পারতো প্রায় দু ডলার! তা সত্ত্বেও বুলেটিন সমস্ত খরব আর বিজ্ঞাপন একসঙ্গে যে বই বের করলো তার দাম দু ডলার না রেখে রাখা হলো দু সেন্ট।

এই বই ছাপার ফলে নাটকীয়ভাবে প্রমাণ করা গেল বুলেটিনে পাঠ্যবস্তু অনেকটাই থাকে। এতে বক্তব্য আরও পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল, বলা হয়েছিল আরও সুন্দরভাবে আর নাটকীয়ভাবে, বক্তৃতা বা সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে এমন করা যেত না।

এ যুগটাই হলো নাটকীয়তায় ভরা যুগ। কেবল সত্য প্রচার করে কাজ হয় না। সত্যকে স্পষ্ট, আগ্রহের আর নাটকীয় করতে হবে। আপনার দরকার ওস্তাদী। সিনেমায় এরকম করা হয়। রেডিও এটা করে। তাই মনোযোগ আকর্ষণ করতে গেলে আপনাকেও তাই করতে হবে।

যে সব দোকানদার কাঁচের শোকেস প্রদর্শনের কাজে দক্ষ তারা নাটকীয়তার ক্ষমতা জানেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যে কোম্পানী ইঁদুর মারার বিষ তৈরি করে সেজন্য তারা তাদের শোকেসে দুটো জ্যান্ত ইঁদুর প্রদর্শন করায় এতে তাদের বিক্রি পাঁচ গুণ বেড়ে যায়।

জেমস বি. বয়ন্টন, দি আমেরিকান উইকলির জনৈক কর্তাব্যক্তি। তার একটা মার্কেট রিপোর্ট বানানো দরকার ছিল। তিনি কাজ করতে গিয়ে নানা বাধার সামনে পড়েন। শেষ অবধি তাঁর কাজের পদ্ধতি বদল করার ফলেই তিনি সফল হতে পারেন অপরকে তিনি তর্ক না করে স্বমতে আনেন।

অতএব অপরকে স্বমতে আনতে চাইলে ১১নং নিয়ম হল :

আপনার ভাবনাকে নাটকীয় করে তুলুন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যখন অন্য কিছুতে কাজ হয় না, এটা চেষ্টা করুন

চার্লস শোয়াবের কারখানার একজন ম্যানেজার ছিল, তাঁর কর্মচারিরা ঠিকমত কাজ করত না।

শোয়াব তাই জানতে চাইলেন : 'এটা কি রকম ব্যাপার যে আপনার মত পাকা লোকও কারখানার উৎপাদন ঠিক মত করাতে পারছেন না?

'তা জানি না' লোকটি জবাব দিল, 'আমি সকলকে চাপ দিচ্ছি, নানাভাবে চেষ্টা করছি, ভয়ও দেখিয়েছি, চাকরি খতম করতে চেয়েছি। কিন্তু কিছুতেই কাজ হয়নি। ওরা উৎপাদন করছে না।'

তখন দিনের কাজ শেষ হয়ে রাতের শিফট শুরু হতে চলেছে।

'আমাকে এক টুকরো চকখড়ি দিন তো।' শোয়াব বললেন। তারপর কাছাকাছি থাকা কর্মীটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আজকের শিফটে কত উৎপাদন করেছ?

'ছয়।'

আর কোন কথা না বলে শোয়বব মেঝের বুকে বড় করে একটা 'ছয়' সংখ্যা লিখে চলে গেলেন।

রাত্রে শিফট শুরু হলে কর্মীরা 'ছয়' সংখ্যাটা দেখে এর মানে জানতে চাইল।

'বড় কর্তা এসেছিলেন, দিনের শিফটের কর্মীটি জানাল। তিনি জানতে চান আমরা কত উৎপাদন করেছি এবং তিনি চকখড়ি দিয়ে ওটা লেখেন।'

পরদিন সকালে শোয়াব এসে দেখলেন রাতের শিফটের কর্মীরা ৬ সংখ্যাটা মুছে বড় করে একটা '৭' লিখে গেছে।

পরের দিন, দিনের শিফটের কর্মীরা কাজ করতে এসে বড় আকারে লেখা '৭' কথাটা লক্ষ্য করলো। ওঃ তাহলে রাতের শিফট মনে করে তারা দিনের শিফটের চেয়ে ভালো? বেশ ওরা রাতের শিফটকে কিছু শিক্ষা দিতে তৈরি হল। তারা যাওয়ার সময় মেঝের বড় অক্ষরে '১০' সংখ্যাটি লিখে যায়। ঘটনা গড়িয়ে চললো।

যে মিলটি এতদিন উৎপাদন হ্রাসের সমস্যায় ভুগছিল, তাতে এখন থেকে অন্য মিলের তুলনায় উৎপাদন ঢের বেশি হতে লাগল।

এক্ষেত্রে কৌশলটি কী?

চার্লস্ শোয়বের নিজের কথাতেই শুনুন।

'কাজ করাতে হলে প্রথমে প্রয়োজন কিছু প্রতিযোগিতার মনোভাব আনা। টাকা আয় বা আদায় করার কথা বলছি না, বরং অন্যকে হারানোর মনোভাব। অন্যকে হারানোর ইচ্ছা! একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা! মানুষ প্রতিযোগিতা ভালোবাসে।

প্রতিযোগিতার মনোভাব না থাকলে থিয়োডোর রুজভেল্ট কখনই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন না। কিউবা থেকে ফিরে আসার পর তিনি সবেমাত্র নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্ণর হন। বিরোধীরা দেখতে পেলেন রুজভেল্ট ওই রাজ্যের একজন আইনসম্মত অধিবাসী নন। রুজভেল্ট ভয় পেয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে চাইলেন। এবার টমাস কলিয়ার কাজে নামলেন। তিনি আচমকা থিয়োডোর রুজভেল্টকে চিৎকার করে বললেন সান জুয়ান পাহাড়ের বীর কি কোন কাপুরুষ?

রুজভেল্ট লড়াই করতে মনস্থ করলেন-এরপরের ঘটনা তো ইতিহাস। এই চ্যালেঞ্জ তার জীবনকেই শুধু বদলে দেয়নি বরং এতে জাতির জীবনেও একটা ছাপ পড়েছিল।

চার্লস্ শোয়াব প্রতিযোগিতার দারুণ ক্ষমতার কথা জানতেন। এই রকমই আবার জানতেন অলস্মিথও।

অলস্মিথ যখন নিউ ইয়র্কের গভর্ণর ছিলেন তখন তাকে কঠিন কাজে নামতে হয়। পশ্চিম ডেভিন আইল্যাণ্ডের সবচেয়ে জঘন্য জেলখানা সিংসিং-এ জঘন্য সমস্ত কাণ্ড কারখানা চলেছিল। অত্যন্ত কুৎসিত কাজের গুজবও ছড়াচ্ছিল। স্মিথের দরকার ছিল সিংসিংকে শাসনে রাখার জন্য একজন কড়া প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু কে সেই লোক। তিনি নিউ হ্যাঁম্পটনের লুইস ই. লজকে ডেকে পাঠালেন।

‘সিংসিং কারাগারের দায়িত্ব নিতে কেমন লাগবে?’ লজকে প্রশ্ন করলেন বেশ ঠাট্টার আমেজেই স্মিথ। ‘ওখানে একজন অভিজ্ঞ মানুষ দরকার।‘

লজ বেশ অতলে তলিয়ে গেলেন। সিংসিংয়ের বিপদের কথা তার জানা ছিল। কাজটা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, রাজনীতির নানা মতও তাতে থাকবে। ওয়ার্ডেনরা সেখানে টিকতে পারেনি। তারা এসেছে আর গেছে। শেষজন টেকে মাত্র তিন সপ্তাহ, তার ভবিষ্যত রয়েছে। এ ঝুঁকি নেওয়া যায়?

এর পর স্মিথ ওই ইতস্তত ভাব দেখে হেসে বললেন, আপনার যেতে ভয় লাগছে। এর জন্যে আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। জায়গাটা কঠিন ঠাঁই। বেশ শক্ত মানুষই ওখানে চাই।

হুঁ স্মিথ তাহলে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন, তাই না? লজ তাই কোন শক্ত মানুষের কাজটাই নিয়ে দেখবেন ভাবলেন।

অতএব তিনি সেখানে গেলেন আর টিকেও গেলেন। তিনি হয়ে গেলেন জীবিত কারারক্ষীদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান পুরুষ। তাঁর লেখা বই 'সিংসিং কারাগারে কুড়ি বছর লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। বেতারে তিনি ভাষণ দেন, তার কারাগারের অভিজ্ঞতা নিয়ে বহু চলচ্চিত্র অনুপ্রাণিত হয়েছে। তাছাড়া অপরাধীদের সংশোধনে তার সংস্কারগুলি কারা সংস্কারে প্রেরণা জুগিয়েছে।

ফায়ার স্টোন নামের বিখ্যাত রবার প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হার্ভে এম. ফায়ারষ্টোন একবার বলেন, শুধু মাইনে দিয়ে বিখ্যাত আর ভালো মানুষদের ধরে রাখা যায় না। আমার মনে হয় একটা খেলোয়াড়ী বৃত্তিই আসল...।

এটাই প্রত্যেক সফল মানুষ ভালোবাসেন : খেলা। আত্মপ্রকাশের সুযোগ। নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করে বিজয়ী হওয়া। নানারকম খেলার এটাই মূল কথা : প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়া, বিজয়ী হওয়ার আকাঙক্ষা। আত্ম গুরুত্বের এটাই পথ।

অতএব আপনি যদি শক্তিশালী মানুষদের জয় করতে চান তাদের স্বমতে আনতে চান ১২নং নিয়ম হলো :

'একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিন।'

অল্পকথায় অপরকে স্বমতে আনার বারোটি পথ :

১: তর্কে জেতার সব সেরা উপায় হলো তর্কে যোগ না দেওয়া।

২: অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান। কখনও অপরের ভুল ধরবেন না।

৩ : আপনার ভুল হলে আন্তরিকতার সঙ্গে তার স্বীকার করুন।

৪ : বন্ধুত্বপূর্ণ পথে শুরু করুন।

৫: অপরকে হ্যাঁ বলতে দিন।

৬: অন্যকেই বেশি কথা বলতে দিন।

৭: অপরকে ভাবতে দিন মতলবটি তারই।

৮ : আন্তরিকতার সঙ্গে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখুন।

৯ : অন্যের ধারণার প্রতি আন্তরিক হোন।

১০: অপরের মহত্বের প্রতি আবেদন রাখুন।

১ : আপনার ভাবনায় নাটকীয়তা আনুন।

১২: চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অন্যের দোষ ধরতে হলে এইভাবে শুরু করুন

আমার একজন বন্ধু ক্যালভিন কুলিজের শাসনের সময় সপ্তাহ শেষে কিছুদিন হোয়াইট হাউসে অতিথি ছিলেন। প্রেসিডেন্ট কুলিজের ব্যক্তিগত অফিসে আসতে গিয়ে তিনি একদিন কুলিজকে তাঁর সেক্রেটারিকে বলতে শোনেন, আজ সকালে ভারি সন্দুর পোশাক পরেছ তুমি, তোমাকে খুবই সুন্দর লাগছে।'

অল্পকথার মানুষ ক্যালভিন বোধ হয় এমন প্রশংসা জীবনে আর কাউকে করেন নি। ব্যাপারটা এমনই অভাবিত যে সেক্রেটারি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। কুলিজ এবার বললেন, 'ঘাবড়ে যেও না। তোমার ভালো লাগার জন্যেই বললাম কথাটা। এবার থেকে আশা করবো তুমি ব্যাকরণের দিকে একটু নজর দেবে।'

তাঁর পদ্ধতিটা সম্ভবত একটু সোজাসুজি রকমই তবে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান চমঙ্কার। প্রায় সব সময় ভালো কিছু শোনার পরেই খারাপ কথা শোনা বোধহয় ভালো।

নাপিত দাড়ি কামানোর আগে সাবান ঘসে দাড়ি নরম করে নেয়। ১৮৯৬ সালে ম্যানিলে ঠিক এই রকমই করেছিলেন প্রেসিডেন্টপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগে। ওই সময়ের একজন বিখ্যাত রিপাবলিকান একটা বক্তৃতার খসড়া এনেছিলেন যেটা তার মনে হল সিনেরো বা প্যাট্রিক হেনরি বা ড্যানিয়েল। ওয়েবন্টারের চেয়ে ভালো আর সকলে এক সঙ্গে জড়ানো। বেশ আনন্দিত হয়ে তিনি সেটা ম্যাকিনলেকে পড়ে শোনাতে লাগলেন।

ম্যাক্রিলে বললেন, বক্তৃতাটি বেশ ভালো তবে এটা চলবে না কারণ এটায় বেশ সমালোচনার ঝড় উঠতে পারে। ম্যাকিনলে কাউকে আঘাত করতে চাইলেন না। এবার দেখুন কেমন কৌশলে তিনি কাজটা করলেন।

‘প্রিয় বন্ধু, বক্তৃতাটা চমৎকার, দারুণ’ ম্যাকিনলে বললেন। এরচেয়ে ভালো আর কেউ লিখতে পারতো না। অনেক ক্ষেত্রেই এ বক্তৃতা দিলে ভালো হতো, কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি এটা যোগ্য হবে? তোমার দিক থেকে এটা যোগ্যতম মনে হলেও আমাকে দলের কথাও ভাবতে হবে। এবার বাড়ি গিয়ে আমি যেমন বললাম ঠিক সেই ভাবে আর একটা বক্তৃতা লিখে আনো।

তিনি ঠিক তাই করলেন। ম্যাকিনলে এ ব্যাপারে লেখককে সাহায্য করলেন। আর ওই নির্বাচনে তিনি হয়ে উঠলেন চমৎকার বক্তৃতাকারী।

এখানে একটা চিঠি দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় এই বিখ্যাত চিঠিটি আব্রাহাম লিঙ্কন লিখেছিলেন। (তাঁর প্রথম বিখ্যাত চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন একজন মহিলাকে যুদ্ধে তাঁর পাঁচটি সন্তান হারানোর শোকে সান্ত্বনা জানিয়ে) লিঙ্কন সম্ভবত পাঁচ মিনিটের মধ্যে চিঠিটা লেখেন অথচ ১৯২৬ সালে সেটা সাধারণের কাছে নিলামে প্রায় বারো হাজার ডলারে বিক্রি হয়। সে টাকা লিঙ্কন অর্ধ শতাব্দীর কঠিন পরিশ্রমে যা সঞ্চয় করেন তার চেয়েও বেশি।

চিঠিটি ১৮৬৩ সালের ২৬শে এপ্রিল গৃহযুদ্ধের অন্ধকারময় দিনগুলোয় লেখা। আঠারো মাস ধরে লিঙ্কনের সেনাধ্যক্ষরা ইউনিয়ন বাহিনীকে পরিচালনা করলেও ভাগ্যে জুটছিল

শুধু একটার পর একটা বিষাদময় পরাজয়। যা ঘটছিল তা কেবল অর্থহীন মূর্খের মত হত্যাকাণ্ড। সারা দেশ শিহরিত হচ্ছিল। হাজার হাজার সেনা সৈন্যবাহিনী ছেড়ে চলে যায় আর এমনকি রিপাবলিকান সদস্যরাও সিনেটে বিদ্রোহ করে লিঙ্কনকে হোয়াইট হাউস থেকে তাড়াতে চাইছিলেন। লিঙ্কন সে সময় বলেন, আমরা ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। আমার মনে হচ্ছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরও আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। আমি কণামাত্র আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। অন্ধকার মাখা এমনই এক দুঃখের আর বিপদের দিনেই চিঠিটা লেখা হয়।

আমি চিঠিটা ছেপে ছিলাম কারণ এটার মধ্য দিয়ে দেখা যাবে লিঙ্কন কি করে একজন দুর্দান্ত সেনানায়ককে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেন যখন সেই জেনারেলের উপরেই নির্ভর করছিল সারা দেশের ভাগ্য।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর আব্রাহাম লিঙ্কন বোধহয় এই একটি মাত্র কড়া ভাষায় চিঠি লিখেছিলেন। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করবেন তিনি জেনারেল হুঁকারকে তার মারাত্মক ভুলের কথা বলার আগে কিভাবে প্রশংসা করেছিলেন।

হ্যাঁ, ভুলগুলো মারাত্মকই ছিল। কিন্তু লিঙ্কন তা বলেন নি। লিঙ্কন ছিলেন ঢের বেশি রক্ষণশীল আর অনেক বেশি কূটনীতিক। লিঙ্কন লেখেন : ‘এমন কিছু ব্যাপার রয়েছে যাতে আপনার সম্বন্ধে আমি সন্তুষ্ট নই। কৌশল কূটনীতি কাকে বলে!’

মেজর জেনারেল হুঁকারকে যে চিঠি লেখা হয় সেটা এই রকম :

'আমি আপনাকে পটোম্যাকের সেনাবিভাগের প্রধান আসনে বসিয়েছি। অবশ্য আমার একাজ করার মধ্যে উপযুক্ত কারণ ছিল, তা সত্ত্বেও আমার ধারণা, আর সেটা আপনারও জানা দরকার যে অনেক ব্যাপারেই আপনার কাজে আমি সন্তুষ্ট নই।'

'আমি বিশ্বাস করি আপনি একজন সাহসী আর দক্ষ সৈনিক। সেটা অবশ্যই আমার পছন্দ। আমার আরও বিশ্বাস আপনার কাজের মধ্যে আপনি রাজনীতি মেশান না, যেটা ঠিক পথ। আপনার নিজের উপর বিশ্বাস আছে সেটা অতি দামী গুণ হলেও একান্ত প্রয়োজনীয় নয়।

'আপনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যেটা বিশেষ সাধনার মধ্যে মন্দ করার বদলে ভালোই করে থাকে। তকে আমার মনে হয় জেনারেল বার্নসাইডের সেনাপতিত্বের সময় আপনি আপনার ওই উচ্চাকাঙক্ষা উপরেই নির্ভর করেছিলেন আর তার পরিচালনা বানচাল করতে চেয়েছিলেন, এটা করতে গিয়ে আপনি দেশের প্রভূত ক্ষতি করেছেন। আর ক্ষতি করেছেন একজন দক্ষ সম্মানিত সহ-অফিসারেরও।'

'আমি শুনেছি আর সেটা বিশ্বাস করার মতই যে আপনি সম্প্রতি বলেছেন সেনাবাহিনী আর সরকারেরও এই দুয়েরই একজন নায়ক দরকার। অবশ্য এর জন্য নয়, এটা জানা সত্ত্বেও আমি আপনাকে সেনাধ্যক্ষ করেছি।'

'একমাত্র সেইসব জেনারেলরাই একনায়ক হতে পারেন যারা সফল হন। আমি এখন যা চাই ত। হলো সামরিক সাফল্য আর তাই আমি ওই একনায়কত্বের ঝুঁকি নেব।'

'সরকার আপনাকে তার সমস্ত ক্ষমতা দিয়েই সাহায্য করবে, এর আগে সরকার সেনাধ্যক্ষদের যে সাহায্য করেছে সেইরকম সাহায্য। আমার ভয় হচ্ছে যে আপনি আপনার সেনাদলের মধ্যে সেনাপতিকে সমালোচনা করার প্রবৃত্তি জাগিয়েছেন আর তাঁর বিশ্বাস হারিয়েছেন, এবার সেটাই আপনার উপর পরিচালিত হবে। এ রকম ব্যাপার যাতে না ঘটে তার জন্য আমি আপনাকে সাহায্য করবো।'

'আপনি বা নেপোলিয়ন, তিনি যদি এখন বেঁচে থাকতেন, দুজনের কেউই এ ধরনের মনোভাব থাকলে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে কোন ভালো কাজ আদায় করতে পারতেন না। তাই হঠকারিতা করবেন না। হঠকারিতা থেকে সর্তক থাকুন। কিন্তু ক্ষমতা আর দ্রািবিহীন সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে আমাদের জয় এনে দিন।

আপনি কুলিন, ম্যাকিনলে বা একজন লিঙ্কন নন। আপনি জানতে চাইবেন প্রতিদিনের ব্যবসায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই দর্শন চলবে কিনা। চলবে কি? দেখা যাক। এবার ফিলাডেলফিয়ার ওয়ার্ক কোম্পানীর ডব্লিউ. পি. গকের ব্যাপারটাই দেখা যাক। মি. গক আমার বা আপনার মতই একজন সাধারণ নাগরিক। তিনি ওখানে আমার ক্লাসের এক ছাত্র থাকার সময় এই ঘটনার কথা বলেছিলেন।

ওয়ার্ক কোম্পানীর ফিলাডেলফিয়ায় একটা বিরাট অফিস বাড়ি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তৈরি করার কথা ছিল। বাড়ির কাজ ঠিক মতই হয়ে চলেছিল আর প্রায় শেষও হয়ে এসেছিল। আচমকা একজন সরবরাহকারী জানালো যে সে কারুকাজ করা ব্রোঞ্জের জিনিসগুলো নির্দিষ্ট সময় মত সরবরাহ দিতে পারবেন না। কি! সারা বাড়িটা আটকে যাবে? প্রচুর জরিমানা হবে! প্রচুর ক্ষতিও হবে! আর সেটা মাত্র একজনের জন্য।

শুরু হলো দূরগামী টেলিফোন কথাবার্তা। তর্কাতর্কি। বেশ গরম কথাবার্তা। সবই বৃথা। এরপর মিঃ গককে ব্রোঞ্জের সিংহকে তার গুহাতেই রাখবার জন্যে পাঠানো হলো নিউইয়র্কে।

‘আপনি কি জানেন ব্রুকলীনে আপনার নামে একমাত্র আপনিই আছেন?’ প্রেসিডেন্টের অফিসে ঢুকতে ঢুকতে মিঃ গক বললেন। প্রেসিডেন্ট একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, ‘না, এটা তো জানতাম না।’

মিঃ গক এবার বললেন, ‘আজ সকালে যখন ট্রেন থেকে নামলাম, টেলিফোন বইয়ে আপনার ঠিকানা দেখছিলাম। দেখলাম ব্রুকলীনে আপনিই ওই নামের একমাত্র মানুষ।‘

টেলিফোন বইটা দেখে নিয়ে প্রেসিডেন্ট আগ্রহের সঙ্গে বললেন, কই আমার তো জানা ছিল না, হ্যাঁ, নামটা একটু অসাধারণ তা ঠিক। আমাদের পরিবার আসে হল্যাণ্ড থেকে আর নিউইয়র্কে বাস করতে থাকেন প্রায় দুশ বছর আগে। তিনি তাঁর পরিবারের নানা কাহিনী বেশ কিছুক্ষণ ধরে শোনাতে চাইলেন। তাঁর কথা শেষ হলে মিঃ গক তাকে প্রশংসা করে বললেন তাঁর কারখানাটি কত বড় আর যে সব কারখানা দেখেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো। মিঃ গক বললেন, আমার দেখা ব্রোঞ্জ কারখানাগুলোর মধ্যে এ কারখানাই সবচেয়ে সুন্দর আর পরিষ্কার।

‘সারা জীবনের প্রচেষ্টায় এ কারখানা গড়ে তুলেছি প্রেসিডেন্ট বললেন, এ নিয়ে তাই আমার গর্ব আছে। একবার কারখানাটা ঘুরে দেখবেন?’

দেখার সময় মিঃ গক জিনিসপত্র তৈরির কৌশল দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। তিনি জানালেন অন্যান্য সব কারখানার চেয়ে এটি কত ভালো। মিঃ গক মেশিনগুলি দেখে প্রশংসা করতেই প্রেসিডেন্ট জানালেন এসব তাঁরই আবিষ্কার। তিনি অনেকক্ষণ ধরে মিঃ গককে সব কাজের পদ্ধতিগুলো দেখিয়ে দিলেন। তিনি মিঃ গককে মধ্যাহ্ন ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত মনে রাখবেন, মিঃ গক তাঁর এখানে আসার কারণ সম্পর্কে একটিও কথা বলেননি।

মধ্যাহ্নে ভোজের পর প্রেসিডেন্ট বললেন, হ্যাঁ, এবার কাজের কথায় আসা যাক। স্বাভাবিক ভাবেই আমি জানি আপনি কেন এসেছেন। আমি ভাবিনি আমাদের সাক্ষাত্তার এত সুন্দর হবে। আপনি ফিলাডেলফিয়ায় আমার এই আশ্বাস নিয়ে ফিরে যেতে পারেন যে সমস্ত জিনিস তৈরি করে ঠিক মতই পাঠিয়ে দেওয়া হবে, আর সেটা অন্য কাজ চেপে দিয়ে।

চাইতেই মিঃ গক যা দরকার সবই পেয়ে গেলেন। সমস্ত জিনিস সময় মত পৌঁছে গেল আর বাড়ি তৈরীর কাজও চুক্তির ঠিক দিনেই শেষ হল।

এটা কি হতে পারতো মিঃ গক যদি এ রকম ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মত তর্কাতর্কি করতেন?

অতএব মানুষের মনে আঘাত না দিয়ে বা দোষ না দিয়ে তাকে বদলাতে হলে এক নম্বর নিয়ম হল :

প্রশংসা আর আন্তরিকতা দিয়েই শুরু করুন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ঘৃণার উদ্রেক না করে কীভাবে সমালোচনা করবেন

চার্লস্ শোয়াব একবার তার ইস্পাতের মিল ঘুরে দেখার সময় লক্ষ্য করলেন কিছু কর্মী ধূমপান করছে। তাদের ঠিক মাথার উপরেই লেখা ছিলো ‘ধূমপান নিষেধ’। শোয়ব কি লেখাটা দেখিয়ে বললেন ‘তোমরা পড়তে জানো?’ ‘ওহ্ না, শোয়ব এরকম ছিলেন না।‘ তিনি কর্মচারিদের কাছে এগিয়ে গেলেন আর প্রত্যেকের হাতে একটা করে চুরুট দিলেন আর বললেন, ‘তোমরা এগুলো বাইরে গিয়ে খেলে ভালো হয়।‘ তারা জানতো শোয়ব বুঝেছেন কাজটা তারা অন্যায় করেছে-তা সত্ত্বেও তারা তাকে প্রশংসা করলো কারণ তিনি দোষটার জন্য কিছুই বলেন নি আর তাদের অহমিকায় আঘাত দেননি! এরকম লোককে আপনি ভালো না বেসে পারবেন না। নয় কি?

জন ওয়ানামেকারও একই পদ্ধতি নিয়েছিলেন। তিনি ফিলাডেলফিয়ায় তার বিরাট দোকানে প্রায় রোজই ঘুরে দেখতেন। একদিন দেখলেন একটি মেয়ে কোন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ বিক্রেতারা কেউ কোথাও নেই। তারা একপাশে জটলা করে কথাবার্তা আর হাসিঠাট্টায় ব্যস্ত। ওয়ানামেকার একটাও কথা বললেন না। নিঃশব্দে কাউন্টারের পিছনে গিয়ে তিনি মেয়েটির যা দরকার এনে দিয়ে কর্মচারিদের প্যাকিং করতে দিয়ে গেলেন।

১৮৮৭ সালের ৮ই মার্চ সুন্দর বক্তা হেনরি ওয়ার্ড রীচার মারা যান, বা জাপানীদের কথায় নতুন জগতে যান। পরের রবিবার লিম্যান অ্যাবেটকে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলার

জন্য আবেদন জানানো হয়। সব সেরা কথিকা বানাবার জন্য লিম্যান ফ্লবেয়ারের মতই ঘসামাজা করে দারুণ একটা বক্তৃতা লিখে তার স্ত্রীকে পড়ে শোনালেন। বক্তৃতাটা মোটেও ভালো হয়নি ঠিক যেমন বক্তৃতা লেখা হয়। তার স্ত্রীর যদি বুদ্ধি কম থাকতো তিনি বলতেন, 'লিম্যান, একদম বাজে হয়েছে, এটা চলবে না। শ্রোতারা এটা শুনে ঘুমিয়ে পড়বে। এটা একেবারে বিশ্বকোষের মত হয়েছে। সাধারণ জিনিস লেখ, এসব পড়লে তোমার দর কমে যাবে।'

এটাই হয়তো তিনি বলতেন। আর বললে কি হত নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তার স্ত্রীও তা জানতেন। তাই তিনি কেবল বললেন যে লেখাটা নর্থ আমেরিকান রিভিউ'র জন্যে চমৎকার হয়েছে। তিনি বেশ প্রশংসা করে নরম করে বললেন লেখাটা বক্তৃতার মত হয়নি। লিম্যান অ্যাবেট ব্যাপারটা বুঝলেন আর যত্ন করে লেখা বক্তৃতাটা ছিঁড়ে ফেললেন আর কিছু না লিখেই টানা বক্তৃতা দিয়ে গেলেন।

অতএব আপত্তি না জানিয়ে বা দোষ না ধরিয়ে মানুষকে বদলাতে ২নং নিয়ম হল : মানুষের দোষ, ঘোরানো পথই দেখান।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

আগে নিজের ভুলের কথা বলুন

কয়েক বছর আগে, আমার ভাইঝি জোসেফাইন কার্নেগী কানসাস সিটির বাড়ি থেকে নিউইয়র্কে আমার সেক্রেটরির কাজ করতে আসে। ওর বয়স উনিশ, তিনবছর আগে উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ও স্নাতক হয়। তবে ওর ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার ঝুলি ছিলো শূন্য। আজ সে সুয়েজ খালের পশ্চিম এলাকার মধ্যে সবসেরা একজন সেক্রেটারি। তবে গোড়ার দিকে সে অনেক কিছুই জানতো না। একদিন আমি যখন ওকে একটু সমালোচনা করতে গেলাম, আমি নিজেকেই বললাম এক মিনিট দাঁড়াও ডেল কার্নেগী, এক মিনিট দাঁড়াও। তোমার বয়স জোসেফাইনের দুগুণ। তোমার ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতাও দশহাজার গুণ বেশি। তুমি কেমন করে আশা কর যে তোমার মতই দৃষ্টিকোণ, বিচার বুদ্ধি, আগ্রহ ইত্যাদির অধিকারী হবে-তোমার সে বিচার বুদ্ধি যত সাধারণই হোক? এক মিনিট দাঁড়াও। ডেল, তুমি উনিশ বছর বয়সে কি করেছো? মনে পড়ে তোমার সেই ভুলগুলো? বোকার মত তোমার সেই সব ভুল। মনে করে দেখ তুমি এই সব করেছো....তাছাড়া...?'

বেশ কিছুক্ষণ সব ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় আর নিরপেক্ষতার সঙ্গে ভেবে নিয়ে আমি স্থির সিদ্ধান্ত করলাম যে জোসেফাইনের ব্যাটিংয়ের গড় আমার উনিশ বছর বয়সের ব্যাটিং গড়ের চেয়ে ঢের ভালো আর–আর আমি দুঃখিত যে জোসেফাইনকে তার প্রাপ্য প্রশংসা দিতে চাইছি না।

অতএব এরপর থেকে জোসেফাইনের কিছু ভুল ধরিয়ে দেবার আগে আমি বলতাম, একটা ভুল করেছ, জোসেফাইন। তবে ইশ্বর জানেন, আমি যা ভুল করি তার চেয়ে খারাপ নয় এগুলো। তুমি তো বিচার বুদ্ধি নিয়ে জন্মাও নি, এসব আসে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তোমার বয়সে আমি যা ছিলাম তার চেয়ে তোমার অবস্থা ভালো। তোমার মত বয়সে আমি যেসব বোকার মত ভুল করেছি তাতে তোমাকে আর সমালোচনা করার মত ইচ্ছে নেই। কিন্তু ভেবে দেখ তুমি অন্য রকম হলে আরও ভালো হতো। তাই না?

নিজের ক্রুটির কথা বক্তা আগেই শোনাতে চাইলে শ্রোতার পক্ষে তার সমালোচনা শোনা সহজই হয়।

১৯০১ সালে প্রিন্স ফন বুলো এরকম ব্যবহার করার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করেন। ফন বুলো তখন জার্মানীর ইম্পিরিয়াল চ্যান্সেলর ছিলেন। সিংহাসনে তখন ছিলেন দ্বিতীয় উইলহেলম-উইলহেল্ম অত্যন্ত বদমেজাজী আর অহঙ্কারী ছিলেন। এই উইলহেলম ছিলেন জার্মান কাইজারদের মধ্যে শেষ যিনি মহাশক্তিশালী সেনাদল আর নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এই সেনাবাহিনী নিয়ে তার অত্যন্ত অহঙ্কারও ছিলো। ঐ বাহিনী দিয়ে তিনি নাকি যা ইচ্ছে তাই করতে পারতেন।

একবার একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। কাইজার এমন সব কথা বলতে লাগলেন আর অস্বাভাবিক রকম করতে লাগলেন যে সারা ইউরোপ কেঁপে উঠে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। যার রেশও ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবী জুড়ে। ব্যাপারটা আরও খারাপ করে তুলতে কাইজার স্বয়ং আত্মম্ভরিতাপূর্ণ, বোকামি ভরা অদ্ভুত সব ঘোষণা করতে লাগলেন জনসাধারণের কাছে। তিনি এসব করলেন ইল্যাণ্ডে যখন তিনি অতিথি হিসেবে ছিলেন।

আরও মজার কথা হল রাজকীয় বদান্যতায় এসব তিনি ডেইলি টেলিগ্রাফে প্রকাশ করতেও দিলেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন, জার্মান হিসেবে তিনিই একমাত্র মানুষ যে ইংল্যাণ্ডের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। তিনি জাপানের বিরুদ্ধে এক নৌবাহিনী গড়ে তুলছেন এবং তিনিই একমাত্র লোক যিনি রাশিয়ার আর ফ্রান্সের হাতে ইংল্যাণ্ডের হেনস্থা আটকান। একমাত্র তারই পরিকল্পনায় ইংল্যাণ্ডের মানুষ দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধে জয়লাভ করে...ইত্যাদি।

একশ বছরের মধ্যে শান্তির সময় কোন ইউরোপীয় রাজার মুখ থেকে এ ধরনের অদ্ভুত কথা বেরোয়নি। সারা মহাদেশে এ নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেল। ইংল্যাণ্ডে সকলে ক্ষেপে আগুন। জার্মানীর রাজনীতিকরা শিউরে উঠলেন। এই রকম হৈ হট্টগোলে কাইজার ভয় পেয়ে গেলেন আর ইম্পিরিয়াল চ্যান্সেলর ফন বুলোকে বললেন যে, তিনি যেন সকলকে জানিয়ে দেন এসব কিছুর দায়িত্ব তারই। তিনিই সম্রাটকে এই অদ্ভুত কথাগুলো বলার জন্যে উপদেশ দেন।

ফন বুলো প্রতিবাদ করে বললেন, 'কিন্তু মহান সম্রাট, জার্মানী বা ইংল্যাণ্ডের কেউ বিশ্বাসই করবেন আমি আপনাকে এমন উপদেশ দিতে পারি।'

যে মুহূর্তে কথাগুলো ফন বুলোর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো তিনি বুঝতে পারলেন যে মারাত্মক একটা ভুল করেছেন। কাইজার ক্ষেপে উঠলেন।

'তুমি আমায় গাধা মনে করো? তিনি চিৎকার করে উঠলেন। তুমি যে ভুল করতে পারো না ভাবো আমি তাই করতে পারি।'

ফন বুলো বুঝলেন সমালোচনার আগে তার প্রশংসা করা উচিত ছিল। তবে দেরী হয়ে গেছে, তখন সেই অবস্থায় সবচেয়ে যা ভালো তিনি তাই করলেন। সমালোচনার পর তিনি প্রশংসা করলেন। আর তাতে অলৌকিক কাণ্ড ঘঠে গেল–প্রশংসায় যা হয়।

তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন 'আমি কখনই তা বলছি না', 'অনেক ব্যাপারেই সম্রাট আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, শুধু নৌবাহিনী বা সামরিক ব্যাপারেই নয়। তারচেয়েও আপনার গভীর জ্ঞান আছে বিজ্ঞানে। আমি বহুবার অবাক হয়ে শুনেছি সম্রাট কি চমৎকার ভাবে ব্যারোমিটার, বেতার টেলিগ্রাফ বা রঞ্জন রশ্মি সম্পর্কে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। রসায়ন বা পদার্থ বিদ্যায় আমার কোনই জ্ঞান নেই, স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনার সম্বন্ধে ও আমার কোন ধারণাই নেই। ফন বুলো বলে চললেন, এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যেহেতু আমার কিছু ঐতিহাসিক জ্ঞান আছে' এটা বিশেষ করেই কাজে লাগে কূটনীতিতে।

কাইজার খুশি হয়ে উঠলেন। ফন বুলো তার প্রশংসা করেছে। ফন বুলো তাঁকে উঁচুতে তুলে নিজের সমালোচনা করেছে। এসবের পর কাইজার ওর সব অপরাধই ক্ষমা করলেন। তিনি তাই উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'তোমাকে বলিনি যে আমরা দুজনে দুজনের পরিপূরক? আমাদের দুজনে একসাথে থাকা উচিত আর তা থাকবোও।'

তিনি ফন বুলোর সঙ্গে একবার নয় বেশ কয়েকবার করমর্দন করলেন। শুধু তাই নয় ওইদিনই একসময় তিনি বেশ উৎসাহের সঙ্গে ঘুসি পাকিয়ে বললেন, কেউ যদি প্রিন্স ফন বুলোর বিরুদ্ধে কিছু বলে তাহলে তার নাকে ঘুসি মারবো।'

ফন বুলো সময় মতই নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন–কিন্তু কৌশলী কূটনীতিক হয়েও তিনি একটা ভুল করেন। তার উচিত ছিল সম্রাটকে প্রশংসা করে নিজের সমালোচনা করে শুরু করা। তার মোটেই উচিত হয়নি। সম্রাটকে বুদ্ধিহীন বলা কিংবা তাঁর একজন অভিভাবক দরকার ইত্যাদি ইঙ্গিত করা।

যুদ্ধ কাইজারকে যদি কিছু আত্মসমালোচনার কথা শান্ত করতে পারে আর তাকে বন্ধু করে তুলতে সক্ষম হয়, তাহলে ভেবে দেখুন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই রকম কাজ মানুষকে কি করতে পারে: মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঠিক ভাবে ব্যবহার করলে এতে ভোজবাজীর মতই কাজ হয়।

অতএব কারও মধ্যে ক্রোধ বা অসন্তোষ না জাগিয়ে তাকে পরিবর্তিত করতে তিন নম্বর নিয়ম হল : অপরের সমালোচনা করার আগে নিজেকে সমালোচনা করুন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কেউই হুকুম পছন্দ করে না

সম্প্রতি আমি আমেরিকার মানুষের জীবনী লেখিকাঁদের ডীন মিস ইডা টারবেলের সঙ্গে ডিনারে অংশ নিয়েছিলাম। আমি তাঁকে যখন বললাম আমি এই বইটা লিখছি, তখন মানুষের সঙ্গে চলার বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আমাদের আলোচনা হয়। আমায় জানালেন তিনি যখন ওয়েন ডি. ইয়ংয়ের জীবনী রচনা করেছিলেন তখন ইয়ংয়ের সঙ্গে তিন বছর একই অফিসে বসেছেন, এমন একজন মানুষের তিন ঘন্টা ধরে সাক্ষাৎকারও নিয়েছিলেন। লোকটি জানিয়েছিল সারা জীবনে তিনি কখনও দেখেননি ইয়ং কাউকে সরাসরি কোন হুকুম করেন। তিনি সব সময়ই উপদেশ দান করতেন। উদাহরণ হিসেবে ওয়েন ডি ইয়ং কখনই বলেন নি, ‘এটা কর, ওটা কর’ বা ‘এটা কোরো না, ওটা কোরো না। বরং প্রায়ই তিনি বলতেন, এটা ভেবে দেখতে পারেন বা আপনার কি মনে হয় এতে কাজ হবে? কোন চিঠি লিখতে দিয়ে শেষ হলে তিনি বলতেন, ‘এটা তোমার কি রকম মনে হয়?’ বা চিঠির ভাষার একটু বদলে দিলে কেমন হয়? তিনি প্রায় সব সময়েই লোককে কাজ করার সুযোগ দিতেন। তিনি তাদের কাজের মধ্য দিয়েই ভুল সংশোধন করতে দিতেন।

এরকম কৌশলের ফলে ভুল সংশোধনের সুবিধাই করে দিতেন তিনি। এইরকম কৌশলে মানুষের অহঙ্কারবোধ বজায় থাকে আর নিজের গুরুত্ববোধও থাকে। তাকে বিদ্রোহ না করে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

অতএব অপরকে ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট না করে বদলাতে হলে ৪ নম্বর নিয়ম হল :

'সরাসরি হুকুম না করে প্রশ্ন রাখুন।'

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

অপরকে মুখ রক্ষা করতে দিন

বেশ কবছর আগে চার্লস্ স্টাইনমেজকে কোন ডিপার্টমেন্টের প্রধানের পদ থেকে সরানোর ব্যাপারে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী মহা সমস্যায় পড়ে। হিসাবরক্ষা দপ্তরের প্রধান হিসেবে তিনি অচল হলেও বিদ্যুতের ব্যাপারে তাঁর প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। তাই কোম্পানি তাকে কোন ভাবেই আঘাত দিতে, চাননি। তিনি ছিলেন অপরিহার্য-আর অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাই তাঁরা তাঁকে একটা পদবী দিলেন। তারা তাঁকে করে দিলেন জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার–এই নতুন পদবী নিয়েই তিনি কাজ করছিলেন। এর ফলে অন্য একজন ডিপার্টমেন্টের ভার নিলেন।

স্টাইনমেজ খুশি হলেন।

জেনারেল ইলেকট্রিকের অফিসাররাও খুশি হলেন কারণ তাঁদের সব সেরা তারকাকে নিয়ে কোনরকম ঝড় না তুলেই কাজটা তারা সমাধা করলেন–এটা করা হল তাঁকে মুখ রক্ষা করতে দিয়েই।

তাঁকে মুখ রক্ষা করতে দিয়ে! কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা! অথচ আমরা ব্যাপারটা নিয়ে প্রায় চিন্তাই করি না! আমরা অপরের অনুভূতিকে চিন্তা না করেই আঘাত করি, অন্যের দোষ খুঁজি, ভয় দেখাই, কোন শিশুকে অন্যের সামনে বকাবকি করি। এটা করতে গিয়ে অপরের মনকে আমল দিতে চাই না। অথচ সামান্য একটু চিন্তা, দুটো

সহৃদয়তা মাখা কথা, অপরের মনকে বোঝার চেষ্টা করলে কি চমৎকার ভাবে সব সমস্যা মিটে যেতে পারে। তাতে আঘাত দূর হয়ে যায়।

আমাদের মনে রাখা দরকার যখন ভবিষ্যতে কোন চাকর বা কর্মচারিকে বরখাস্ত করার প্রয়োজন হবে তখন আমাদের এটা চিন্তা করে দেখা উচিত।

'মানুষকে কর্মচ্যুত করা তামাশার ব্যাপার নয়। বরখাস্ত হওয়া তো আরও নয়।' কথাটা অবশ্য আমার নয় আমার এক বন্ধু এ. গ্রেঞ্জারের। তিনি একজন পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তাঁর একটা চিঠি উল্লেখ করছি :

আমাদের ব্যবসা হলো প্রধানতঃ মরসুমী। তাই অনেককেই মার্চ মাসে ছেড়ে দিতে হয়। আমাদের ব্যবসাতে একটা চলতি কথা আছে কেউই কুল চালিয়ে আনন্দ পায় না। আর তার ফলে একটা রীতি গড়ে উঠেছে যে কাজটা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ করলেই ভালো। সেটা এই ভাবে বলুন, মিঃ স্মিথ; মরসুম কেটে গেছে তাই আপনার জন্য আর কোন কাজ দেখছি না। অবশ্য আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কাজের মরসুম প্রায় শেষ, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যাদের কথাগুলো বলা হতো তাদের অবশ্যই এগুলো শ্রুতিমধুর লাগত না, তারা ভাবতো তাদের ঠকানো হয়েছে। তাদের অনেকেই হিসেবপত্র রক্ষার কাজে কাটিয়েছেন তাই যে প্রতিষ্ঠান তাদের এভাবে পথে বসিয়েছে তার জন্য তাদের কোন ভালবাসা থাকে না।

'আমি সম্প্রতি ঠিক করি বাড়তি কর্মচারীদের আমি একটু কৌশলে আর অনুভূতির সঙ্গেই বিবেচনা করবো। তাই আমি প্রত্যেকের শীতকালের কাজ ভালো করে বিবেচনা

করবো ভাবলাম। আমি এই রকম কিছু বললাম : মিঃ স্মিথ, আপনি চমৎকার কাজ করেছেন (যদি করে থাকেন)। সেবার আপনাকে যখন নেওয়ার্কে পাঠাই কাজটা বেশ কঠিন ছিল। আপনার বেশ কষ্ট হয়েছিল অথচ আপনি চমৎকার ভাবে সামাল দিয়ে আসেন। আমরা আপনার জন্য গর্বিত। আপনি জানেন কাজ কেমন করে করতে হয় তা যেখানেই কাজ করুন না কেন। এই প্রতিষ্ঠান আপনাকে বিশ্বাস করে। যখনই প্রয়োজন হবে আপনাকে নেওয়া হবে। আমরা চাই আপনি এটা ভুলে যাবেন না!'

'এল ফল কেমন হল? কর্মচারিরা একটু ভালো মন নিয়েই বিদায় নেয়। তারা তাদের পথে বসানো' হয়েছে ভাবে না। ওরা জানে কোন কাজ থাকলে ওদের আবার ডাকা হবে। আমরা তাদের চাইলে তারা ব্যক্তিগত ভালোবাসা নিয়ে আসে।

ভূতপূর্ব ডোয়াইট মরো দুই ঘোরতর শত্রুর মধ্যে বন্ধুত্ব চালু করার কাজে দারুণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কি ভাবে? তিনি বেশ কায়দা করে দুজনের মধ্যে কোনগুলো ঠিক সেগুলো প্রশংসা করে প্রকাশ করতেন। আর তাতে মিটমাট যেভাবেই হোকনা কেন উভয়পক্ষ যাতে সমান বিচার পায় তার চেষ্টা করতেন। এবং তিনি কখনও কোন লোককে ভুল প্রমাণ করতেন না।

আর এটাই প্রত্যেক বিচারকরা জানতেন–অপরকে তাদের মুখ রক্ষা করতে দিন।

সত্যিকারের বড় যারা, সারা দুনিয়াতেই, নিজেদের ব্যক্তিগত জয়ের ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট করার অবসর তাদের থাকে না। যেমন–

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

দীর্ঘ তিক্ততাময় শত্রুতার শত শত বছরের পর ১৯২২ সালে তুর্কিরা গ্রীকদের তুর্কিস্থান থেকে চিরকালের মত তাড়াতে বদ্ধপরিকর হয়।

মুস্তাফা কামাল নেপোলিয়নের মতই একবার তার সেনাদলের সামনে বক্তৃতা দিয়ে বললেন : 'আপনাদের লক্ষ্য হলো ভূমধ্যসাগর। সে সময় এই আধুনিককালের সবচেয়ে তিক্ততাময় যুদ্ধই তখন হচ্ছিল। তুর্কিরাই জেতে আর এরপর দুজন গ্রীক সেনাপতি ত্রিকুপিস আর ডিয়োনিস যখন কামালের সদর দপ্তরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যান তখন তুর্কিরা পরাজিত শত্রুদের ভীষণভাবে অভিশাপ দিচ্ছিল।'

কিন্তু কামালের ব্যবহারে বিজয়ীর অহঙ্কার ছিল না।

'বসুন, ভদ্রমহোদয়গণ,' তাদের করমর্দন করে তিনি বললেন। 'আপনারা অবশ্যই ক্লান্ত।' তিনি এরপর যুদ্ধের বিষয়ে আলোচনার পর তাদের পরাজয়ের বেদনা কিছুটা লাঘব করে বললেন এক সেনার অন্য সেনাকে বলার মতই : 'যুদ্ধ হলো একটা খেলার মত, এতে শ্রেষ্ঠ সেনাদল সবসময় নাও জিততে পারে।'

জয়ের চরম সন্ধিক্ষণেও কামাল এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি মনে রেখেছিলেন : এখানে আমাদের ৫ নম্বর নিয়ম :

'অপরকে মুখ রক্ষা করতে দিন।'

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

মানুষকে সাফল্যের পথে নেওয়া

আমি পিট বার্লোকে চিনতাম। পিট কুকুর আর ঘোড়ার খেলা দেখাত। সার্কাস নিয়ে তিনি সারাজীবন দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পিট নতুন নতুন কুকুরকে যেমন করে শিক্ষা দিতেন আমার দেখতে ভালো লাগতো। আমি লক্ষ্য করতাম কোন কুকুর একটু উন্নতি করলেই পিট তাকে প্রশংসা আর আদর করে মাংস খেতে দিয়ে আরও ভালো করার আগ্রহ জাগিয়ে তুলত।

ব্যাপারটা নতুন নয়। পশুদের শিক্ষা দেবার কাজে এটা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেই চলেছিল।

আমি অবাক হচ্ছি, কুকুরদের শিক্ষার কাছে আমরা যে নীতি কাজে লাগাই মানুষের বেলা তা লাগানই না কেন? চাবুকের বদলে মাংস দিতে চাই না কেন? সমালোচনার বদলে কেনই বা প্রশংসা করি না? সামান্য উন্নতি করলেও আসুন প্রশংসা করি এতে অপর লোকটির আরও উন্নতি করার আগ্রহ জাগে।

ওয়ার্ডেন লুইস ই. লজ দেখেছেন সামান্য প্রশংসাতেও কাজ হয়। তিনি ছিলেন সিংসিং কারাগারের জাঁদরেল একজন রক্ষী। এই পরিচ্ছেদ লেখার সময় তাঁর কাছ থেকে এই চিঠিটা পাই : 'আমি লক্ষ্য করে দেখেছি অপরাধীদের দোষের জন্য সব সময় সমালোচনা

আর নিন্দা করার বদলে তাদের কোন কোন সময় প্রশংসা করলে ঢের বেশি সহযোগিতা পাওয়া যায়।'

'আমাকে এখনও সিংসিং-এ ভর্তি করা হয়নি–অন্তত এখনও নয়–তবু নিজের জীবনের অতীতকে যখন মনের পর্দায় দেখি তখন বুঝি একটা মাত্র কথায় কেমন ভাবে আমার ভবিষ্যণ্টা দ্রুত বদলে যায়। আপনার নিজের সম্পর্কে একথা বলতে পারেন না! ইতিহাসে প্রশংসার অসামান্য যাদুকরী ক্ষমতার অসংখ্য প্রমাণ আছে।'

উদাহরণ হিসেবে, প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে নেপলসে ১২ বছরের একটি ছেলে কোন কারখানায় কাজ করতো। সে চাইতো গায়ক হতে, কিন্তু তার প্রথম শিক্ষক তাকে উৎসাহ দিতেন না। তিনি বলতেন, 'তুমি গাইতে পারো না। তোমার গানের গলা নেই। গলার স্বর জানালার খড়খড়ির শব্দের মতো।

কিন্তু ছেলেটির মা, এক গরিব চাষীর মেয়ে, ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলতো তার গলায় গান অদ্ভুত চমৎকার। সে ছেলেকে খুবই প্রশংসা করতো। শুধু তাই নয় তার মা বহু কষ্ট সহ্য করে ছেলের গান গাইবার ব্যবস্থা করে। গরীব চাষী মার উৎসাহ আর প্রশংসা ফলে ছেলেটির জীবনধারাই বদলে গেল। আপনারা হয়তো তার নাম শুনে থাকবেন। তার নাম কারুসো।

বেশ কয়েক বছর আগে লণ্ডনে এক তরুণ লেখক হতে চাইছিল। কিন্তু সব কিছু তার বিরুদ্ধে বলেই মনে হতো। সে চার বছরের বেশি স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি। তার বাবার জেল হয় কারণ তিনি দেনা শোধ করতে পারেন নি। ছেলেটিও দারিদ্র্যের জ্বালা

মর্মে মর্মে টের পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে ইঁদুর ভরা একটা গুদামে লেবেল আটকানোর চাকরি পেল। রাতের বেলায় সে আরও দুটো ছেলের সঙ্গে নীচু একটা চিলে কোঠায় ঘুমোত-জায়গাটা লণ্ডনের বস্তি এলাকার কোথাও ছিল। নিজের লেখার ক্ষমতার উপর তার বিশ্বাস এতই কম ছিল যে, অন্য কেউ যাতে টের না পায় আর না হাসে তাই গভীর রাতে ডাকে সে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিত। গল্পের পর গল্প অমনোনীত হতে লাগল। এটা সত্যি যে এর জন্য সে এক শিলিংও পেল না, তবু একজন সম্পাদক তার প্রশংসা করেছিল। একজন সম্পাদক তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ছেলেটি এতই বিচলিত বোধ করল যে সারা রাস্তায় সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ালো আর অশ্রুধারায় তার বুক ভেসে গেল।

ওই প্রশংসা, গল্প ছাপা হওয়ায় যে স্বীকৃতি সে পেল সেটা তার সমস্ত জীবনই একদম পালটে দিল। এই উৎসাহ সে না পেলে সারা জীবনই সে হয়তো ইঁদুর ভর্তি কারখানাতেই কাটাতে বাধ্য হতো। এ ছেলেটির নামও আপনারা জানেন। তিনি আর কেউ নন, চার্লস্ ডিকেন্স।

অর্ধশতাব্দী আগে লণ্ডনের এক শুকনো জিনিসের গুদামে আর একটি ছেলে কাজ করত। তাকে ভোর পাঁচটায় উঠে গুদাম ঝাড় দিতে হতো আর সারাদিন চৌদ্দ ঘন্টা কাজ করতে হতো। দুঃখময় এই জীবনকে সে ঘৃণা করত। দুবছর পর এটা আর তার সহ্য হলো না, তাই একদিন ভোরবেলা প্রাতরাশের জন্য অপেক্ষায় না থেকে পনেরো মাইল হেঁটে মার সঙ্গে কথা বলতে গেল। মা কোন বাড়িতে দেখাশোনার কাজ করতেন।

ছেলেটি প্রায় পাগলের মতই হয়ে গিয়েছিল। সে কেঁদে মাকে নানাভাবে সব বোঝাতে চাইল। ওই দোকানে থাকতে হলে সে আত্মহত্যা করবে বলে ভয় দেখাল। তারপর সে তার আগেকার স্কুল শিক্ষককে লম্বা একটা বেদনা ভারাক্রান্ত চিঠি লিখে জানাল, আর সে বাঁচতে চায় না। তার পুরনো শিক্ষক তাকে একটু প্রশংসা করে লিখলেন সে বুদ্ধিমান ছেলে, তার অনেক ভালো কাজ করার আছে। তিনি তাকে একটা স্কুলে শিক্ষকের চাকরিও দিতে চাইলেন।

এই প্রশংসা ছেলেটির ভবিষ্যতটাই বদলে দিল, আর ছেলেটি ইংরেজী সাহিত্যের জগতে একটা অমরত্বের ছাপ রেখে দিয়েছিল। কারণ ছেলেটি শেষ পর্যন্ত সাতাত্তরটি বই লেখে আর কলমের জোরে দশ লক্ষ ডলার আয় করে। এই পরিচিত নামটিও আপনাদের জানা। তিনি এইচ. জি. ওয়েলস্।

১৯২২ সাল নাগাত এক তরুণ ক্যালিফোর্নিয়ায় তার স্ত্রীকে নিয়ে প্রচণ্ড কষ্টে বাস করতো। সে গীর্জায় রবিবারে গান গেয়ে পাঁচ ডলারের মতো আর বিয়ের অনুষ্ঠানে গান গেয়ে কিছু রোজগার করতো। তার এতই টানাটানি ছিল যে শহরে থাকার উপায় না থাকায় আঙুর খেতের মাঝখানে একটা নড়বড়ে বাড়িতে থাকতো। এতে মাসে তার সাড়ে বারো ডলার খরচ হতো। কিন্তু ভাড়া কম হলেও সে তা দিতে পারতো না, ভাড়া বাকি পড়েছিল দশমাসের। ও আমায় বলেছিল এমন সময়ও গেছে যখন ওর শুধু আঙুর ছাড়া অন্য কিছু খাদ্য জোটেনি। সে এমনই হতাশায় ভেঙে পড়েছিল যে শেষ পর্যন্ত গানের জীবিকা ছেড়ে লরী বিক্রির কাজে যোগ দেবে বলেই ঠিক করল। ঠিক তখনই রিউপার্ট হিউজেসের এক ছোট্ট প্রশংসা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। রিউপার্ট

হিউজেস বলেছিলেন, ‘তোমার গানের গলা চমৎকার। তোমার নিউ ইয়র্কে গিয়ে গান শেখা উচিত।’

ওই তরুণ সম্প্রতি আমায় বলেছে যে ওই সামান্য প্রশংসাই তার জীবনের মোড় ঘোরানোর দাবী রাখে। কারণ এতে উৎসাহ হয়ে সে আড়াই হাজার ডলার ধার করে পূর্ব দিকে রওয়ানা হয়। ওর নামও আপনারা শুনেছেন–তিনি হলেন লরেন্স টিবেট।

লোকেদের পরিবর্তন করে দেবার কথাই ধরুন। যদি আমি বা আপনি রোজ যাদের সংস্পর্শে আসি তাদের ভিতর সম্পদের কথা প্রকাশ করি, তাহলে মানুষকে আমরা কেবল বদলে দেব না, তাদের আমুল পরিবর্তিত করতে পারি।

বাড়িয়ে বলছি? তাহলে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর উইলিয়াম জেমসের জ্ঞানগর্ভ কথাগুলো শুনে নিন। আমেরিকার তিনি হলেন সবসেরা মনস্তাত্ত্বিক আর দার্শনিক। তিনি বলেছিলেন :

‘আমাদের কি রকম হওয়া উচিত তার তুলনা করলে বলতে হয়, আমরা কেবল অর্ধেকটা সম্বন্ধেই সচেতন। আমরা আমাদের শারীরিক আর মানসিক সম্পদের সামান্যই মাত্র কাজে লাগাই। সোজাসুজি বলতে গেলে বলতে হয় একজন মানুষ তার সীমার মধ্যেই কেবল বাস করে। তার মধ্যে নানা ধরনের শক্তি থাকলেও সাধারণতঃ সে তা ব্যবহার করে না।’

হ্যাঁ, আপনারা যারা এই লাইনগুলো পড়ছেন তারা তাদের ক্ষমতার বেশ কিছু সাধারণতঃ কাজে লাগান না। আর আপনার যে ক্ষমতায় অন্য লোকদের প্রশংসা করতে পারেন তাও আপনি করছেন না। তা করলে তারা তাদের সুপ্ত শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে।

অতএব অপরকে কুদ্ধ বা বিরক্ত না করে বদলাতে হলে ৬ নম্বর নিয়ম হল :

'সামান্য উন্নতিতেই প্রশংসা করুন–যেটুকু উন্নতি দেখতে পাচ্ছেন তারই প্রশংসা করুন। আর সেটা আন্তরিকতায় সঙ্গেই করুন।'

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রশংসা করুন

আমার জনৈক বান্ধবী মিসেস আর্নেস্ট জেন্ট নিউইয়র্কে তার বাড়িতে এক পরিচারিকাকে পরের সোমবার থেকে কাজ করতে বলেন। ইতিমধ্যে মিসেস জেন্ট তার আগেকার নিয়োগকর্তার কাছে ফোন করে তার সম্বন্ধে জানতে চাইলেন, যে তাকে আগে রেখেছিল। তিনি পূর্ণ প্রশংসাপত্র পেলেন না। মেয়েটি কাজ করতে এলে মিসেস জেন্ট বললেন : 'নেলী, তুমি আগে যে বাড়িতে কাজ করতে সেখানে ফোন করেছিলাম। তিনি বলেছেন তুমি সৎ এবং বিশ্বাসী, ভালো রান্নাও কর আর বাচ্চাদের যত্ন করো। কিন্তু তিনি এটাও বলেছেন তুমি ভালো করে পোশাক পর না আর বাড়িঘর সাফ রাখো না। আমার মনে হয় তিনি মিথ্যে বলেছেন। তুমি যে সন্দুর পোশাক পর, যে কেউ দেখলে তা বুঝবে। আমি বাজি ধরতে পারি পোশাকের মতই তুমি বাড়ি সাফ রাখবে। আমরা সুন্দর মানিয়ে চলতে পারবো।'

তার তাই পরে সম্পর্কও বেশ ভাল হয়। নেলী তার খ্যাতি বজায় রাখার চেষ্টাই করত। বিশ্বাস করুন তাই হয়। সে বাড়ি ঝকমকে রাখতো। বরং সে কয়েক ঘন্টা বেশি খেটে মিসেস জেন্টের ধারণা বজায় রাখতে চাইত।

বলডুইন মোটর কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট স্যামুয়েল ভাউক্লেইন বলেন, সাধারণ মানুষকে সহজেই চালানো যায় শুধু আপনি যদি দেখান যে তার কোন গুণের জন্য তাকে আপনি প্রশংসা করেন।

ছোট্ট করে বললে আপনি যদি কোন মানুষকে কোন গুণের জন্য উন্নত করতে চান তাহলে এমন ব্যবহার করতে হবে যেন তার সেই গুণটি বর্তমান রয়েছে আর সেটা দারুণ কিছু। শেক্সপীয়ার বলেছিলেন : কোন গুণ না থাকলে সেটা যে তার মধ্যে রয়েছে এমন ভাব দেখান। যে লোকের ওই বিশেষ গুণ নেই সেটা যদি তার আছে ধরা যায় তাহলে সে তার খ্যাতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাই করে। তাকে প্রশংসা করুন, তাহলে সে আপ্রাণ চেষ্টায় আপনার কাছে নিজেকে জাহির করতে চাইবে।

.

জর্জেট শেবল্যাঙ্ক তার 'সুভেনিরস, মাই লাইফ উইথ মেটারলিঙ্ক' বইতে কোন এক সামান্য বেলজিয়ান মেয়ের অদ্ভুত পরিবর্তনের কাহিনী লিখেছেন। সেটা এই রকম :

কাছাকাছি এক হোটেলের একটি পরিচারিকা মেয়ে আমার খাবার আনতো। তাকে 'ডিম ধোওয়া মেরী' বলে ডাকতো সবাই যেহেতু সে ডিম ধুয়ে জীবিকা আরম্ভ করে। মেয়েটি অদ্ভুত ধরনের, ট্যারা চোখ, পায়েও দোষ। বেচারি নানা দিক থেকেই প্রতিবন্ধী ছিল।

একদিন সে যখন হাতে করে আমার জন্য ম্যাকরোনির প্লেট নিয়ে অপেক্ষা করছিল আমি সোজাসুজি বললাম, 'মেরী, তুমি জানো না তোমার মধ্যে কত গুণ আছে।'

নিজের আবেগ চেপে রাখতে অভ্যস্ত মেরী কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল কারণ যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাই। তারপর ও ডিমটা টেবিলে নামিয়ে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেশ বুদ্ধিমতীর মতই জবাব দিলো; মাদাম, কথাটা বিশ্বাসই করতাম না। ও কোন প্রশ্ন

করেনি কারণ ওর কোন সন্দেহ ছিলো না। ও শুধু রান্নাঘরে গিয়ে কথাটা আমায় বললো। আর বিশ্বাসের জোর এমন যে কেউ ওকে ঠাট্টাও করতে পারল না। সেইদিন থেকে ওকে সবাই একটু সম্মানও জানাতে লাগল। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল মেরীর নিজেরই মধ্যে। নিজে যে দারুণ কিছু এই বিশ্বাসের ফলে ও নিজের মুখ আর শরীরের এমন যত্ন নিতে আরম্ভ করল যে ওর উপোসী যৌবন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল।

দুমাস পরে আমি যখন চলে যাচ্ছিলাম মেরী শেফের ভাইপোর সঙ্গে ওর বিয়ের কথাটা আমায় জানাল। আমি একজন লেডি হব,' বলে ও আমায় ধন্যবাদ জানাল। একটা ছোট্ট কথায় ওর জীবনটাই বদলে গেল।

জর্জেট শেবল্যাঙ্ক 'ডিম দেওয়া মেরীকে' সম্মানের সঙ্গে বাঁচার পথ করে দিয়েছেন–আর সেই সম্মানবোধ ওর জীবনধারাই বদলে দিল।

হেনরি ক্লে বিসনারও ফ্রান্সের আমেরিকান সেনাদলের চরিত্র সংশোধন করতে একই পথ নিয়েছিলেন। আমেরিকার সেনাপতিদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় জেনারেল জেমস জি হার্ড বিসনারকে বলেন যে তাঁর মতে ফ্রান্সে থাকা বিশ লক্ষ আমেরিকার সৈন্যরা অত্যন্ত ভালো আর আদর্শবাদী। এদের মত জীবনে আর কাউকেই তিনি দেখেন নি।

এটা কি অতিরিক্ত প্রশংসা? হয়তো তাই। কিন্তু বিসনার এটা কিভাবে কাজে লাগান দেখুন।

'আমি কখনই সৈন্যদের বিসনার তাদের সম্বন্ধে কি বলেছেন শোনাতে ভুল করেনি, বিসনার লিখেছেন। এক মুহূর্তের জন্যেও আমি কথাটার সত্যমিথ্যা যাচাই করিনি। তবে আমি জানতাম এটা সত্যি না হলেও জেনারেল হার্বর্ডের প্রশংসা ওদের উদ্বুদ্ধ করবে ওই অবস্থায় পৌঁছতে।'

একটা প্রাচীন প্রবাদ আছে-'কোন কুকুরকে বদনাম দিয়ে তাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারা যায়। কিন্তু তার প্রশংসা করে দেখুন কি হয়!'

প্রায় প্রত্যেকেই–ধনী, দরিদ্র, ভিখারি, চোর–সবাইকেই একবার সৎ বললে তারা সেটা বজায় রাখার চেষ্টা করে।

সিংসিং কারাগারের ওয়ার্ডেন লজ বলেন, কোন দুবৃত্তের সঙ্গে ব্যবহার করতে হলে একটা মাত্র উপায় আছে তাকে কজা করার। তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করুন যেন সে কোন সম্মানিত ভদ্রলোক। ধরে নিন সে আপনার সমান। এমন ব্যবহারে সে এমনই বিগলিত হবে যে, সে এই ভেবে গর্বিত হবে যেকেউ তাকে বিশ্বাস করে। লজের কথা বিশ্বাস করতেই হবে কারণ এমন দক্ষ লোক আর হয়নি। কথাটা বারবার বলার মতই।

অতএব কাউকে যদি আঘাত বা অসম্মান না করে বদলাতে চান তবে ৭ নম্বর নিয়ম হল :

'লোককে ভালো করে প্রশংসা করুন। সে তা হলে ভালো হতে চাইবে।'

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভুল সংশোধন সহজ করুন

অল্প কিছুদিন আগে আমার বছর চল্লিশের এক অবিবাহিত বন্ধু বিয়ে করবে স্থির করে। ওর প্রেমিকা ওকে নাচ শিখতে বলে। বন্ধু আমায় বলেছিল তার নাচ শেখার দরকার ছিল। কুড়ি বছর আগে সে যেমন নাচতো আর এখনও তার কোন পরিবর্তন দেখা যায় নি। সে লিখেছিল, প্রথম শিক্ষকই আমায় বোধহয় জানান নাচ শেখা আমার কিছুই হয় নি। সে বলে সবটাই ভুল। আমাকে সবই ভুলে নতুন করে শুরু করতে হবে। আমার সেটা করার ইচ্ছে ছিল না তাই তার কাছ থেকে চলে আসি।'

'পরের শিক্ষক হয়তো মিথ্যা বলতেন, তবে সেটা আমার পছন্দ ছিল। সে আমায় জানায় আমার কায়দাগুলো একটু পুরনো ধরনের হলেও আমি চেষ্টা করলে শিখতে পারব। প্রথম শিক্ষক আমায় হতাশ করে দেন। নতুন শিক্ষক ঠিক তার উলটোই করেন। সে আমার প্রশংসা করে আর ভুল ধরার চেষ্টা করেনি। তোমার স্বাভাবিক ছন্দ আছে। তুমি নাচিয়ে হয়েই জন্মেছে। অথচ আমি জানতাম আমি একদম চতুর্থ শ্রেণীর নাচিয়ে, তা সত্ত্বেও মনে মনে পোষণ করতে লাগলাম তিনি ঠিক কথাই বলছেন। আসলে তাকে এটা বলাবার জন্যেই টাকা দিচ্ছি। সেকথা কেন উল্লেখ করলাম?'

'যাই হোক আমি এটা জানতাম তিনি আমার প্রশংসা না করলে আজ যা নাচতে পারি তাও পারতাম। তিনি বলেন আমি স্বাভাবিক নাচিয়ে। এটাই আমায় উৎসাহী করে তোলে। আমায় আশা জোগায়। তাতেই আমি উন্নতি করতে চাই।'

কোন শিশু, স্বামী বা কোন কর্মচারিকে বলুন কোন কাজে সে বোকা বা অপদার্থ, তার কোন দক্ষতা নেই! সে সব ভুল করছে, তাহলে তার উন্নতি করার সমস্ত ইচ্ছাই বিলুপ্ত হবে। কিন্তু উল্টো কৌশলটা কাজে লাগান, আন্তরিক প্রশংসা করুন, কাজটা করা সহজ বুঝিয়ে বলুন, লোকটিকে বুঝতে দিন সে কাজটা করতে পারে এ বিশ্বাস আপনার আছে। তাহলে দেখবেন সে সারারাত জেগেই তা করতে চাইবে।

ঠিক এই কৌশল লাওয়েল টমাস কাজে লাগিয়েছিলেন। বিশ্বাস করুন তিনি মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন যাদুকর। তিনি আপনাকে তৈরি করতে পারেন, তিনি আপনার মধ্যে বিশ্বাস জাগাতে পারেন। আপনার সুপ্ত প্রতিভা তিনি জাগিয়ে তুলতে পারেন। যেমন ধরুন, আমি সম্প্রতি মিঃ আর মিসেস টমাসের সঙ্গে এক সপ্তাহ কাটাই। আর শনিবার রাতে চুল্লীর সামনে বসে আমায় একটা ব্রিজ খেলায় যোগ দিতে ডাকা হয়। ব্রিজ? না, না। আমি ব্রিজ খেলতে পারি না। খেলাটা চিরদিনই আমার কাছে রহস্যময় রয়ে গেছে। কিছুতেই তা পারব না।

‘কেন, কেন, এতে কোন কৌশল নেই।’ লাওয়েল বললেন। ‘ব্রিজে শুধু স্মরণ আর বিচারবুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই লাগে না। তুমি তো একবার স্মৃতিশক্তির উপর একটা পরিচ্ছেদ লিখেছো। ব্রিজ তোমার কাজে লাগবে। তোমার লাইনে পড়ে এটা।’

আর আশ্চর্য ব্যাপার! কিছু বোঝার আগেই আমি ব্রিজ খেলার টেবিলে বসে গেলাম। তার কারণ হলো আমায় বলা হয় ব্রিজ খেলায় আমার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। তাই ব্যাপারই আমার কাছে সহজ হয়ে গেল।

ব্রিজের কথা বলতে গিয়ে আমার এলি কালবার্টসনের কথা মনে পড়ছে। কালবার্টসনের নাম তো ঘরে ঘরে। যেখানেই ব্রিজ খেলা সেখানেই তাঁর নাম। তাঁর লেখা ব্রিজ সম্পর্কে বই অন্ততঃ বারোটা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে আর বিক্রয় হয়েছে লক্ষ লক্ষ কপি। অথচ তিনিই আমায় বলেন তিনি কোনকালেই ব্রিজ খেলাকে জীবিকা বলে গ্রহণ করতে পারতেন না যদি না একজন তরুণী তাঁকে জানাতে তার মধ্যে খেলার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে।

১৯২২ সালে তিনি আমেরিকায় এসে দর্শন আর সমাজবিদ্যা শেখানোর কাজ খুঁজে ব্যর্থ হন। তা

রপর তিনি কয়লা বিক্রির চেষ্টা করেন আর তাতেও ব্যর্থ হন।

তারপর চেষ্টা করেন কফি বিক্রি করতে আর তাতেও ব্যর্থ হন।

সে সময় তার মনে একেবারেই খেলেনি ব্রিজ খেলা শেখানোর ব্যবস্থা করতে। তিনি যে শুধু এক বাজে ব্রিজ খেলোয়াড় ছিলেন তাই নয়, তা ছাড়া বড় একগুঁয়ে ছিলেন। তিনি এত সব প্রশ্ন করতেন আর খেলার জন্য তর্ক করতেন যে, কেউ তাঁর সঙ্গে খেলতে চাইত না।

তারপরেই তিনি পরিচিতি হলেন এক সুন্দরী ব্রিজ খেলোয়াড়ের সঙ্গে তার নাম ডিলন। তিনি তাঁর সঙ্গে প্রেমে পড়ে তাকেই বিয়ে করলেন। ডিলন দেখলেন কালবার্টসন কত সতর্কভঙ্গীতে তাস বিশ্লেষণ করতে থাকেন। ডিলন তাই বললেন তিনি তাসের টেবিলে

একজন দারুণ খেলোয়াড়। তার প্রশংসাতেই তিনি ব্রিজ খেলাকে তার জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। কথাটা কালবার্টসন স্বয়ং আমায় বলেছিলেন।

অতএব লোককে না চটিয়ে তাঁদের পরিবর্তিত করতে হলে ৮ নম্বর নিময় হল: প্রশংসা করুন আর উৎসাহ দিন। ত্রুটি সংশোধন করা যে কঠিন নয় এটা বুঝিয়ে দিন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আনন্দে যা চান অন্যকে দিয়ে তাই করার পথ

১৯১৫ সালে আমেরিকা প্রায় স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। কারণ এক বছর ধরে ইউরোপের দেশগুলো মানুষের ইতিহাসে যা হয়নি সেইভাবে পরস্পর হত্যার রক্তাক্ত তাণ্ডবে মেতে ওঠে। স্বপ্নেও এ ঘটনা কেউ ভাবেনি। শান্তি কি আর আনা যাবে? কেউ তা জানতো না। কিন্তু উড্রো উইলসন একবার চেষ্টা করে দেখবেন ভাবলেন। তিনি ঠিক করলেন ইউরোপের যুদ্ধোন্মাদ সব মানুষের কাছে তার ব্যক্তিগত শান্তির দূত পাঠাবেন।

সেক্রেটারি অব স্টেট উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান, যিনি শান্তির প্রবক্তা ছিলেন, ব্রায়ানের যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। তিনি দেখলেন মানুষের সেবায় বিরাট একটা কাজ করে নিজেকে অমর করে তোলা যাবে। কিন্তু উইলসন অন্য একজনকে কাছে ডাকলেন তিনি হলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু কর্ণেল হাউস। কর্ণেল হাউসকেই দায়িত্ব দেয়া হলো ব্রায়ানকে অসন্তুষ্ট না করে অপ্রিয় সংবাদটা তাঁকে জানাবার জন্য।

কর্ণেল হাউস তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন, 'ব্রায়ান দৃশ্যতই হতাশ হয়েছিলেন যখন তিনি শুনলেন শান্তির দূত হিসেবে আমি ইউরোপে যাবো, তিনি ভেবেছিলেন কাজটা তিনি করবেন ...।'

'আমি উত্তর দিলাম যে প্রেসিডেন্ট মনে করছেন কারও পক্ষে সরকারীভাবে যাওয়াটা সমীচীন হবে না, আর তিনি গেলে লোকের কৌতূহল জাগবে এবং লোকে ভাববে তিনি কেন গেলেন ...।

ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন? হাউস যা বললেন তার অর্থহলো ব্রায়ান বিরাট ব্যক্তি, তার পক্ষে কাজটা যোগ্য হবে না–আর ব্রায়ান তাতে খুশি হলেন।

কর্ণেল হাউস দুনিয়ার হালচাল সম্পর্কে অভিজ্ঞ মানুষ তাই তিনি মানবিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ নিয়মই মেনে চলেছিলেন : 'অপরকে দিয়ে যা করাতে চান সেটা তাকে খুশি হয়ে করতে দিন।

উড্রো উইলসন, উইলিয়াম গিবন ম্যাকাডুকে তার ক্যাবিনেটের সদস্য হওয়ার সময়েও এই নীতি মেনে চলেছিলেন। এটাই ছিল কাউকে তিনি যা দিতে পারতেন সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। অথচ উইলসন এমনভাবেই কাজটা করলেন যাতে অন্যজন দ্বিগুণভাবে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবেন। ম্যাকাডুর নিজের কথাতেই ব্যাপারটা শুনুন : তিনি (উইলসন বললেন যে তিনি খুবই খুশি হবেন আমি যদি তার মন্ত্রিসভায় অর্থদপ্তরের সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করি। সব ব্যাপার চমৎকারভাবে উপস্থাপিত করার সুন্দর দক্ষতা তাঁর ছিল। তিনি এমনভাবে কথাটা উপস্থাপন করতেন মনে হতো তিনি কাজটা করলে যেন তাঁকে অনুগ্রহ করা হচ্ছে।'

দুর্ভাগ্যবশত উইলসন সব সময়েই এই কৌশল কাজে লাগান নি। তা যদি করতেন, তাহলে ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো। যেমন, উইলসন আমেরিকাকে লীগ অব

নেশনসে নেবার ব্যাপারে সেনেট আর রিপাবলিকান দলকে খুশী করতে পারেন নি। উইলসন ইলিহুরুট বা হিউজেস বা হেনরি ক্যাবট লজকে বা অন্য কোন রিপাবলিকানকে তার সঙ্গে শান্তির সভায় নিয়ে যাননি। বদলে তিনি নিয়ে যান তাঁরই দলের অখ্যাত লোকদের। তিনি রিপাবলিকান সদস্যদের পাত্তা না দিয়ে এটা স্বীকার করতে রাজিও হন না যে লীগ তৈরির কাজে তাঁর মত তাদেরও দান আছে, তাদের কোন ভাবেই অংশদানে তিনি রাজি হন না। আর এইরকম মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার ভুল কাজের ফলে উইলসন নিজের কর্মজীবন নষ্ট করেন, স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেন, জীবনসীমা কমিয়ে আনেন, আমেরিকাকে লীগের বাইরে থাকতে বাধ্য করেন আর বিশ্ব ইতিহাসের ধারাও বদলে দেন।

বিখ্যাত প্রকাশন প্রতিষ্ঠান ডবলিউ পেজ এই নীতি অনুসরণ করতেন। অপরকে আপনার ইচ্ছামত কাজে উদ্বুদ্ধ করুন। প্রতিষ্ঠানটি এতই দক্ষ ছিল যে ও হেনরি জানিয়ে ছিলেন, ডবলিউ পেজ তার কোন গল্প প্রকাশে অনিচ্ছা এমনভাবে প্রকাশ করতেন এবং তাতে এমন মহত্ব আর প্রশংসা থাকতো যে অন্য প্রকাশক গল্পটি প্রকাশনার জন্য গ্রহণ করলে তিনি এতে বেশি আনন্দ লাভ করতেন। কিন্তু ডবলিউ পেজ প্রত্যাখ্যান করলে তিনি সব চাইতে বেশী খুশী হতেন।

.

আমি একজন লোককে জানি যিনি বক্তৃতা দানের বহু আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতেন। এসব আমন্ত্রণ আসত এমন সব বন্ধুদের কাছ থেকে যাদের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। অথচ তিনি তা এমন কৌশলে প্রত্যাখ্যান করতেন যে তাঁরা প্রত্যাখ্যানে দুঃখ পেতেন না। তিনি

www.bengaliebook.com

কি করে এটা করতেন? শুধু তিনি দারুণ ব্যস্ত একথা বা অন্য কোন কারণ দেখিয়ে নয়। না, বরং আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আর একজন বক্তার নাম প্রস্তাব করতেন। আসলে তিনি অন্যকে আঘাত দিতেন না। বরং আর একজনের নাম করে সুযোগ দিতেন। আর এতে কাজ হতো চমৎকার। অন্য ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হওয়ার সুযোগ পেতেন না।

জে. এ ওয়ান্ট প্রতিষ্ঠানের একজন মেকানিকের মনোভাব বদলের ব্যাপারে উদগ্রীব হন। প্রতিষ্ঠানটি ছিল বিখ্যাত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান। মেকানিকের কাজ ছিল সারাদিন রাতে কাজ করা টাইপ রাইটার আর অন্যান্য মেশিন কর্মক্ষম রাখা। সে বারবার অভিযোগ করত কাজের সময় বড় বেশি, কাজও প্রচুর, তার একজন সহকারী চাই।

জে. এ. ওয়ান্ট তাকে সহকারী না দিয়েই তাকে সুখী করেন। কিভাবে? এই মেকানিকের ব্যবহারের জন্য একটা ব্যক্তিগত অফিস দেওয়া হয়। তার নাম দরজার উপর সেঁটে দেওয়া হয় এইভাবে ম্যানেজার, সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট।

সে আর সামান্য মিস্ত্রী রইলো না, যাকে রাম, শ্যাম, যদুরা হুকুম করতে পারে। এখন সে একজন ম্যানেজার। সে পেল সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ববোধ। এরপর থেকে সে বেশ আনন্দেই অভিযোগ ছাড়া কাজ করে চলেছিল।

ছেলেমানুষী ভাবছেন এটাকে? হয়তো ভাই। কিন্তু সবাই নেপোলিয়নকেও একথা বলেছিল তিনি যখন লিজিয়ন অব অনার সৃষ্টি করে সেটা তার সৈন্যদলের মধ্যে ১৫০০ জনকে পদক বানিয়ে বিতরণ করেন আর ১৮ জন সেনাপতিকে ‘ফ্রান্সের বীর’ আখ্যা

দেন এবং সৈন্যবাহিনীকে ঘোষণা করেন গ্র্যাণ্ড আর্মি বলে। এই যুদ্ধে ওস্তাদ সেনাদের তিনি খেলনা দিচ্ছেন বলে নেপোলিয়ানের সমালোচনা করা হতে থাকে। জবাবে নেপোলিয়ন বলেন, মানুষ খেলনার দাস।

নেপোলিয়ন যে কৌশল নিয়েছিলেন সেটা আপনার ব্যাপারেও কাজে লাগাতে পারে। আমার একজন বান্ধবী মিসেস জেন্ট, যার নাম আগেও উল্লেখ করেছি, নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। ছেলেরা দৌড়োড়ৌড়ি করে তাঁর বাড়ির বাগান নষ্ট করছিল। তিনি সমালোচনা, বকাবকি, অনেক কিছু করলেও তাতে কাজ হলো না। এরপর তিনি ছেলের দলের সবচেয়ে দুষ্টু নেতাকে একটা পদবী দিয়ে তাকে তার 'গোয়েন্দা' হিসেবে কাজে লাগালেন এইসব বন্ধ করতে। এতেই সমস্যার সমাধান হলো। সেই 'গোয়েন্দা বাগানে আগুন জ্বালিয়ে একটা লোহার শিক গরম করে ভয় দেখাতে লাগল, যে বাগানে পা দেবে তাকে ছ্যাঁকা লাগানো হবে।

এই হলো মানুষের চরিত্র। অতএব অপরকে অসন্তুষ্ট না করে যদি স্বমতে আনতে চান ৯ নম্বর নিয়ম হল :

'অপরকে দিয়ে যা করাতে চান তা তাকে খুশি মনে করতে দিন।'

.

অল্প কথায়

অপরের অসন্তোষ না জাগিয়ে তাকে পরিবর্তনের নটি উপায়।

www.bengaliebook.com

১: প্রশংসা আর আন্তরিক তারিফ দিয়ে শুরু করুন।

২: অপরের ভুল ঘুরিয়ে দেখান।

৩ : অন্যকে সমালোচনার আগে নিজের ভুলের কথা বলুন।

৪ : সরাসরি আদেশ না দিয়ে প্রশ্ন করুন।

৫: অপরকে মুখ রক্ষা করতে দিন।

৬ : সামান্য উন্নতিতেই প্রশংসা করুন আর প্রত্যেকটা উন্নতিতেও প্রশংসা করুন এবং সেটা আন্তরিক ভাবেই করুন।

৭ : অন্যকে প্রশংসা করুন তাতে সে ভালো হবার চেষ্টা করবে।

৮ : প্রশংসা করুন, ত্রুটি সংশোধন যে কঠিন নয় সেটা বুঝিয়ে দিন।

৯ : অপরকে খুশি মনে আপনার কাজ করতে দিন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যে চিঠিতে জাদু জাগে

বাজি ধরতে পারি আপনি এখন কি ভাবছেন। আপনি সম্ভবত এখন ভাবছেন এই রকম কিছু : যে চিঠিতে যাদু জাগে! অসম্ভব ব্যাপার! এ রকম শুধু বিজ্ঞাপনই দেখা যায়।

অবশ্য এমন ভাবনার জন্য আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। পনেরো বছর আগে এরকম একটা বই আমার হাতে পড়লে আমিও তাই ভাবতাম।

আসুন খোলাখুলি কথা বলা যাক। 'যে চিঠিতে যাদু জাগে' কথাটা কি সঠিক? না, সত্যি কথা বলতে গেলে তা হয় না।

আসল সত্য হলো কথাটা বড় বেশি কম করেই বলা হয়েছে। এই পরিচ্ছদে যে সব চিঠি ছাপা হয়েছে সেগুলো দ্বিগুণ ভোজবাজি দেখিয়েছে। এটা কার আবিষ্কার জানেন? আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন সেল্‌স ম্যানেজার কেন. আর. ডাইকের। তিনি বর্তমানে কলগেট পামলিভ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন ম্যানেজার আর অ্যাসোসিয়েশনের ন্যাশনাল অ্যাডভার্টাইজারের ডাইরেক্টর বোর্ডের সভাপতি। মিঃ ডাইক বলেন ডিলারদের কাছ থেকে খবরাখবর চেয়ে তিনি যে সব চিঠি লিখতেন তাতে শতকরা ৫ থেকে ৮ এর বেশি জবাব কিন্তু পেতেন না। তিনি আমায় বলেছেন শতকরা ১৫ ভাগ পেলেই সেটা তিনি যথেষ্ট ভাবতেন আর ২০ হলে তো সেটা অলৌকিক ভাবতে পারতেন। মিঃ ডাইকের একটা চিঠির জবাব এলো শতকরা ৪২.১২ ভাগ। তিনি এটা কিভাবে করলেন?

মিঃ ডাইকের নিজের কথাতেই সেটা শুনুন : চিঠি আসা অস্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায় মিঃ কার্নেগির সঠিক কথা বলা আর মানবিক সম্পর্ক নামের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমি যোগ দেবার পর। আমি দেখলাম আমি যেভাবে চিঠি লিখতাম সেটার সবই ভুল। পাঠক্রম অনুযায়ী চিঠি লেখার পরেই সব বদলে গেল।

চিঠিটা এখানে দিচ্ছি। এটা অন্য একজন লেখককে সামান্য উপকারের অনুরোধে খুশি হতে হয়। এই কারণে নিজের দাম সম্পর্কে তার ধারণা বাড়ে।

মিঃ জন ব্ল্যাঙ্ক,
ব্ল্যাঙ্কভিল, আরিজোনা।

প্রিয় মিঃ ব্ল্যাঙ্ক,

‘একটু অসুবিধা পড়ায় আপনি সাহায্য করতে পারেন কি না ভাবছি?..’ এই ধরনের শুরুতে ভোজবাজী ঘটে যায়। মানুষের চরিত্রই এই।

আর একটা উদাহরণ দেখুন।

আমি আর হোমার একবার ফ্রান্সের অভ্যন্তরে মোটরে চড়ে যাওয়ার সময় পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমাদের পুরনো মডেলের ফোর্ড গাড়িটা থামিয়ে আমরা একদল কৃষককে কাছাকাছি বড় শহরে কিভাবে পৌঁছতে পারি জানতে চাইলাম।

প্রশ্নের ফল হলো একেবারে বিদ্যুৎ স্পর্শের মত। এই সব গ্রাম্য কৃষক মোটর গাড়ি খুব কমই দেখেছে। আমেরিকানরা যখন ফ্রান্সে গাড়ি চড়ে যাচ্ছেন তখন তারা নিশ্চয়ই লক্ষপতি। হয়তো হেনরি ফোর্ডেরই আত্মীয় হবেন! এরকমই বোধ হয় ওরা ভাবছিল। তবু ওরা এমন কিছু জানতো যা আমরা জানতাম না। তাই আমরা যখন কাছের শহরে যাওয়ার রাস্তা জানতে চাইলাম তখন তাদের গুরুত্ববোধ বাড়িয়ে দিলাম। তারা একসঙ্গে কথা বলা শুরু করল। একজন নিজেকে জাহির করার দারুণ সুযোগ পেয়ে সে অন্যদের থামিয়ে বলা আরম্ভ করল।

সুতরাং আপনি নিজে এটা একবার চেষ্টা করে দেখুন। অচেনা জায়গায় গেলে এটা করে দেখতে পারেন। এইভাবে বলতে পারেন : দয়া করে অমুক রাস্তায় কিভাবে যেতে পারি একটু দেখিয়ে দেবেন? বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন একজন শত্রুকে এইভাবেই সারা জীবনের মত বন্ধু করে তোলেন। সে সময় ফ্রাঙ্কলিন মাঝবয়সী যুবক ছিলেন, তিনি তার জমানো সব টাকায় একটা ছোট ছাপাখানা খোলেন। তিনি ফিলাডেলফিয়ার জেনারেল অ্যাসেম্বলীতে কেরানি নির্বাচিত হন। এটা পাওয়ায় তিনি সরকারী ছাপার কাজ করতে পারতেন। তাতে ভালোই লাভ হতো, বেন তাই বজায় রাখতে চাইছিলেন। কিন্তু একটা বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল। অ্যাসেম্বলীর একজন বিরাট ধনী আর ক্ষমতাবান মানুষ ফ্রাঙ্কলিনকে খুবই অপছন্দ করতেন। তিনি শুধু যে তাঁকে অপছন্দই করতেন তাই নয়, খোলাখুলি সকলের সামনে নিন্দাও করতেন।

এটা খুবই মারাত্মক ব্যাপার। আতএব ফ্রাঙ্কলিন ঠিক করলেন তার শত্রুকে বশ করতেই হবে।

কিন্তু কেমন করে? এটা একটা সমস্যাই ছিলো। শত্রুকে কোন সহায়তা করে? না, তাতে তার সন্দেহ জাগতে পারে-ঘৃণা জাগাও অসম্ভব নয়। ফ্রাঙ্কলিন খুবই বুদ্ধিমান মানুষ, তাই এরকম ফাঁদে পা দিলেন না। তিনি তাই এর উল্টোই করলেন। তিনি শত্রুর কাছে কিছু সুবিধা প্রার্থনা করলেন।

ফ্রাঙ্কলিন দশ ডলার ধার চাননি। না, না, এরকম কিছুই না। ফ্রাঙ্কলিন এমন কিছু চাইলেন যাতে অন্য লোকটি খুশি হলেন-এমন কিছু ফ্রাঙ্কলিন চাইলেন যাতে তার সম্মানবোধ জেগে উঠল, এমন সুবিধা যাতে তার অহমিকা আর গুরুত্ব দুই-ই বাড়লো। এমন কিছু যাতে ফ্রাঙ্কলিনের যে শ্রদ্ধা আছে সেটা বোঝা গেল।

বাকিটা ফ্রাঙ্কলিন নিজের কথাতেই শুনুন :

যখন শুনতে পেলাম ভদ্রলোকের বিশেষ দুষ্প্রাপ্য আর ভালো বইয়ের পাঠাগার আছে, আমি তাঁকে অনুরোধ করে চিঠি লিখলাম যদি তাঁর একখানা বই আমাকে কয়েক দিনের জন্যে দেন তাহলে বাধিত হব।

তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সেটা পাঠিয়ে দিলেন, আমিও কদিন পরে সেটা ফেরত দিই। সঙ্গে একটা চিরকুটে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাও জানালাম।

‘এরপরে আমাদের যখন দেখা হলো তিনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে আমার সঙ্গে কথা বললেন (যা তিনি আগে কখনই করেন নি), আর ভবিষ্যতে আমাকে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। তাই এরপর আমরা দারুণ বন্ধু হয়ে উঠলাম আর সে বন্ধুত্ব তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্তই ছিল।’

বেন ফ্রাঙ্কলিন প্রায় দেড়'শ বছরেরও বেশি হলো মারা গেছেন কিন্তু তিনি যে মনস্তত্ত্ব কাজে লাগিয়েছিলেন তা আজও অম্লান। সেটা অপরকে কিছু সাহায্যের অনুরোধ।

আমার একজন ছাত্রও এইভাবে উপকার পান। আমার সেই ছাত্রের নাম অ্যালবার্ট বি অ্যামনেল। অ্যামনেল বেশ কবছর ধরে জলের পাইপ আর ঘর গরম রাখার যন্ত্রপাতি বিক্রি করতেন। তিনি ব্রুকলীনের একজন লোকের কাছে কিছুতেই তার যন্ত্রপাতি বিক্রি করতে পারেন নি। ভদ্রলোকের অফিসে গেলেই তিনি ডেস্কের পিছনে বসে চুরুট খেতে খেতেই গম্ভীর স্বরে অ্যামনেলকে বলতেন, আমার আজ কিছুই দরকার নেই। আমার সময় নষ্ট করবেন না। পথ দেখুন।

এরপর অ্যামনেল নতুন কৌশল ধরলেন। তারপরে সব বদলে গিয়ে তারা পরস্পর বন্ধু হয়ে উঠলেন আর বহু ভালো ভালো অর্ডারও পেলেন।

অ্যামনেলের প্রতিষ্ঠান লং আইল্যাণ্ডের ভিলেজে একটা নতুন শাখা খোলার কথাবার্তারও বলছিলেন। এ এলাকাটা সম্পর্কে ওই প্লাম্বার ভদ্রলোকের ভালো জ্ঞান ছিল। তাই মিঃ অ্যামনেল একদিন তাঁর অফিসে গিয়ে বললেন : মিঃ সি আমি আজ আপনাকে কোন কিছু বিক্রি করতে আসিনি। আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছিলাম। কয়েক মিনিট সময় দিতে পারবেন?

'হুম্'! ভদ্রলোক চুরুটে টান মেরে বললেন, কি বলার আছে বলে ফেলুন।

'আমাদের প্রতিষ্ঠান লং আইল্যাণ্ডে একটা শাখা খোলার ব্যবস্থা করেছে'–মিঃ অ্যামনেল বললেন। স্থানীয় মানুষদের মধ্যে এলাকাটা সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো আপনি জানেন তাই আপনার কাছে জানতে এসেছি কাজটা কি বুদ্ধিমানের হবে?'

এবার নতুন ব্যাপার! কারণ ভদ্রলোক এতদিন সেলসম্যানদের বকাবকি করে নিজের গুরুত্ব দেখাতেন আর তাদের পথ দেখতে বলতেন।

কিন্তু এবার একজন সেলসম্যান তাঁর কাছে পরামর্শ চেয়ে অনুরোধ করেছে। হা বিরাট কোন প্রতিষ্ঠানের সেলসম্যান তার মতামত চাইছে।

.

'বসুন' চেয়ার টেনে তিনি বসলেন। এরপর লং আইল্যাণ্ডে দোকান কেনা উচিত কিনা সে সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। তিনি শুধু যে জায়গাটা অনুসন্ধান করলেন তাই নয় বরং ওটা কেনা আর মালপত্র সরবরাহ ইত্যাদির বিষয়েও ঢের উপদেশ দিলেন। একটা বিরাট কোম্পানীর ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন বলে তাঁর গুরুত্ববোধে বেড়ে উঠল। তিনি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন, তিনি এরপর তাঁর পারিবারিক অশান্তির বিষয়েও অনেক কথা বললেন।

এরপর সন্ধ্যেবেলায় যখন ফিরে এলাম', মিঃ অ্যামনেল বললেন, আমি যে বেশ ভালো মত কিছু অর্ডারই নিয়ে এলাম তাই নয় বরং চিরকালের মতই তাঁর বন্ধুত্ব অর্জন করলাম। বর্তমানে আমি তার সঙ্গে গল্প খেলি। এই পরিবর্তন আসে তাকে কিছু সুবিধার অনুরোধ করাতেই।

মনে রাখবেন আমরা সকলেই প্রশংসা আর সুনাম চাই, আর এটা পেতে সব কিছুই করতে পারি। তবে কেউই আন্তরিকার অভাব সহ্য করে না। কেউ তোষামোদও চায় না।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহজীবনে সুখী হওয়ার সাতটি পথ

পঁচাত্তর বছর আগে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভাইপো কাউন্টেস অব টেবা, মেরী ইউজিন ইগনেশ অর্গাস্টিন দ্য মন্টিনোর প্রেমে পড়েন–তিনি ছিলেন বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠা সুন্দরী, নেপোলিয়ন তাকে বিয়ে করেন। তার পরামর্শদাতারা তাঁকে জানান মহিলাটি শুধুমাত্র একজন অনামা স্পেনীয় কাউন্টের মেয়ে। কিন্তু নেপোলিয়ন তাতে জবাব দেন : তাতে কি হয়েছে? তার সৌন্দর্য যৌবন রূপ সবই তিনি স্বর্গীয় মনে করতেন। রাজকীয় আসন থেকে জাতির উদ্দেশ্যেই তিনি বলেন : ‘আমি এমন একজন রমণীকে বেছে নিয়েছি যাকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। কোন অচেনা মেয়ের চেয়ে এই রকম মেয়েই আমি পছন্দ করি।‘

নেপোলিয়ন আর তাঁর স্ত্রীর কি না ছিলো-স্বাস্থ্য, সম্পদ, ক্ষমতা, খ্যাতি, সৌন্দর্য, ভালোবাসা, প্রেম-রোমান্স ভরা জীবনে যা যা দরকার। কোন ভালোবাসায় ভরা আলোকোজ্জ্বল্প জীবন এর চেয়ে ভালো হয়ে ছুটতে পারে না।

কিন্তু হায়, সেই আলো শিগগিরই যেন নিভে এলো-পড়ে রইল এক মুঠো ছাই। নেপোলিয়ন ইউজিনকে সাম্রাজ্ঞী করেছিলেন, কিন্তু নেপোলিয়নের প্রেম বা সিংহাসন তার ঘ্যানর ঘ্যানর করা বন্ধ করতে পারেনি।

ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হয়ে আর সন্দেহের জ্বালায় ইউজিন নেপোলিয়নের কোন কথাই শোনেন নি এমন কি তাকে এক মুহূর্তও একাকী থাকতে দেন নি। শাসন কার্য চালানোর সময় রাজসভায় ঢুকেও তিনি অতি দরকারী কাজ কর্মে বাধা দিয়েছেন। তিনি তাঁকে একেবারেই একা থাকতে দিতে চাননি এই ভয়ে যে হয়ত তিনি অন্য কোন রমণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করছেন।

প্রায়ই ইউজিন তার বোনের কাছে স্বামীর নামে অভিযোগ করতেন। আর সঙ্গে কান্নাকাটি এবং ঘ্যানর ঘ্যানর করতেন, ভয় দেখাতেন। পাঠাগারে ঢুকে স্বামীকে গালাগাল দিতেন। ফ্রান্সের সম্রাটের এক ডজন প্রাসাদ থাকা সত্ত্বেও কোথাও তিনি শান্তি পেতেন না।

এসব করে ইউজিনের কি লাভ হয়?

উত্তরটা এই রকম : আমি ই.এ. রাইনহার্টের লেখা 'নেপোলিয়ান ইউজিন' নামে বই থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। 'শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এমনই দাঁড়ালো যে নোপোলিয়ন প্রায়ই রাত্রিবেলা নিজের চোখ টুপিতে ঢেকে পিছনের দরজা দিয়ে গোপনে প্রাসাদ ছেড়ে এক সুন্দরী মহিলার কাছে যেতেন। মহিলাটি তাঁকে ভালবাসতেন। পাথরের রাস্তায় একলা হেঁটে বেড়াতেন সম্রাট। রূপ কথাতেই এমন ঘটনা ঘটে থাকে। সম্রাট খালি ভাবতেন,আহা আমার জীবন যদি সত্যিই এমন হতো।'

ঘ্যানর ঘ্যানর করার ফলে ইউজিনের জীবনে এই রকমই ঘটে যায়। সত্যি তিনি ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। এটাও সত্যি পৃথিবীতে সে সময় সবসেরা সুন্দরী ছিলেন তিনিই। তা সত্ত্বেও কিন্তু ঘ্যানর ঘ্যানরের বিষাক্ত কামড় তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। প্রাচীন কালে

জনের মত ইউজিনও তাই বিলাপ করতে পারতেন : যা ভয় করেছিলাম আমার জীবনেই তাই ঘটেছে। তার জীবনে এটা এসেছে? মোটেই না, বেচারি মহিলাটি ঈর্ষা আর ঘ্যানর ঘ্যানর করে নিজেই তা এনেছেন।

নরকের শয়তান প্রেম ভালোবাসা ধ্বংস করার জন্য যত রকম উপায় উদ্ভাবন করেছে ঘ্যানর ঘ্যানর তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। এ কখনও ব্যর্থ হয় না। গোখরো সাপের বিষের মত এটা সব নষ্ট করে শেষ করে দেয়।

কাউন্ট লিও টলষ্টয়ের স্ত্রীরও সেটা আবিষ্কার করেন তবে বড় দেরিতে। মৃত্যুর আগে তিনি তার মেয়েদের কাছে স্বীকার করেন : 'তোদের বাবার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। তার মেয়েরা জবাব দেয়নি। তারা সবাই কাঁদছিলো। তারা জানতো তাদের মা ঠিক কথাই বলছেন। ওরা জানতো সারা জীবন ধরে শুধু অভিযোগ করে, সমালোচনা করে আর শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর করেই তিনি স্বামীর মৃত্যুর কারণ হন।'

অথচ কাউন্ট লিও টলষ্টয় আর তাঁর স্ত্রী নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সুখী হতে পারতেন। তিনি ছিলেন সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তাঁর অমর সৃষ্টি 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' এবং 'আনা কারেনিনা' চিরকাল ধরেই পৃথিবীর সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

টলস্টয় এতই বিখ্যাত ছিলেন যে তাঁর স্তাবকরা দিনরাত ছায়ার মতই তাঁকে অনুসরণ করতো আর তিনি যা বলতেন সবাই তাঁরা সর্টহ্যাণ্ডে লিখে রাখতো। তিনি যদি বলতেন, মনে হচ্ছে এবার শুতে যাব' তাহলে এই সাধারণ কথাও তারা লিখে রাখতো। এখন

রুশ সরকার তিনি সারা জীবনে যা যা লিখেছেন সবই প্রকাশ করতে চলেছেন, হয়তো তার সব লেখার সংখ্যা দাঁড়াবে একশটা বই।

খ্যাতি ছাড়াও টলষ্টয় আর তার স্ত্রীর ছিলো সম্পদ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ছেলে মেয়ে। কোন বিবাহ এত সুন্দর হয় না। গোড়ায় মনে হত তাদের বিবাহিত জীবন বুঝি খুবই আনন্দের হবে। তারা তাই হাঁটু গেড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাত যেন এমন সুখ চিরকাল থাকে।

তারপরেই একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। টলষ্টয় আস্তে আস্তে বদলে গেলেন। তিনি হয়ে পড়লেন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। যে সব বিখ্যাত বই তিনি লিখেছিলেন সেগুলোর জন্য তিনি লজ্জিত হয়ে পড়লেন আর তখন থেকে সারা জীবন উৎসর্গ করলেন শান্তি প্রচার আর যুদ্ধ ও দারিদ্র বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে প্রচার পত্র লেখা শুরু করেন।

যে মানুষ যৌবনে একবার স্বীকার করেন সমস্ত রকম অপরাধই তিনি করেছেন–এমন কি খুনও তিনিই আবার যীশুর শিক্ষা অনুসরণ করতে আরম্ভ করেন। তিনি নিজের সব জমি দান করে দিয়ে দরিদ্রের জীবন বেছে নেন। তিনি নিজের জুতো নিজেই বানাতেন, মাঠে কাজ করতেন, খড় কাটতেন। নিজেই নিজের ঘর ঝাঁট দিয়ে কাঠের পাত্রে খেতেন আর শত্রুদের ভালো করার চেষ্টা করতেন।

লিও টলষ্টয়ের জীবন একটা বিয়োগান্ত অধ্যায় আর এর জন্য দায়ী ছিলো তার বিয়ে। তাঁর স্ত্রী বিলাসিতা পছন্দ করতেন কিন্তু টলষ্টয় সেটা ঘৃণা করতেন। তাঁর স্ত্রী চাইতেন খ্যাতি আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা, কিন্তু এসব সামান্য জিনিস তিনি চাইতেন না, এর কোন

দাম তার কাছে ছিলো না। তার স্ত্রী চাইতেন টাকা পয়সা আর সম্পদ, আর তিনি ভাবতেন ধনদৌলত এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখা পাপ।

বছরের পর বছর ধরে টলষ্টয়ের স্ত্রী ঘ্যানর ঘ্যানর করে, গালাগাল দিয়ে চিৎকার করতেন যেহেতু তিনি কোন টাকা পয়সা না নিয়ে তাঁর বই স্বাধীনবাবে ছাপতে দিয়ে দেন। তাঁর স্ত্রী চাইতেন এর পরিবর্তে টাকা।

তাঁকে বাধা দিলে শ্রীমতী টলষ্টয় পাগলের মত চিৎকার করে গড়াগড়ি খেয়ে আফিঙ খেতে যান। তিনি শপথ করেন আত্মহত্যা করবেন, তাই একবার তিনি কুঁয়োয় ঝাঁপিয়েও পড়তে যান।

ওদের বিবাহিত জীবনে এমন ঘটনা আছে যেটাকে আমার মনে হয় ইতিহাসের সবচেয়ে দুঃখ জনক ঘটনা। আমি আগেই বলেছি ওদের বিবাহিত জীবন গভীর আনন্দময় বলেই মনে হয়েছিলো অথচ আঠচল্লিশ বছর পর টলষ্টয় তাঁর স্ত্রীকে দেখতেও রাজি ছিলেন না। একদিন সন্ধ্যায় এই ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধা, প্রেমের আর আদরের প্রয়াসী টলষ্টয়ের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে কাতর আবেদন জানালেন; পঞ্চাশ বছর আগে তিনি স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তার ডায়রীতে যে প্রেমের নিবেদন লিখেছিলেন সেগুলো পাঠ করে শোনাতে। তিনি যখন সেগুলো পড়তে আরম্ভ করলেন, সেই সুন্দর হারানো সুখের দিনগুলো যেন আবার ফিরে এসেছিলো। দুজনের চোখেই তখন জল। বহুঁকাল আগে যে রোমান্টিক দিন তাদের জীবনকে আনন্দের আবরণে ঘিরে রেখেছিলো সে স্বপ্ন আজ কোথায় হারিয়ে গেছে।

শেষপর্যন্ত টলস্টয় আশি বছরে পা দিতে তিনি গৃহকোণের আনন্দহীন জীবন আর সহ্য করতে পারলেন। তাই তুষারপাতে আচ্ছান্ন ১৯১০ সালের অক্টোবরের এক রাতে তিনি গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন। কোথায় চলেছেন না জেনেই সেই ঠাণ্ডা অন্ধকারে তিনি হারিয়ে যেতে চাইলেন।

এগারো দিন পরে একটা রেল স্টেশনে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেরেন। তাঁর মৃত্যুকালীন অনুরোধ ছিলো তাঁর স্ত্রীকে যেন তার সামনে আসতে দেয়া না হয়।

কাউন্টেস টলষ্টয় তাঁর ঘ্যানর ঘ্যানর, অনুযোগ আর হিস্টিরিয়ার জন্য এই দামই দিয়েছিলেন।

পাঠক হয়তো ভাবছেন তাঁর ঘ্যানর ঘ্যানর করার যথেষ্ট কারণ ছিলো। সেটা মানছি। কিন্তু আসল কথা তা নয়। প্রশ্ন হলো : ঘ্যানর ঘ্যানরে তাঁর কি লাভ হয়? না, তাতে খারাপ অবস্থাটা আরও খারাপ করে তোলা হয়?

আমার মনে হয় আমি সত্যিই পাগল ছিলাম' এই কথাই কাউন্টেস টলস্টয় ভাবতেন–তবে তখন ঢের দেরি হয়ে গিয়েছিল। আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনের দুঃখময় পরিচ্ছেদও একই কারণ–তাঁর বিয়ে। তাঁর হত্যাকাণ্ড নয়, তাঁর বিয়ে। বুথ যখন গুলি করে, লিঙ্কন বুঝতেই পারেন নি তাকে গুলি করা হয়েছে, কিন্তু তিনি তেইশ বছর ধরে অনুভব করেছেন তার বিবাহিত জীবনের বিষাক্ত জ্বালা। এটা কম করেই বলা হলো। প্রায় শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ ধরে মিসেস লিঙ্কন ঘ্যানর ঘ্যানর করে তাঁর জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছিলেন।

তিনি সব সময় অভিযোগ করতেন আর স্বামীকে সমালোচনা করতেন, লিঙ্কনের কোন কাজই ঠিক ছিলো না। তাঁর কাঁধ বাঁকানো। তিনি অদ্ভুতভাবে হাঁটেন, ডান পা বেশি তোলেন, অনেকটা রেড ইণ্ডিয়ানদের মত, এই ছিলো অভিযোগ। তিনি অভিযোগ করতেন তার চলাফেরার কোন ছন্দ নেই, তিনি ব্যঙ্গ করে তারহটা দেখাতেন যেহেতু তিনি নিজে মাদান মেন্টেলের স্কুলে শিক্ষা পান।

কাউন্টেস টলস্টয় স্বামীর বড় বড় কাজ পছন্দ করতেন না। তিনি এও বলেছিলেন তাঁর নাকটা বড় খাড়া, ঠোঁট উঁচু, তাঁকে যক্ষারোগীর মত দেখায়। তার হাত পা বড় বড় আর মাথাটা আকারে খুব ছোট।

আব্রাহাম লিঙ্কন আর মেরী টড লিঙ্কন সব দিক থেকেই আলাদা ছিলেন। সেটা শিক্ষা দীক্ষা, অতীত, রুচি, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী সব কিছুতেই। তারা পরস্পর সব সময়ে বিরক্তি উৎপাদন করতেন।

সেনেটের অ্যালবার্ট জে. বেভারিজ যিনি এ যুগের সবসেরা বিশেষজ্ঞ, লিঙ্কন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'মিসেস লিঙ্কনের গলার স্বর ছিলো কর্কশ। বহুদূর থেকেই সেটা শ্রুতি গোচর হত। তাঁর বাড়ির কাছাকাছি সকলেই ওদের ঝগড়ার ব্যাপার জানত। প্রায়ই মিসেস লিঙ্কনের ক্রোধের প্রকাশ ঘটতো অন্যভাবেও। আর এটা ছিল অসংখ্য।'

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মিঃ আর মিসেস লিঙ্কন তাঁদের বিয়ের পর মিসেস জ্যাকব নামের এক মহিলার বাড়িতে থেকেছেন।

এক সকালে মিঃ আর মিসেস লিঙ্কন যখন প্রাতরাশ বসেছিলেন কোন কারণে লিঙ্কনের কথায় তার স্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে স্বামীর মুখে গরম কফির কাপ ছুঁড়ে মারেন। এটা তিনি করেন সকলের সামনেই।

কোন কথা না বলে লিঙ্কন লজ্জিত হয়ে চুপচাপ বসে থাকেন আর গৃহকর্ত্রী একটা তোয়ালে এনে তাঁর মুখ আর পোশাক মুছে দেন।

মিসেস লিঙ্কনের ঈর্ষা এমনই মূর্খের মতো আর অবিশ্বাস্য ছিল যে এগুলো আলোচনা করলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। সকলের সামনেই তিনি এসব করতেন। তিনি অর্থাৎ মিসেস লিঙ্কন শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যান। হয়তো তিনি বরাবরই পাগল ছিলেন।

এইসব ঘ্যানর ঘ্যানর আর গালমন্দ এবং অহেতুক রাগ কি লিঙ্কনকে বদলে দেয়? এক রকম তাই। অন্তত স্ত্রীর প্রতি তার আচরণ। নিজের বিয়ে সম্বন্ধে তার মোহ কেটে যায় আর স্ত্রীকে তাই তিনি যথাসাধ্য পরিহার করে চলতেন। দুঃখের কথা যে লিঙ্কন ফিল্ডে তাকতে চাইতেন না। বছরের পর বছর এরকম চলেছিলো। বাড়ি থাকতে তার ভয় হতো। শীত আর বসন্ত কালের তিনটি করে মাস তিনি অন্য জায়গায় থাকতেন কখনও স্প্রিং ফিল্ডের ধারে কাছে যেতেন না।

মিসেস লিঙ্কন, সম্রাজ্ঞী ইউজিনি আর কাউন্টেস টলষ্টয়ের ঘ্যানর ঘ্যানরের ফলাফল হয় এই রকমই। তাঁরা নিজেদের জীবন নিজেরাই বিষাদময় করে তোলেন। এই ভাবেই নিজেদের সবচেয়ে প্রিয়জনদের তারা ধ্বংস করেন।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

নিউইয়র্কের আদালতে পারিবারিক সম্পর্কের বিষয়ে এগারো বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বেমি হ্যাঁমবার্জর হাজার হাজার বিচ্ছেদের ঘটনা আলোচনা করে বলেছেন যে, বহু স্ত্রী-ই ঘ্যানর ঘ্যানর করে নিজেদের বিবাহিত জীবনের সমাধি খুঁড়েছেন।

অতএব পারিবারিক জীবনে সুখী হতে হলে ১ নম্বর নিয়ম হল :

‘ঘ্যানর ঘ্যানর কখনও করবেন না।‘

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভালোবাসুন ও বাঁচতে দিন

ডিসরেলি বলেছিলেন, 'জীবনে আমি প্রচুর ভুল করতে পারি, তবে কখন ভলোবাসার জন্য বিয়ে করবো না।'

আর তা তিনি করেন নি। তিনি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত একাই ছিলেন। আর তারপর এক ধনী বিধবাকে বিয়ে করেন, তার চেয়ে পনেরো বছরের বড় বিধবাকে। যে বিধবার সব চুল ছিলো সাদা, যিনি পঞ্চান্নটি শীত পার হয়েছিলেন। প্রেম? না, তা নয়। ভদ্র মহিলা জানতেন ডিসরেলি তাকে ভালোবাসেন না। তিনি এটাও জানতেন ডিসরেলি তাঁকে এক বছর অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেন যাতে তার চরিত্র বুঝতে পারেন। তারপর সেই সময় কাটলে তাঁকে তিনি বিয়ে করেন।

খুবই গদ্যময়, ব্যবসায়িক কথা বলে মনে হয়। তাই না? তা সত্ত্বেও কিন্তু ডিসরেলির ঐ বিয়ে অনেক বিয়ের চেয়েই সফলতায় ভরা ছিলো। বিয়ের ইতিহাসে এটাই আশ্চর্য।

যে ধনী বিধবাকে ডিসরেলি বেছে নিয়েছিলেন তিনি তরুণী, সুন্দরী বা দারুণ কিছু একটুও ছিলেন না। তাঁর কথাবার্তায় সাহিত্য বা ইতিহাস সম্বন্ধে হাস্যোদ্রেক করার মতই সব ঘটনা ঘটতো। যেমন উদাহরণ হিসাবে দেখা যায়, তিনি জানতেন না আগে কারা এসেছিলো গ্রীক না রোমানরা। পোশাক সম্বন্ধে তাঁর রুচি ছিলো জঘন্য, বাড়িঘর সাজানো সম্পর্কেও রুচি ছিলো অদ্ভুত। কিন্তু তিনি একটা বিষয়ে ছিলেন ওস্তাদ-পুরুষকে

কি করে নাড়াচাড়া করতে হয় সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন একেবারে সিদ্ধহস্ত। বিয়ের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অসামান্য দক্ষ।

তিনি তাঁর বুদ্ধিকে ডিসরেলির উপর চাপাতে চাননি! ডিসরেলি যখন চালাক চতুর ডাচেসদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিরক্ত অবস্থায় শ্রান্ত হয়ে ফিরে আসতেন, মেরী অ্যানের কথাবার্তায় তখন তিনি আনন্দলাভ করতেন। বাড়ির আবহাওয়া তাঁর মনকে ক্রমেই আনন্দময় করে তুলতো। স্ত্রীকে আপ্যায়ন তাকে মধুর শান্তি এনে দিতো। বাড়িতে বয়স্কা স্ত্রীর সঙ্গে যে সময়টা তিনি কাটাতেন সেটাই ছিলো তার কাছে পরম সুখের। তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছে ছিলেন তার সঙ্গিনী, তাঁর বিশ্বাসের পাত্রী, তার পরামর্শদাতা। প্রতি রাতে তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীকে সারাদিনের কমন্স সভার সব বিবরণী শোনাতেন। আর-আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মেরী অ্যান আদপেই বিশ্বাস করতেন না ডিসরেলি যে কাজ করতে চান তাতে ব্যর্থ হবেন।

ত্রিশ বছর ধরে মেরী অ্যান ডিসরেলির জন্যেই বেঁচে ছিলেন, একমাত্র তারই জন্য। তার অর্থ সম্পদ তাঁর কাছে দামী ছিল শুধু স্বামীর সুখেরই জন্য। তার পরিবর্তে তিনি ছিলেন ডিসরেলির নায়িকা। মেরী মারা যাওয়ার পর ডিসরেলি আর্ল উপাধি পান, কিন্তু তিনি যখন সাধারণ একজন ছিলেন, তখন তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে বলে মেরী অ্যানকে একটি উপাধি দান করান। অতএব ১৮৬৮ সালে তাঁকে ভাইকাউন্টেস বীকনসৃফিল্ড উপাধি দেওয়া হয়।

জনসমক্ষে মেরী অ্যানকে যতটাই বুদ্ধিহীনা বলে মনে হয়ে থাকুক, ডিসরেলি কিন্তু কখনই স্ত্রীর সমালোচনা করেন নি। কখনও একটা কড়া কথাও বলেন নি। তাছাড়া কেউ

যদি তাঁকে ঠাট্টা করতে চাইতো তিনি সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর সমর্থনে দ্রুত অগ্রসর হতেন। এর মধ্যে থাকতো তীব্র বিশ্বস্ততা।

মেরী অ্যান হয়তো ত্রুটিহীনা ছিলেন না, তা সত্ত্বেও তিন দশক ধরে স্বামীর বিষয়ে কথা বলতে তাঁর ক্লান্তি আসেনি। তিনি সব সময়েই তার প্রশংসা করতেন। এর ফল কেমন হয়? ডিসরেলি বলেন, আমরা ত্রিশ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করছি, অথচ আমি কখনই একঘেয়ে বোধ করিনি। (অথচ অনেকেই বলতেন মেরী অ্যান ইতিহাস জানতেন না, অতএব তিনি মূর্খ)

তাঁর নিজের অংশ হিসেবে ডিসরেলি কখনও গোপন করেন নি যে মেরী অ্যান তাঁর জীবনে অনেকখানি। এর ফল কি হয়? মেরী অ্যান তাদের বন্ধুদের বলতেন, আমার জীবনে এসেছে কেবল আনন্দ।

নিজেদের মধ্যে তাদের একটা ঠাট্টা চালু ছিলো। ডিসরেলি বলতেন, জানো তোমার টাকার জন্যই তোমায় বিয়ে করেছি।' মেরী অ্যান হেসে বলতেন, হ্যাঁ,তবে আবার বিয়ে করতে হলে আমাকে এবার নিশ্চয়ই ভালোবাসার জন্যই করবে?

ডিসরেলি স্বীকার করতেন সেটা ঠিক।

না, মেরী অ্যান ত্রুটিহীনা ছিলেন না। কিন্তু ডিসরেলি তাঁর নিজের মত জীবন যাপন করায় কখনও বাধা দিতেন না।

হেনরী জেমস বলেছেন অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে গেলে এটা জেনে রাখা দরকার যে, অন্য লোকের সুখী হবার বিশেষ উপায়গুলোতে যেন কোন রকম বাধা না হয়। যদি না অবশ্য এতে আমাদের সুখের ব্যাঘাত হয়।

কথাটা বারবার বলার মতই।

লেল্যাণ্ড ফস্টার উড তাঁর বই 'গ্লোয়িং টুগেদার ইন দি ফ্যামিলি'তে বলেছেন 'বিয়েতে সাফল্য নির্ভর করে সঠিক লোক খুঁজে বের করার উপর। অবশ্য সঠিক লোক হওয়াটাও কম জরুরী নয়।

অতএব যদি সুখী হতে চান, তাহলে ২নং নিয়ম হল :

সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে অধিকার করার চেষ্টা করবেন না।'

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সমালোচনা করবেন না

জন জীবনে ডিসরেলির সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গ্লাডস্টোন। সাম্রাজ্যের যে-কোনো তর্কের বিষয় নিয়েই দুজনে লড়াই করতেন। অথচ তাদের দুজনেরই জীবনে একটা মিল ছিল, তা হল তাদের সুখী ব্যক্তিগত জীবন।

উইলিয়াম আর ক্যাথরিন গ্লাডস্টোন ঊনষাট বছর, প্রায় তিন কুড়ি বছর উজ্জ্বল বিবাহিত জীবন কাটান। সাধারণ জীবনে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গ্লাডস্টোন কোনদিনই স্ত্রীর সমালোচনা করেন নি।

ক্যাথরিন দি গ্রেটও তাই করতেন। তিনি কখনই স্বামীর সমালোচনা করেন নি।

ছোটদের কখনও সমালোচনা করার কথা নিশ্চয়ই আপনারা ভাবেন ... হয়তো ভাবছেন, আমি বলবো সমালোচনা করবেন না। না, আমি তা বলবো না। আমি শুধু বলবো তাদের সমালোচনা করার আগে কেবল আমেরিকার সাংবাদিকের একটা বিখ্যাত লেখা ‘ফাদার ফরগেটস’ পড়তে। এটা বহুবার উদ্ধৃত হয়েছে এবং রিডার্স ডাইজেস্ট থেকে তুলে দিচ্ছি :

‘শোন ছোট্ট সোনা, আমি তোমাকে যখন বলছি তুমি ঘুমোচ্ছ। আমি তোমায় বকাবকি করেছি, আমি তোমার ঘরে চুপি চুপি এসেছি একা। তোমার একখানা হাত তোমার

গলার তলায়, তোমার সোনালী চুল ঘামে ভিজে কপালের মধ্যে আটকে রয়েছে। এখন আমি দোষীর মতই তোমার কাছে এসেছি।

আমি এই কথাগুলোই ভাবছিলাম। আমি তোমার প্রতি কত বিরক্ত বোধ করেছি। স্কুলে যাওয়ার আগে তোমায় খুব বকেছিলাম কারণ তুমি সব খাবার ছড়িয়ে ফেলেছিল। তারপর তোয়ালে দিয়ে মুখ না মুছে কেবল তোয়ালেটা মুখে ছুঁয়েছিলে। তুমি তোমার জুতো সাফ করোনি বলেও বকাবকি করেছি।

সকাল বেলায় প্রাতরাশের সময়েও তোমায় বলেছিলাম। তুমি তোমার সব খাবার ছড়িয়ে ফেলেছিলে তারপর না চিবিয়ে সব খেয়ে ফেলেছিলে। তোমার চিবুক টেবিলে রেখে-রুটিতে খুব পুরু করে মাখন মাখিয়েছিলে। যখন তুমি আবার খেলতে যাও তখন আমি ট্রেন ধরতে ছুটেছিলাম, তখন তুমি চেঁচিয়ে বলেছিলে যাচ্ছি বাবা।

একই রকম ব্যাপার ঘটেছিল বিকেলেও। রাস্তা দিয়ে যখন আসছিলাম তখন দেখেছিলাম তুমি রাস্তার মধ্যে মাটিতে হাঁটু রেখে খেলে চলেছ, তোমার মোজায় অনেক ফুটো। তোমাকে তোমার বন্ধুদের সামনে বেশ বকাবকি করে হটিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসি। মোজার অনেক দাম, তুমি যদি নিজে কিনতে তাহলে বুঝতে পারতে বোধ হয়। বাবার কাছ থেকে তোমায় কথাটা শুনতে হল। কথাটা মনে রেখ।

পরের কথাটা তোমার মনে আছে? এরপর আমি যখন লাইব্রেরীতে বসে পড়েছিলাম, তুমি কেমন ভয় জড়ানো বিষাদমাখা চোখে এসে দাঁড়িয়েছিলে। আমি যখন কাগজ

নামিয়ে তোমায় দেখলাম তুমি আসার জন্য আমি যে বাধা পেলাম তাই অধৈর্য হয়ে খিঁচিয়ে বলেছিলাম, কি হল, কি চাই?

তুমি কিছুই বলোনি। শুধু কচি কচি হাত দুটো দিয়ে আমার গলাটা আদরের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আমায় চুমু খেয়েই ছুটে চলে গিয়েছিলে। তোমার হৃদয়ে ইশ্বর যে ভালবাসা দিয়েছেন তা শুকিয়ে যায়নি।

ছোট্ট সোনা, একটু পরেই আমার হাত থেকে কাগজটা পড়ে গেল। একটা অদ্ভুত রকম ভয় আমাকে কেমন যেন চেপে ধরতে চাইল। এ আমার কি রকম অভ্যাস! ক্রমাগত তোমার দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছি, বকুনির অভ্যাসই আমায় যেন পেয়ে বসেছে তোমাকে শুধু বকুনিই দিয়ে চলেছি। এটা ঠিক নয় যে তোমাকে ভালবাসিনা-আসলে তোমার কাছ থেকে অনেক বেশিই আমি চাইছিলাম। তোমার কাছ থেকে আমি যা চাইছিলাম তা আমার বয়সের মাপকাঠিতে। তোমাকে ঠিক সেই ভাবেই বিচার করেছি।

অথচ তোমার চরিত্রে রয়েছে কত ভালত্ব-কত সূক্ষতা। তোমার ছোট্ট হৃদয় বিশাল পর্বত শিখরে ছড়িয়ে পড়া ভোরের আলোর মতই বিরাট। তার প্রমাণ তুমি ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিলে। আজ তাই তোমার কাছে অন্ধকারে হাঁটু মুড়ে বসেছি। আমার নিজেকে এই মুহূর্তে অপরাধী মনে হচ্ছে ...।

এ আমার সামান্য অনুশোচনা মাত্র। তুমি জেগে থাকলে একথা তোমায় বললে বুঝতে পারতে না। আমার জানা উচিত ছিল তুমি ছোট্ট একটা ছেলে মাত্র ...।

কিন্তু কাল থেকে আমি হব একজন সাহিত্যিকের বাবা এবং তোমার সঙ্গে ঠিক বন্ধুর মত ব্যবহার করবো। তোমার দুঃখের সময় আমি দুঃখ পাব এবং তোমার আনন্দের সময় আমিও আনন্দে সমান অংশীদার হব। কখনও রেগে কথা বললে তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে ভুল সংশোধন করবো। ঠিক মন্ত্রের মত আমি আওড়াব তুমি যে একটি ছোট্ট শিশু মাত্র, এর বেশী কিছু নও।

আমি তোমাকে পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষ ভেবে ভুল করেছি ...। এখন আমি বুঝতে পারছি তুমি শুধু একটি শিশু মাত্র–ক্লান্ত হয়েইতুমি বিছানায় শুয়ে আছে। ...আমি তোমার কাছে ঢের বেশি কিছু চেয়েছি সেটা চাওয়া আমার উচিত হয়নি।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সকলকে সুখী করার উপায়

‘বেশিরভাগ পুরুষই স্ত্রী সন্ধান করার সময় যা চান তা হলো, তিনি এমন কেউ হবেন যিনি কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক হবেন না বরং এমন কেউ হবেন তিনি চাইবেন নিজেকে স্বেচ্ছায় শ্রেষ্ঠত্বের গরবে ভরিয়ে তুলতে। কথাটা বলেছেন পল পোপিনো, লস এঞ্জেলেসের পারিবারিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর। এই জন্যই কোন মহিলা অফিস ম্যানেজারকে একেবারই মাত্র মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানানো যায়। সে হয়তো তার কলেজে জীবনের স্মৃতিই উজাড় করে দিতে ব্যর্থ হয় তখন। এমন কি নিজের খরচাটাও সে হয়তো বা নিজেই মিটিয়ে দিতে চাইবে। এর ফল কেমন হয় : এরপর থেকে সে একাকী মধ্যাহ্নভোজ সারে।

‘এর বদলে যদি কলেজে শিক্ষা পায়নি এমন টাইপিস্টকে মধ্যাহ্নভোজ ডাকলে সে আমন্ত্রণকারীর দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আগ্রহ নিয়েই বলতে চায়, আপনার কথা বলুন। ফলটা কেমন হয়?

ভদ্রলোক তখন অন্যদের কাছে বলেন, মেয়েটা সুন্দরী না হলেও এরকম ভালো শ্রোতা আর দেখিনি।

পুরুষের উচিত, স্ত্রীলোকের পোশাক পরা আর রমণীয়া দেখানোর চেষ্টার তারিফ করা। সব পুরুষরাই ভুলে যায়, তাদের তাই বোঝা উচিত মেয়েরা পোশাক সম্বন্ধে কতটা

আগ্রহী হয়। যেমন ধরুন, কোন পুরুষ আর কোন রমণীর সঙ্গে আচমকা পথে দেখা হয়ে গেলে প্রথম স্ত্রীলোকটি ক্বচিৎ কখনও অন্য পুরুষটির দিকে তাকায়। তার দৃষ্টি স্বভাবতই যাচাই করতে চায় অন্য স্ত্রীলোকটি কি রকম পোশাক পরেছেন।

আমার ঠাকুমা কবছর আগে আটানব্বই বছর বয়সে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর কিছু আগে তাঁকে পঁচাত্তর বছর আগের তোলা একটা ফটো দেখাই। ঠাকুমার চোখে দেখার শক্তিই ছিলো না। তিনি শুধু একটা প্রশ্নই করেন : 'কি পোশাক পরে ছিলাম রে?' একবার ভাবুন ব্যাপারটা! এক বৃদ্ধা তাঁর জীবনের শেষ লগ্নে এসে, প্রায় শতবর্ষে পৌঁছে, স্মরণশক্তি হারিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন পঁচাত্তর বছর আগে কি পোশাক পরেছিলেন। এই প্রশ্নটা তিনি যখন করেন আমি তার পাশেই ছিলাম। ব্যাপারটা আমার মনে

এমন একটা দাগ রেখে যায়, কোনদিনই যেটা হারাবে না।

যে সব পুরুষ এই বইটা পড়ছেন তাঁরা পাঁচ বছর আগে কোন্ পোশাক পরেছিলেন মনে করতে পারবেন না। হয়তো মনে রাখার ইচ্ছাও তাঁদের নেই। কিন্তু মেয়েরা একেবারে আলাদা। ফরাসী ছেলেদের শেখানো হয় কোন সন্ধ্যায় মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলে বারবার তাদের পোশাকের প্রশংসা করা। মনে রাখবেন পাঁচকোটি ফরাসী কখনও ভুল করতে পারে না!

একটা মজার গল্প শোনাতে চাই আপনাদের। গল্পটা অবশ্য গল্পই।

এক চাষীর বউ সারাদিনের কাজের পর বাড়ির পুরুষদের সামনে একবোঝা খড় এনে জমা করে। তারা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করে যে পাগল হয়ে গেছে কিনা। চাষী বৌ তার

উত্তরে বলে : 'তোমরা লক্ষ্য করবে ভাবতে পারিনি। গত বিশ বছর ধরে তোমাদের জন্য খড় রান্না করে আসছি অথচ কোনদিনই তোমরা বলোনি খড় খাচ্ছো না কি খাচ্ছো।

মস্কো আর সেন্ট পিটার্সবার্গের অভিজাতবৃন্দদের মার্জিত ব্যবহার মজ্জাগত ছিল। রাশিয়ার জারদের আমলে প্রথা ছিল খাদ্য পরিবেশনের সময় অভিজাতরা চাইতেন রাঁধুনি সামনে থাকুক যাতে তাকে অভিনন্দন জানানো যায়।

ঠিক এমনটাই আপনার স্ত্রীকেও জানান না? রান্না খারাপ হলেও তাকে প্রশংসা করুন। আর এরকম করতে গিয়ে তাকে জানাতে ভুলবেন না আপনার জীবনে সে কতখানি জুড়ে আছে। ডিসরেলী ছিলেন বিশ্বের একজন বিখ্যাত রাজনীতিক, অথচ তিনি লোকের কাছে বলতে কখনই লজ্জা পেতেন না স্ত্রী তার কাছে কতখানি প্রিয়।

এডি ক্যান্টর বলেছিলেন : জীবনের সব কিছুর জন্যেই আমি আমার স্ত্রীর কাছে স্বামী। সেই আমাকে সোজা রাস্তায় চলতে সাহায্য করেছে। আমাদের পাঁচটি সন্তান আর আমার স্ত্রী আমাদের গৃহ আনন্দে ভরিয়ে রেখেছে। সব প্রশংসা তারই প্রাপ্য।

এরকম ঘটনার উদাহরণ আরও কিছু আছে। হলিউডে যেখানে বিয়ে ব্যাপারটা ঝুঁকির কাজ হয়ে উঠেছে সেখানেও এর উদাহরণ পাওয়া যায়।

এই হলো ব্যাপার। অতএব জীবনে সুখী হতে হলে ৪নং নিয়ম হল :

আন্তরিক প্রশংসা করুন।

ষটত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মেয়েরা যা ভালোবাসে

স্মরণাতীত কাল থেকেই ফুলকে প্রেমের ভাষা বলে ভাবা হয়ে আসছে। এতে খরচ বেশি হয় না, বিশেষ করে যে ঋতুতে যে ফুল মেলে। অর্থাৎ মরসুমী ফুল। কজন মানুষই বা বাড়িতে ফুল কিনে নিয়ে যান। এতে ভাবা যেতে পারে ফুলের বুঝি ঢের দাম।

তাহলে আজই আপনার স্ত্রীর জন্য এক গুচ্ছ গোলাপ কিনে নিয়ে যান না। পরীক্ষাটা একবার করেই দেখুন না কি হয়।

ব্রডওয়েতে ব্যস্ত থাকার সময় জর্জ এম. কোবান সারাদিনে তাঁর মা'কে দুবার ফোন করতে ভুলতেন না। এটা তিনি মা'র মৃত্যু পর্যন্ত করে যান। আপনারা কি ভাবেন প্রতিবারেই আশ্চর্য সব খবর দিতেন তিনি? মোটেই না। এ রকম করা একটাই মাত্র উদ্দেশ্য–যাকে ফোন করা হয় তাকে জানানো তিনি কতটা ভালবাসেন। তাকে কত খুশী করায় আপনি আগ্রহী। তার সুখ বা আনন্দে আপনার ব্যস্ততা কতখানিই।

মেয়েরা তাদের জন্মদিন বা অন্য সব উৎসবের ব্যাপারে দারুণ গুরুত্ব দেয়, কেন যে তারা তা করে সেটা একটা রমণীসুলভ রহস্যই। গড়পড়তা পুরুষরা কিন্তু কোন তারিখ মনে রাখার ব্যাপারে উদাসীন হয়। এটা কিন্তু মনে রাখা নেহাতই জরুরি কাজ, মনে রাখা উচিত।

শিকাগোর একজন জজ, যোশেফ মাবাথ যিনি ৪০,০০০ বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার নিষ্পত্তি করে ২,০০০ স্বামী স্ত্রীকে আবার মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন : ‘বিবাহিত জীবন মূল গণ্ডগোল অনেক ক্ষেত্রেই সামান্য ব্যাপার থেকে উৎপত্তি হয়। স্বামী যখন অফিসে কাজে রওয়ানা হন তখন তাকে বিদায় জানানোর মত কাজ স্ত্রীরা করলে অনেক বিবাহ বিচ্ছেদই আর হয় না।’

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংয়ের সঙ্গে রাবর্ট ব্রাউনিংয়ের বিবাহিত জীবন বোধ হয় সবচেয়ে স্বর্গীয় মহিমায় ভাস্বর ছিল। রবার্ট ব্রাউনিং প্রায় সব সময়েই স্ত্রীর প্রতি সামান্য ব্যাপারেই মনোযোগী হতে কখনও ভুল করতেন না। তিনি তাঁর পঙ্গু স্ত্রীকে এমনই সহৃদয়ভাবে যত্ন করতেন যে, এলিজাবেথ তাঁর বোনকে লেখেন : আমার মনে হচ্ছে আমি কেন সত্যিকার পরী হতে পারবো না।’

জীবনের ক্ষেত্রে বহু পুরুষই এই সব ছোটখাটো প্রাত্যহিক ব্যাপারে খেয়াল রাখেন না। বিবাহিত জীবনের শেষে এই রকমই ঘটে-ছোটখাটো সব ব্যাপার। যে সব দম্পতি এটা খেয়াল রাখেন না তাদের ধিক্কার দেয়া দরকার।

অতএব পারিবারিক জীবনে সুখী হতে গেলে ৫নং নিয়ম হল :

‘ছোটখাটো ব্যাপারেও নজর দিন।’

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সুখী হতে হলে এটা অবহেলা করবেন না

ওয়াল্টার ড্যামরস বিয়ে করেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম রাগী আর প্রেসিডেন্ট পদের একজন প্রার্থী জেমস জি. ব্লেইনের কন্যাকে। বহু বছর আগে বিয়ের পর থেকে স্কটল্যাণ্ডে অ্যান্ড্রু কার্নেগীর বাড়িতে ড্যামরস পরিবার দারুণ সুখে জীবন কাটান।

তাদের এই সুখের রহস্যটা কি?

মিসেস ড্যামরস বলেন, কোন জীবন সঙ্গী বেছে নেওয়ার সময় বিয়ের পরেই ভদ্রতাকে স্থান দিতে . চাই। স্ত্রীরা যদি স্বামীর প্রতি ভদ্রতা দেখায় তাহলে আর কিছু লাগে না।

ভালবাসাকে শেষ করতে কড়া কথা ব্যবহার হলো ক্যান্সারের মতো। লোকেরা এটা জানে বলেই আশ্চর্য ব্যাপার, আমরা আপন আত্মীয় স্বজনদের চেয়ে অচেনাদের কাছেই ভদ্রতা দেখাই। নিজের লোকদেরই আমরা অসম্মান করি বেশি।

ডরোথী ডিক্স বলেন : এটা আশ্চর্যজনকভাবেই সত্য যে যাদের আমারা সবচেয়ে বেশি খারাপ কথা বলি তারা সবাই আমাদের নিজের বাড়ির লোকজন।

হেনরি ক্লে রিমনারের মতে, ভদ্রতা হল হৃদয়ের এমন কোন গুণ যেটা ভাঙা সদরের বাইরে মনোলোভা ফুলের ওপরেই দৃষ্টি ফেলার সাহায্য করে।

ভদ্রতাবোধ বিবাহিত জীবনে অপরিহার্য বস্তু, যেমন কোন মোটরের পক্ষে তেল অতি প্রয়োজনীয়।

প্রাতরাশের টেবিলের সেই বিখ্যাত এক নায়ক অলিভার ওয়েলে হোমস বাড়িতে এই রকম এক নায়কই ছিলেন। অথচ তিনিই আবার কোন কারণে বিষাদগ্রস্ত বা হতাশায় আচ্ছন্ন হলে মনের ভাব মনেই চেপে রাখতেন, কখনই অন্যদের বিব্রত করতেন না।

কিন্তু এটা হল অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমসের ব্যাপার। সাধারণ গড়পড়তা মানুষ কেমন ব্যবহার এক্ষেত্রে করে থাকেন? অফিসে কাজে গোলমাল হলে ওপরওয়ালার কাছে ধমকানি। শুরু হয় মাথার যন্ত্রণা, পাঁচটা পনেরোর গাড়ি হয়তো ধরা যায় না। বাড়ি ফেরার তর সয় না তাই–তারপর সব ঝাল পড়ে এবার বাড়ির সকলের উপর।

হল্যাণ্ডে নিয়ম আছে বাড়িতে ঢোকার আগে বাইরের সিঁড়িতে জুতো খুলে রাখা। ডাচদের কাছ থেকে আমাদের তাই ঢের শেখার আছে–আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঝামেলা বাইরে রেখে ঢোকা।

উইলিয়াম জেমস একবার কোন প্রবন্ধে লেখেন : মানুষের মধ্যে অদ্ভুত একটা অজ্ঞতা আছ। এ দোষে আমরা প্রায় সবাই ভুগি।

প্রায়ই দেখা যায় অনেকেই বাইরের মানুষের সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলে না। অথচ স্ত্রীর প্রতি ঠিক বিপরীতটাই ঘটে যায়। কিন্তু বিবাহিত জীবন তাদের জীবনে ব্যবসার চেয়ে ঢের বেশী প্রয়োজনীয়।

গড়পড়তা মানুষ, যাদের বিবাহিত জীবনে সুখ আছে তারা একাকী বাস করা জ্ঞানীগুণীর চেয়ে অনেক সুখী। বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক টুর্গেনিভ বলেছিলেন : 'আমি আমার সব কৃতিত্ব আর সব বই দিয়ে দিতে রাজি আছি শুধু যদি কোন মেয়ে আমায় সস্নেহে প্রশ্ন করার থাকে ডিনারে আসতে দেরী হলো কেন।

তাহলে বিয়ের মধ্যে সুখের সুযোগ কতটা পাচ্ছেন? ডরোথি ডিক্সের মতে বিয়েতে পুরুষের সাফল্যের সম্ভাবনা ব্যবসার চেয়ে শতকরা সত্তর ভাগ বেশি। স্ত্রী পুরুষ বিয়ে করলে শতকরা সত্তর ভাগ সফল হওয়ার সম্ভাবনা।

বিবাহিত জীবনে সাফল্যের মূলমন্ত্র হলো পরস্পরকে ভালভাবে জানার চেষ্টা করা আর পরস্পরকে সহায়তা করে চলা এবং ছোট ছোট ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়ার কথা ভুলে না যাওয়া। তাছাড়া বিবাহ সংক্রান্ত ভালো কিছু বইও পড়ে ফেলা।

অতএব বিবাহিত জীবনে সুখী হতে গেলে ৬নং নিয়ম হল :

'ভদ্রতা দেখান।'

.

বিবাহিত জীবনে সুখী হতে হলে

অল্প কথায়

১: ঘ্যানর ঘ্যানর করবেন না।

২: সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে অধিকার করতে চাইবেন না।

৩: সমালোচনা করবেন না।

৪ : আন্তরিক প্রশংসা করুন।

৫: ছোটখাটো ব্যাপারেও মনোযোগ দিন।

৬ : ভদ্রতা দেখান।

৭: বিবাহ সম্পর্কে ভালো বই পড়ুন।

.

স্বামী বা স্ত্রী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজেরা দেওয়ার চেষ্টা করে দেখলে উপকৃত হবেন :

স্বামীদের জন্য

১। মাঝে মাঝে স্ত্রীর জন্যে আপনি একগুচ্ছ ফুল নিয়ে আসেন? সেটা তার জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী বা অন্য যে কোন উপলক্ষ্যেই হোক।

২। অন্যের সামনে কখনও স্ত্রীর সমলোচনা করেন না তো?

৩। বাড়ির খরচ ছাড়া তাকে ইচ্ছেমত খরচ করার জন্য টাকাকড়ি দেন কি?

৪। তার মানসিক কোন অবস্থায় সহানুভূতি দেখান তো?

৫। আপনার অবসর সময়ের অর্ধেকটা স্ত্রীর সঙ্গে কাটান কি?

৬। আপনার স্ত্রীর রান্নার সঙ্গে আপনার মা কিম্বা অন্য কারও তুলনা করেন কি?

৭। স্ত্রী বুদ্ধিবৃত্তি বই পড়া ইত্যাদিতে স্বাধীনতা দেন কি?

৮। ছোটখাটো ব্যাপারেও প্রশংসা করেন কি?

স্ত্রীদের জন্য

১। আপনার স্বামীর কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা দেন কি?

২। আপনার গৃহকোণ আকর্ষণীয় করার জন্য চেষ্টা করেন কি?

৩। স্বামীর পছন্দসই আহার্য তৈরিতে চেষ্টা করেন কি?

৪। স্বামীর ব্যবসা বা কাজে সহায়তা করেন কি?

৫। আপনি অর্থকরী ব্যাপারে সহজভাবে মেনে নেন?

৬। আপনি কি আপনার শাশুড়ি ও স্বামীর অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে মানিয়ে চলেন?

৭। আপনি কি স্বামীর পছন্দই পোশাক পরায় অভ্যস্ত?

৮। দৈনন্দিন খবর ধারণা ইত্যাদি সম্বন্ধে আপনি কি ওয়াকিবহাল থেকে স্বামীকে আনন্দ দান করেন?